

রহস্য-প্রদীপ।

অভিনব
'সামাজিক-চিত্র।

(একটি ভয়ানক জটিল মত্যা ঘটনা অবলম্বন করিয়া)

শ্রী অবিনাশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

২৫ নং কৃষ্ণদাম পালের লেন
কলিকাতা।

রহস্য-প্রদীপ কার্যালয়ে

গ্রন্থকারের নিকট

প্রাপ্য।

১০৩ নং—মসজিদবাড়ী স্ট্রীট "হারি-যন্ত্রে"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত।

• সন ১০০৮ সাল।



অবিনাশ বাবুর আর একখানি

নূতন উপস্থাপন

নিজস্বত্ব (যন্ত্রস্থ)

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

উৎসর্গ পত্র ।

মহামহিম শ্রীমন্নী যুক্ত রায় পশুপতিনাথ বসু

মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলেশু ।

হে মহাত্মন !

আপনি এই ধরণীতলে পুণ্যলোক দেব-চরিত্র, আপনি স্বজাতিদিগের মধ্যে পরম করুণাময় গুরুস্থানীয় এবং অত্যাঙ্কন মহান্-কুল-প্রদীপ স্বরূপ । প্রাভো ! আপনি এ দাসের প্রতি যে বিস্তৃত করুণাবারি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা কেহ কখন আশা করিতে পারে নাই - তাহা অগুণ্ডে অতীব দুর্লভ । আমি আপনার নিকট চিরঞ্জীবী । বহুদিন হইতে আমার হৃদয়ের একান্ত বাসনা যে, আপনাকে ওকি চিন্তে ভক্তি ভাবে যথাবিহিত ঘোড়শোপচারে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত হতভাগ্যের অদৃষ্টে কোন সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, - অথ একটি ক্ষুদ্র অবসর উপস্থিত । ইহা আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই না । অতএব হে দেব স্বজাতি-বৎসল পরম করুণাময় গুরো ! পূজার ছলে, আমার বহু পরিশ্রমের বড় সাধের এই ক্ষুদ্র সামাজিক উপলক্ষ্য— ‘রহস্ত-প্রদীপ’ খানি আপনার শ্রীপাদ পদ্মে ভক্তিভরে অর্পণ করিলাম । আপনি দাসের প্রতি করুণা করিয়া, এই ক্ষুদ্র পূজা গ্রহণ করুন । ইহাই প্রভুর নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা ।

অনুগত

দাস

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত ।

ঠিক এই সময়ে চিৎপুর রাস্তা ধরিয়া অস্পষ্ট দৃশ্যমান একটি যুবক চৰ্গ পাছকা নিহত মস্ মস্ শব্দে রজনীর নিশ্চক্ৰতা ভঙ্গ করিয়া দ্বারিত পদে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে, হৃদয় খানিকে কি এক অজানিত চুঃখপূর্ণ চিন্তায় ভাসাইয়া চলিয়াছে। মদনমোহনভলার নিকট আসিয়া একটি গ্যাস লাইট পোষ্টের নিম্নে একটি পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পাহারাওয়ালো এখন কত রাত্রি হবে?” পাহারাওয়ালো তাহাকে নিজ স্বাভাবিক কৰ্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল। এক বাজনের কো দশ পাঁচ মিনিট দের হায়।

যুবক আবার চলিতে লাগিল। যুবক অত্যন্ত ক্লান্ত, মুখ শ্লান, ললাটে স্বেদ বিন্দু, গায়ে একটি কোট, কঙ্কে চাদর, সঙ্কোচিত ছত্দের মধ্যস্থল দোহুল্যমান হতে মুষ্টি বদ্ধ? পরিধানে একখানি দেশী কোকিল পেড়ে কাপড়, লম্বমান কোঁচার অগ্রভাগ কোঁচার মূদ পতনে সংযোচিত। পায়ে এক জোড়া বিলাতি হাণ্ডিৎ জুতা। যুবক বলিষ্ঠ—মোটের উপর দেখিতে সুন্দর। যুবক এ পথ সে পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বহুবাজারের একটি সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া, সাত আট খানা বাড়ি পশ্চাতে রাখিয়া ডান হাতি একটি একতলা ইষ্টক নিৰ্ম্মিত বাড়ির সদর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

রূপ শয্যায় ।

যুবক ডাকিল, “মা!—মা! ওমা!” কাহারও সাড়া শব্দ নাই। আবার ডাকিল। তথাপি কোন উত্তর নাই। একটু বিরক্তির সহিত জীবৎ দরজায় যা গারিয়া ডাকিল, “ওমা—মা” ভিতর হইতে এইবার একটা স্নেহ-মাথা স্নেহ উত্তর হইল যাই বাবা! যাই! এত রাত্রি হলো কেন? বলিতে বলিতে মশকে দরজা খুলিয়া একটি শুভ্র বসনা প্রোড়াবিধবা মূর্তি প্রদীপহস্তে যুবকের সম্মুখীন হইল। পরে যুবক বাড়ি প্রবেশ করিয়া দ্বারে অর্গল আঁটিয়া মায়ের পশ্চাত্ত্বর্তী হইল। মা অগ্রেই গিয়া পূৰ্ব ছয়টি ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ মণাস্থানে রাখিলেন। পরে যুবককে স্নানীতল বারি গাত্রমার্জনী দিয়া যুবকের আহাৰাদির উদযোগে মনোনিবেশ করিলেন। যথা সময়ে আহাৰ স্থান সজ্জিত হইল। যুবক ক্রমে শান্তি-দূর ক্রমে পবিত্রার পরিচ্ছন্ন ক্রমে উপযুক্ত বিশ্রাম লাভ করিয়া আহাৰে বসিল।

প্রোঢ়া একথা সে কথার পরে কহিল। “দেখ বাবা বৌমার অশ্লথ একটু” (বাধা দিয়া) যুবক বলিল, “হ্যা হ্যা কেমন আছে?—বেড়েছে।” “অশ্লথ বড় শক্ত দাড়িয়েচে।” “অ্যা! বল কি! সকাল বেলাত বেশ দেখে গিয়াছিলাম।” “বৈকাল বেলা থেকে বেড়েচে এখন জর বিকার দাড়িয়েছে।” যুবকে ব আহ্নার সমাগন হইল।

মুখ হাত প্রক্ষালন করিয়া ভাষুণ চর্কন করিতে করিতে ননীবালা কে (নিজ প্রণয়িনীকে) দেখিতে গেল।

মানো সামান্য উঠানের পর, দুইখানি ঘর পার হইয়া, একটি ঘরে প্রবেশ করিল। গৃহটি বড় নয়, মধ্যম রকমের, গৃহটিব সাজ সজ্জাও মধ্যম রকমের। দু-খানি তক্তাপোষ পাশা পাশি—তছপরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আড়ম্বরহীন দুইটি পৃথক খেত শয্যা। তাহার একটি শয্যাতে কঙ্কালাবশিষ্ট,—যেন রৌদ্র তাপে স্ত্রীহীনা মণিনা সৌরভ হীন গোলাপের মত একটি যুবতি রমণীমূর্তি রূপ শয্যায় শায়িতা। তাহার পার্শ্বে একটি বৃদ্ধা রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্তা। অপর একটি শয্যাতে একটি সুকুমার কোমল মতি ক্ষুদ্র শিশু তাহার ক্ষুদ্র শয্যায় অশোর নিদ্রা যাইতেছে।

যুবক ঘরে ঢুকিতে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা অমিহ্র একটা বিপদ জেনে শুনেও কি, সকাল সকাল আসতে নাই?” যুবক ইহার কোন উত্তর না দিয়া ম্লান মুখী যুবতির শয্যাপার উপবেশন করিল। দেখিল, যুবতি প্রায় বিকৃত সংজ্ঞা। হস্ত দেখিয়া অমুমাণে জানিল। নাড়ি বড় দুর্বল। তবে ভয়ের কারণ কিছু নাই। অমিহ্র বাবু শুশ্রূষাকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। “ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে কি?” “ঔষধ খাওয়াইবার এইবার সময় হয়ে এলো, এই খাওয়াই।” “না, তবে থাক, ও ঔষধ দিবার আর দরকার নাই। আমি আর একটি ঔষধ দিচ্ছি। চিনিবাস কোথায়?” “চিনিবাস এই শুয়েচে? তাকে কেন?” “তার কাছে দেবাজের ঢাবি আছে। নিয়ে এসো।” বৃদ্ধা ঢাবি আনিতে গেল।

পাঠক এই অবসরে এই পরিবারের বিবরণ জারিয়া লউন। চণ্ডীকাপুরের কোন এক অংশে ইহাদের সামান্য এক ভূসম্পত্তি আছে। বাৎসরিক আয় ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা। উক্ত ভূসম্পত্তির সত্বাধিকারি এখন বিনি, তাঁহার পূর্বতন বংশধর রাম গোবিন্দ বাবু অমিহ্র বাবুর দাদা মহাশয়। তিনি পুত্রকলত্রাদি লইয়া সামান্য এক বিধা শস্ত ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারণ করিয়া

নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার একমাত্র ভবিষ্যতের আশা স্বরূপ বিংশতি বর্ষীয় যুবক পুত্র, স্থানীয় কোন সরকারে অল্প বেতনেব কর্ম করিতেন। তাহাতে এক রকম তাঁহাদিগের সংসার নির্বাহ হইত মাল। সুপ্রসন্ন বিধাতা তাহাদিগের ক্রমোন্নতি মানসে কর্মসূত্রে সেই শৃঙ্খলিত যুবকের মতি ফিরাইয়া দিলেন। যুবক আপনাদের অভাবনীয় অভাব নেত্র গোচর করিলেন। হীন উপায় চাকরি করিয়া নিজেদের অসীম অভাব বিমোচন করা অসম্ভব, নবীন যুবক নবীন উৎসাহে অচিরে ঘৃণিত দাসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই যৎসামান্য পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া বিশাল কর্ম ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। যথেষ্ট পরিশ্রমে, অতুল অধ্যবসায়, অমানুষিক সহিষ্ণুতা গুণে কিছু দিন পরে সেই পৈতৃক সম্পত্তির অতি আশ্চর্য জনক উন্নতি সাধন করেন। সম্প্রতি তিনি তাহার একমাত্র উপযুক্ত বংশধর শ্রীমান অসিন্দ্র কুমার চৌধুরীকে রাখিয়া কর্ম ক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া পরলোকগত হইল।

অসিন্দ্রবাবু এখন পিতৃ-স্বস্ত্র বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করেন। ইনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের এলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৎসর খানেক হইল, স্কুল ছাড়িয়া বাড়িতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-পুস্তকগুলি বিশেষ মনযোগের সহিত পড়িতেছেন। (ব্যবসা করিবার জন্ত নয়) এই স্বল্প সময়ের মধ্যে ইনি ইহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

আপাততঃ কোন কার্য গতিকে বাধ্য হইয়া পরিবারবর্গ লইয়া কলিকাতার উক্ত বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন। এখন অসিন্দ্র বাবুর পরিবারে মাফাং দেবী-স্বরূপা স্নেহময়ী জননী, হৃদয়ের শক্তি-স্বরূপা সাধিবা স্ত্রী, অক্ষয় আনন্দ স্নকুমার কোমল মতি শিশু, পিতার আগলের অনাথা বৃদ্ধা বি ও বিশ্বাসী ভৃত্য চিনিবাস। ইহারা সকলে যেন এক প্রাণ। একের অদর্শনে অপরে আকুল হইয়া পড়ে। আজ বরাহ নগরে ইহাদিগের কতকটা স্নেয়তী জমীর বন্দোবস্ত বিধানে ও প্রজায় প্রজায় কলহ নিবারণ, এই সকল ব্যাপার মীমাংসা করিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়ায় পরিবারবর্গ বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল।

কিয়ৎকালপরে বৃদ্ধাটি চাৰি আনয়া দিল। অসিন্দ্র বাবু দেবাজ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া ঋণ যুবতীকে সেবন করাইয়া বৃদ্ধাকে বলিল, এই ঔষধটি তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। অসিন্দ্রবাবু ক্লান্তিবশতঃ আর রাজি না করিয়া নিদ্রাদেবীর উপাসনা করণোদ্দেশে পাশ্বে বর্তী শয্যায় আশ্রয় লইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

আপনার উনি কেমন আছেন ?

বেলা প্রায় ৩।০ শাড়ে তিনটা । এমন সময় কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট ধরিয়। ছইটি যুবক বণাবর ঠনঠনের মোড় চৌরাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল । যুবক দুইটি দেখিতে প্রায় সমবয়স্ক । একটি নবর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণ, বয়স অনুমান চতুর্বিংশতি বর্ষ, পরিধানে আত্মীয় বিরোগ চিহ্নিত শোক পরিচ্ছদ বেশীর ভাগ তাহার উপর একখানি বহুমূল্য শীতবস্ত্র গাত্রে আবৃত । মস্তকে বহু মূল্য সাধা পবিপাটি রুম্ম কেশ । অপরটি গৌরবর্ণ নাতি শুল নাতি রুম্ম, বয়স প্রায় ষষ্ঠবিংশতি বর্ষ, পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাধারণ । প্রথম যুবক নিজ সহচর যুবককে বলিলেন । “ভাই শাস্ত্র,” তুমি একখানা গাড়ি দেখ, একপ ভাবে কতক্ষণ যাওয়া যায় ।”

এমন সময়ে আর একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদধারী বলিষ্ঠ যুবকের সহিত সাক্ষাত হইল । “কেও নিরামিস মশায় যে, এদিকে কোথায় ?” বলিষ্ঠ যুবক মুহু মুহু হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন কর্তার সম্মুখীন হইয়া উত্তর করিল । “এদিকে একটু দরকাব ছিল ।” “বেশ এ—কদিন মহাশয়ের দেখা পাই নাই কেন ? আমি কাল আপনাদের বাড়িতে দেখা করিতে গিয়া আশায় বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসি । পরম সৌভাগ্য যে মহাশয়ের সহিত এইখানেই শুভ সাক্ষাৎ হইল ।” আত্মীয় বিরোগ চিহ্নিত শোক পরিচ্ছদধারী যুবক কতক আগ্রহ ভরে কতক ঠাট্টার ছন্দে উক্ত যুবককে এই কথা গুলি বলিলেন । আগন্তুক উত্তরে ছলে বলিলেন । “আমারও সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে মহাশয়ের সহিত পাকে প্রকারে অন্য এইখানে সাক্ষাৎ হওয়ায়, অন্যকার অদর্শন আশঙ্কা দূর হইল । এখন মহাশয়ের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার আগে বলুন দেখি, আপনার উনি কেমন আছেন, শুনে কতকটা নিশ্চিন্ত হই ।” “উনি ভাল আছেন । এখন আপনি বলুন দেখি, আপনার উনি কেমন আছেন ?” “ভালু আছেন বলিয়া আগন্তুক যুবক ব্যস্ততা সহকারে বলিল । ভাই ইন্দু এখন আর দাঁড়াইতে পারি না, কারণ আমাকে বেঞ্চে যাইতে হইবে, থানকতক ঢেক ভাগাইতে হইবে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় । আমি চলিলাম কাল এইখানেই দেখা করি ।” বলিয়া যুবক ট্রাম গাড়িতে উঠিলেন ।

আগন্তুক যুবক আর কেহ নহে আমাদের পরিচিত অসিদ্ধ বাবু। অসিদ্ধ বাবু হিন্দু বাবু মহাপাঠি হুদুদ, উভয়ে বড় ভাক, বড় হুতুতা। ইতিপূর্বে শান্তবাবু আনিত গাড়ি ফুটপাথের পাশে অপেক্ষা করিতেছিল। হিন্দু বাবু শান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন গাড়ি আসিয়াছে কোথা? গাড়ি দেখিয়াই শান্তবাবু গাড়ওয়ানকে গাড়ি সম্মুখে আনিতে বলিলেন। গাড়ওয়ান গাড়ি সম্মুখে আনিল। উভয়ে গাড়িতে উঠিলেন। কোথায় যাইতে হইবে শান্তবাবু গাড়ওয়ানকে বলিয়া দিল, গাড়ি বরাবর পশ্চিমাভিমুখে ছুটিল। আফিংয়ের চৌরাস্তাব মধ্যবর্তী স্থানে একটি ত্রিতল অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া সেই গাড়ি থামিল। উভয়ে অবতরণ করিল। দ্বারস্থিত গুম্ফ গ্রাফ বিশিষ্ট দীর্ঘ তালকধাবী সদর রক্ষক মহাশয়কে হিন্দু বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “মনিলাল বাবু হায়? সদর রক্ষক তাহার কুরতা সীবন করিতে করিতে উত্তর দিল। “হ্যা বাবু হায়। আপু উপরমে যাইয়ে।” উভয়ে উপরে উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

এ আবার কি? কবে থেকে ।

ত্রিতলের একটি মাজারি হল ঘরে, মনিলাল বাবুর বৈঠকখানা। বৈঠকখানাটি বেশ পরিষ্কৃত, সুন্দর শুমাজ্জিত। ঘবময় সুবিস্তৃত মনোহর টানা গালিচার উপর ঢালা বিছানা, বিছানার চতুর্দিকে সুন্দর শূজালা সম্পন্ন উপধান মণ্ডলী সুন্দর ভাবে যথাস্থানে রক্ষিত। বিলাসির সুখ বিলাস আবেশা সুরঞ্জিত আলবোলা উপযুক্ত স্থানে তিন চারিটি বিদ্যমান। মনিলাল বাবু একটি উপাধানে গৌরবর্ণ দেহখানি এ্যাগাইরা একটি আলবলার রোপা রঞ্জিত নল, তামূল রাগ রঞ্জিত ঈশৎ শূল অধরে অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে বাখিধা মুদ্র মুদ্র চক্ষু দুইটী মুদ্রিত করিয়া তাম্রকূট সেবনে সুখানুভবের সহিত বিশ্রাম করিতেছেন।

এমন সময়ে হিন্দু বাবু এবং শান্তবাবু বৈঠকখানা ঘরে পদার্পণ করিলেন। মনিলাল বাবু পদশব্দে নিমিগিত নেত্র উন্মিলিত করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে উক্ত মূর্ত্তিঘর।

“আরে—কেও, হিন্দু বাবু বাবু যে, এস এস বস। এ আবার কি, কবে

থেকে ?” ইন্দুবাবু বিয়োগ চিহ্নিত পরিচ্ছদ লক্ষ্য করিয়া মনিলাল বাবু উদ্ধবিশ্ব কণ্ঠে ইন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন । “আজ ১৮ দিন ।” ইন্দুবাবু ইহা বলিতে বলিতে বসিলেন । শান্তবাবুও বসিলেন । “বটে ! বটে ! এ বিষয় আমাকে একবারও জানাতে নাই । তা জানাবে কেন । আমবা হুচি নগণ্য – তোমার জগণ্য বন্ধু মধ্য ?” মনিলাল বাবু হাসিতে ঢামিতে পরিহাস ছলে ইন্দুবাবুর মজবের উপর নজর রাখিয়া এই কথাগুলি বলিলেন । “বিলক্ষণ ? সমস্ত পাইয়া এই রকম কথা বলিবেন বই কি ? আপনি যদি আমাব নগণ্য বন্ধু হবেন ? তবে আমার প্রকৃত বন্ধু কে ? যথার্থ কথা বলিতে কি । এই হেপায় পড়িয়া দিন কতক বাড়ি থেকে বেকন বন্ধ হয়ে গিয়ে ছিল । তাই আসতে পারি নাই ।” “হ্যাঁ বুঝি এখন তোমাব পায়া ভারি, এখনত আসতেই পারবে না । এখন আমাদেরকেও ভুলে যাবে ।” মনিলাল বাবুর কণ্ঠে বাধা দিয়া ইন্দুবাবু বলিলেন । “একপ কথা বলিয়া কেন আমায় অপত্তিও করেন । সে শুড়ে বালি পড়িয়াছে । বাবা মায়ের নামে সব উইৎ কপিয়া দিয়া গিয়াছেন, আমি মায়ের অবর্তমানে সমস্ত বিষয়েই উত্তরাধিকারি হইব । কিন্তু যদি তৎ সময়ে আমার কোন চরিত্র দোষ হইয়াছে – রূপ প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আমার সমস্ত বিষয় দেবতোর হইবে । আমি কেবল সাধাবণ জীবিকা নির্বাহ করিবার জন্য উপযুক্ত ভাতা পাইব । ইহা কি আমাব পক্ষে কম আপনোষের কথা । আমার সকল আশা সমুদ্রে নিম্ন হইয়া গিয়াছে ।” হৃৎযিত চিত্তে গদগদ ভাসে ইন্দুবাবু এই কথাগুলি কহিলেন । “এ কথা আগে আমাকে জানাইলে এ বিষয়ে বন্ধুর চায় উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারিতাম, যদ্বারা এমন সুযোগে অশেষ ফল দশাইত । তাহা যাই হউক ; উহা তোমাকে ভিত্তিঃ প্রদর্শন যাব । আর আমি থাকিতে অভাব কি ? তোমাব ভয়ের কোন কারণ নাই ? তোমার যখন বাহা দরকার হইবে, তদসমুদায় আমি যোগাইব । অসময়ে বন্ধুর চায় কাজ করিব ।”

এই কথাগুলি হাশ্ব মুখে অতি আকর্ষিতা ভাব প্রদর্শন করিয়া ও পোরষের সহিত কহিয়া তাহার কুটিল প্রফুর্তাময় ক্ষুদ্র চক্ষুর স্তম্ভীকৃত দৃষ্টিতে ইন্দু বাবুর হৃদয়ের অন্তস্থল যেন অণেকের নিমিত্ত দেখিয়া লইল । ইন্দুবাবু তাহার সেই স্তম্ভীকৃত কুটিল কটাক্ষের মহিমা বুঝিতে পারিল না ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

হৃদয়ের লঘুতা মাত্র ।

নির্কোণ ইন্দুবাবু মনিলাল বাবুর স্বার্থপূর্ণ অমায়িকতার দ্বার পর নাই উত্তেজিত হইয়া যেন হতাশ প্রাণে বিপুল আশা পাইয়া প্রফুল্ল গদগদ ভাষে বলিয়া ফেলিলেন ।

“সেই জন্তই আমি আসিয়াছি, তোমার ছায় বন্ধুর নিকট আশাতিত ফল পাইব এ আশা পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছি । এখন একরূপ সময়ে আমি মহাবিপন্ন । আমি কতকগুলি বন্ধুর নিকট বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ—প্রতিশ্রুত । কিন্তু আমি এখন কপর্দক হীন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই । মুখ দেখাইবার উপায় পর্য্যন্ত নাই । কেবল তুমি একমাত্র উপায়,—তুমিই আমার একমাত্র লক্ষস্থল ।” কথা শেষ হইতে না হইতে মনিলাল বাবু বলিলেন । “তোমার গৌরচন্দ্রিকা রাখিয়া প্রকৃত কথা কি বলিয়া ফেল ।” ইন্দুবাবু বলিলেন আমার কতকগুলি টাকার দরকার—প্রায় দেড় হাজার টাকা । ৫০০ পাঁচ শত টাকা আমার বন্ধুগণের আনন্দ ভোজনের জন্ত, আর আমার জন্ত ১০০০ হাজার টাকা । আমি ও শাস্ত্রাবু খতাইয়া দেখিয়াছি, ইহাপেক্ষা ন্যূনের ফল হৃদয়ের লঘুতামাত্র ।

মনিলাল বাবু একটু মুচকিয়া হাসিলেন । মনে মনে বলিলেন । “অধঃপাতের যোগাড়ে এসেছো, এইবাব তোমার দোড় দেখিব ।” তৎপরে যেন একটু দগিয়া যেন একটু পশ্চাত হটিয়া, স্বর একটু নিম্ন করিয়া বলিলেন ।

“একেবারে—এত—টাকা তবেইত ।” অমনি শাস্ত্রাবু বলিয়া উঠিলেন । আপনি যেক্রপ নিয়মে টাকা কর্জ দেন । সেরূপ নিয়মের অগ্রথা হইবে না ।” মনিলাল বাবু অমনি সুর ফিরাইয়া আ—হা—হা তাহার জন্ত হইতেছেন । টাকার যখন নিতান্ত দরকার, টাকা না হইলে ইন্দুবাবুর যখন অপমান । তখন যেখানে হইতে হউক টাকা যোগাড় করিতেই হইবে তাহার জন্ত কোন চিন্তা নাই । তবে কবে টাকার দরকার ।” শাস্ত্রাবু মনিলাল বাবুর মুখের কথাটি লইয়া একটু তোষামোদ দেখাইয়া বলিলেন । “দিন তিনেকের মধ্যে হইলেই চলিবে । ইন্দুবাবু একটু আশ্বাসিত হইলেন ।”

কেল্লা ত মার দিয়া মনে করিয়া কিছু রং চংয়ের কথা কহিয়া বলিলেন, “চার পাঁচ দিবসের মধ্যে আসিব। এখন আর একটি বিশেষ কার্যের জন্ত গাত্রোত্থান করিতে হইল।” বলিয়া মনিলালবাবুকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া ইন্দুবাবু সহচর শান্তবাবু সহিত উঠিলেন।

মনিলাল বাবু উভয়কে বাক্চাতুর্যে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন।

ইন্দুবাবু অগ্রে, পশ্চাতে শান্তবাবু, মনিলালবাবু শান্তবাবুকে একটী দ্বিভিত্ত করিলেন। শান্তবাবু অতি অনুচ্চস্বরে বলিলেন, “আসিব।”

ইন্দুবাবু ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে পারিলেন না। তৎপরে উভয়ে উগরি-উক্ত গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। গাড়ি আরোহীদিগের গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিল। আর মনিলাল বাবু নিজ বিলাস কক্ষে সেই ভাবে বসিয়া আবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। ইনি কলিকাতা নগরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ইহার সকল মস্ত্রদায়ে গতিবিধি আছে ও আলম্প পুরিচয় বিলক্ষণ আছে। মোট কথায় ইনি একজন চালাক লোক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

খোকা মেয়ে ।

কলিকাতার কোন একটি পল্লীর দ্বিতল ছাদের উপর একটি ভ্রমোদয় বর্ষায়া বালিকা উপবিষ্টা, বালিকা কুমুদিনী নীল আঁখি মেলিয়া জ্যোৎসনা মাথা নীল আকাশ পানে চাহিয়া কি দেখিতেছিল। নীল জ্যোৎসনা মাথা আকাশ গায়ে চন্দ্রমার বিষম হাসি দেখিতেছিল, কিম্বা কোন তারকাটি তার গিরাইয়া ঠিক তাহার পানে চাহিয়া আছে ইহা অনুমদান করিয়া দেখিতেছিল। অথবা একখানা মাদা ধপধপে উর্গা বস্তুর ছায় ছোট মেঘখানি অনন্ত আকাশ কোলে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহা কত দিনে কোথার পৌছিয়া স্থির হইবে; না চিরকাল ঐরূপই ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইবে। তাহাই ভাবিতেছিল কি না, তাহা ঐ আগম যৌবনা পরিণতাদেশা বালিকাই জানে। বালিকা বিজ্ঞ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ ভাবে বসিয়া আছে।

বালিকার হাসিমাথা স্নান মুখখানি দেখিলে বোধ হয় বালিকা জটিল জগতের কুটিলতাও অবগত নয়; বাস্তবিক তাহাই—বালিকা কিছুই জানে না। যেমন মনোহর গঠনে গড়া গছো প্রস্কুট জুই ফলের

তোড়াটির মত, যেমন টানা টানা যুগ্ম লক্ষণোভিত নীল আঁখি দুইটি তুলিকা লিখনে আঁকা, তেমনি বাণিকার সকলি সুন্দর মধুবতাময় ; বাণিকার মৃণাল ভুজদ্বয়ে সামাগ্র সামাগ্র দুই একখানি স্বর্ণালঙ্কার শোভিত, পরিধানে অর্দ্ধ মণির বসন। বাণিকা একেবারে বাহুজ্ঞান বহিত। বাণিকার ছন্দগ মস্তিষ্ক কত কি সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ সমালোচনায় ক্লান্ত হইয়াছিল।

এমন সময় কলিকাতার কোন একটি অট্টালিকার নিখরস্থিত সুরহং সময় জাপক যন্ত্র চং চং চং শব্দে শব্দ লব্ধী সম্ভবত কলিকাতার চারিদিকে ছুটাইয়া আঁবাব নিস্তর হইল। বাণিকা ইহার কিছু জানিতে পারিল না। এমন সময়ে আর একটি শব্দ আসিয়া বাণিকাকে জাগাইল। সেই শব্দটি অট্টালিকার নিয় হইতে আসিল, সে শব্দটি আর কিছু নহে—“সরম ! সবম ! ও সবম !” সরম বাণিকার নাম, সরমা হইতে সরম হইয়াছে। একটি বেসুর অপভ্রংশে মিষ্ট মধুর হইয়া কর্কশ জী-কণ্ঠ নিঃসৃত একটি স্বর বাণিকার কর্ণে প্রবেশ করিয়া বাণিকাকে চমকিত করিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল—ঐ দিদিমা ডাক্‌ছেন। আঁবাব “সরম ও সবম !” “বাণিকা এইবাব উত্তর দিল। আমি এই যে—এখানে—ছাতের উপরে।” “থোকা মেয়ে—তুমি এখনও ছাতের উপরে, একলাটি ছাতের উপরে বসে বসে কি কবচো ; এখানে আমি তোমাকে চারিদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমাব ইন্দু-বাবু এসেছেন। ওস্তাদজী কতক্ষণ এসে বসে আছেন। পোড়ার মুখী তুমি শীঘ্র নেমে এসো।” “জ্যা ইন্দুবাবু এসেছেন—ওস্তাদজী এসেছেন ? আমি যাচ্ছি।” বলিয়া সরম দৌড়াইয়া ছাদ পাব হইয়া সোপানাবলী ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিতে কবিতে একটি বারান্দা সংলগ্ন দ্বিতল কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তথায় কক্ষদ্বারদেশে একটি গোবর্ণ কৃষ্ণাঙ্গী প্রৌঢ়া জীপোক দণ্ডায়মান। ইহাব পরিধানে একখানি দেশী মিহি কিনকিনে চওড়া লালপাড় লজ্জানিবারক ও সৌন্দর্য্য বর্ধক। কর্কশ শিথিল ভঙ্গ প্রত্যঙ্গে দুই একখানি স্বর্ণালঙ্কার বিস্তারিত এবং কর্ণদ্বয়ে শ্রেণীবদ্ধ কর্ণালঙ্কার দোহন্যমান। চিকন প্রায়ই—কেণহীন পরিপাটি মস্তক মীমন্তে মিন্দুর ঘন লজ্জায় ত্রিধমান নিপ্রোভ। ইহা হে দেখিলে আপন আপনি কেমন অভক্তির উদয় হয়, মনে হয় সামান্য বাগ্মসি প্রতিমূর্তি। ইনিই সবমের দিদিমা হন। কি রকম দিদিমা হন, তাহা সবমই জানে। যাই হোক দিদিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইনামাত্র—“বোকা মেয়ে তোমাব কিছুমাত্র আকোশ নাই ! এই ভাল মান্নবেব ছেদে সেই আঁবি বসে আছে, আর তুমি ছাতের উপর একলাটি বসে ভাবা গনিতে ছিনে। দিদিমা

সরমের কটি মুখখানির নিকট নিজ শিবাময় হস্ত দক্ষতাব সহিত সঞ্চাশন করিয়া এই বলিয়া তাহাকে পুনরায় তিরসার করিল। বিনা বাক্যব্যয়ে সরম শুড় শুড় করিয়া কক্ষতলে প্রবেশ করিল, যেখানে ইন্দুবাবু বসিয়াছিলেন, সরম সেইখানে গিয়া তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল—বলিল, “সেই এনেছ ?” “কি ! মাথার সোণার প্রজাপতি ! না তা এখন হয় নাই। এই তাহাদের নিকট হইতে (সুবর্ণ কাবেব) আগিতেছি। এখন দিন দুই বিনয় হইবে।” (কপট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া) সবরেব দিদিমা সরমকে ধমকাইল। বলিল, সরম তোমার কি—আঁকল ! মানুষ বাহির হইতে আগিলেন ! একটু ঠাণ্ডা হোক, তাবপব তোমার যা কথা আছে বলো। না মানুষকে খামকা বিরক্ত কবা।—বাবা—বাবা—কবে সব আদন কামদা লিখবে। আঁ ! ইন্দুবাবু বামচক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “বাক ও সব কথা। সরম তুমি একটু বাতাস কর।” সরম ছকুম মত বাতাস করিয়া তাহার চিত্ত বিনোদন কবিতো লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

বন্দিগি বিবি সাহেব ।

সরমেব দিদিমা কর্কশ কণ্ঠে মিষ্ট রসকরা স্বরের অবতারণা করিয়া ইন্দুবাবুকে বলিল, “বাবা কি খাণে, কি রকম উদ্যোগ কবব। ইন্দুবাবু বলিলেন। না এখনি আবার বাহিরে যাইব বিশেষ দরকার আছে। সেও কি হয় বাবা ! ছুখানা গরম গরম লুচি ভেজে দি। পেয়ে যাও। একটু বস। আহা বাচ্চা আমার ছুদিনে কি হয়ে গেল। এই বলিয়া সরমের দিদিমা ইন্দুবাবুব অগ্র জলযোগের আয়োজন করিতে গেল।

ইন্দুবাবু খানিক আমোদ কবিলার মানসে সরমকে দ্বা-য়া গান বাজ আবস্ত করিলেন। সরম যখন সুবসুন্দরীকপাবেনে ওস্তাদজির এসরণে ও ইন্দুবাবুব সঙ্গতে সঙ্গীত সুর লহরী গিলাইয়া সেই কক্ষ পাবিত করিয়া তাবকামণ্ডিত নিশীথ আকাশমার্গে ছড়াইল তখন ইন্দুবাবু মোহ বশতঃ সঙ্গতে একাগ্র হারাইতে লাগিল। ওস্তাদজি এইহেতু পুনঃ পুনঃ তাহাকে ইঙ্গিতে সাবধান কবিতোছিল, কিন্তু পাবিতেছিল না। পারিলে কি প্রকাবে যাহা নয় তাহাও কখন কি হয়। যে বমণীর মোহিনী ভাবাক্ষণ সংসার বিরাগী পুরুষের সংযত চিত্তও মোহপ্রাপ্ত হব সে যুগে বানকমণ্ডি ইন্দুবাবু অভি

চাকিয়া, সুন্দর মুখখানি বাহির কবিয়া, উদ্ধৃষ্টে বরগা পানে তাকাইয়া
অনমনস্ক কি ভাবিতেছে ।

যুবক নিজ দ্বাভাবিক স্বরে ডাকিল,—সবম! সবম চমকিয়া উঠি, নয়ন
ফিরাইয়া যুবকেব দিকে চাহিল—দেখিল । অসিদ্ধ বাবু তাহার খটোয় পার্শ্বে
দণ্ডায়মান । অমনি বক্তিমবর্ণ মধুর অধরপ্রান্তে সুন্দর সর । হাসি
বিকসিত হইল । যুবকেবও অধরপ্রান্তে মন মাতান মধুর হাস্যরেখা
ক্ষুব্ধিত হইল । যুবক সরমের সবল হাসিব পূর্বকার স্বরূপ সরমের বক্তিমগণ্ডে
চুষন করিল, যেমন মেঘাবৃত চন্দ্র মেঘযুক্ত হইয়া ধবায় সুনিম্ন নিক্ত সুধাবাণি
ঢালিয়া দিল । ধবাও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সুধাবাণি পান করিয়া বিভোর হইল ।
এই সুখ সময়ে বাহুসদৃশ একটি কুশাজি স্ত্রীলোক অন্তরালে থাকিয়া ইহা দেখিল,
দেখিয়া কুটিল হাসি হাসিয়া আবার অন্তরালে লুকাইল ।

সহসা ইহা দেখিয়া চন্দ্রমুখি সবম সন্তয়ে লজ্জায় সমুচিত্ত বিবর্ণ হইয়া মলিনমুখ
মলিনে লুকাইয়া বাখিল । মৃদু মৃদু সংক্ষুব্ধ স্ববে বালি, “দিদি মা! দিদিমা!”
প্রশান্ত যুবক চকিতে কবিয়া দাঁড়াইল পরক্ষণে দেখিল সবমের দিদিমা হাসিতে
হাসিতে সেই কক্ষে প্রবেশ কবিল । হাসিতে হাসিতে অসিদ্ধবাবুকে লক্ষ্য
কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিল । নাতির এ কদিন কি হয়েছিল, আসনি কেন?
আমবা মনে করেছিলাম, তুমি বুঝি আমাদিগকে একেবারে ভুলে গেলে ।
তা নয় দুব্বি মেরেছিলে । তা ভাই বেশ করেছিলে । কিন্তু তোমার সবমের
এক একবার গৌজ খবর লওয়া উচিত ছিল ।”

অসিদ্ধবাবু সমজ্জ, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া উত্তর দিল, “সে কি দিদিমা
সবমের গৌজ লইব না । এ ও-কি হইতে পারে । তবে একদিন আসিতে পারি
নাই । তার বিশেষ কারণ ছিল, আমাব বরাহনগরের রেওতদিগের মধ্যে কিছু
গোলযোগ ঘটে । তাই মেটাতে, আমায় দিনকতক তথায় যাওয়া আসা কবিতে
হইয়াছিল, তাই আসিতে পারি নাই, তাই সরমেব খবর লইতে পারি নাই ।
কিন্তু দিদি মা তুমি একপ মনে কোবো না যে, আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম । কাশ
যখন আমি বাহ্যে খান কতক ঢেক ভাঙ্গাহতে যাই । তখন পণে ইন্দুবাণুর
সহিত আমাব সাক্ষাৎ হয়েছিল, তার নিকট হইতে আমি সবমের খবর লয়ে
ছিলাম । দেখ দেখি দিদি মা তুমি আমাকে মিছামিছি দোষী কনছিলে ?”

অসিদ্ধবাবু শেষের এই কথা শুনি তাঁৎসামি বনিয়াছিল । এবং ইহাব
কি উত্তর দেয় শুনিবাব অপেক্ষায় সবমের দিদিমাব মুখের দিকে চাহিল ।

কিন্তু সরমের দিদি মা উত্তর দিল না। সে কি অসিদ্ধের কথার শেষাংশ পর্য্যন্ত শুনিয়েছিল যে উত্তর দিবে। সরমের দিদি মা অসিদ্ধ বাবু যথের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। যাহু আর যাও কোথা এইবার জালে পড়েছ! এইবার দেখব তুমি কেমন—তুমি কেমন নিবাসিস। এইকপ মানসিক গুপ্ত অভিসন্ধি মনমধ্যে চাপিয়া উত্তর না দিয়া কহিল। সে যাহা হউক নাতি, আমার বাছা কাসির জন্ত বড় কষ্ট পাচ্ছে। ওদিকে তোমাব ঔষধ বেশ নরম পড়েছিল। আবার তুমি যে কয়দিন আস নাই। সে কয়দিন আমার বাছাব পেটে একবিন্দু ঔষধ পড়ে নাই। তাই বাছার কাসি আবার বেড়েছে। আর বাছা টানা টানির সংসার তুমি ত জানই, তাতে কোরে ডাক্তার খরচ যোগাই কোথু থেকে।

অসিদ্ধ বাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, সে কি! ইন্দুবাবুকে এ কথা জিজ্ঞাসা কবিয়া ছিলেম। তিনি বলিলেন, সরম ভাল আছে, তার কাসি খুব নরম পড়েছে। সরমে দিদি-মা আবার সুর ফিরাইয়া বলিল, “হ্যা—কম—পড়েছে বুটে; কিন্তু দিনের বেলায় একটু থাকে ভাল, তবে রাত্রিতে যেন একটু বাড়ে।” অসিদ্ধ বাবু একটু হাসিলেন বলিলেন “ও কিছু নয়। আমি এইবার যে ঔষধ এনেছি, এতে আর বাড়বে না। ক্রমেই নরম পড়বে।” সরমের দিদি মা আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, “নাতি তুমি আছ বলিয়াই আমাদের কত সুসার, বাতে ভাল হয় তাই কর। আমি আর কি—জানি,—কি—বলব। তৎপরে ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া বলিল। আমি যাই, উলুনে দুধ চাড়িয়ে এসেছি। সরম উঠনা,—ধড়ি মেয়ে যা—হক, একজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে, আর তুমি শুয়ে থাক, ছিঃ! পান টান দাও, তোমায় শিখিয়ে শিখিয়ে পায়েম না।” বলিতে বলিতে দিদি-মা কক্ষের বহির্ভাগে গমন কবিল।

নবম পরিচ্ছেদ ।

সেই-কথা ।

তখন সরমের মনে হইল। তাহাব শীরদেশ হইতে একটী আপদ সরিয়া গেল। সরম নিশ্চিন্তে খটোজে উঠিয়া বসিল। অসিদ্ধবাবুও তাহাব পার্শ্বে উপবেশন কবিল। বলি, তুমি তাহা হইলে কাসিতে বড় কষ্ট পাচ্ছে? এই বলিয়া অসিদ্ধবাবু নিজ পকেট হইতে একটী নিশি বাহির কবিয়া সরমের হস্তে দিয়া বলিলেন, দেখ, তিন ঘণ্টা অস্তর এক কাঁচা জগে উহাব এক ঘোঁটা দিয়া

থাইবে; সরম আচ্ছা বলিয়া ঔষধের শিশিটী উপাধানের নিগে রাখিয়া দিল। পরে সরম অপেক্ষাকৃত অসিদ্ধবাবুর নিকট সরিয়া বসিল। বলিল, আজ বেশ নিরিবিলি, আজ তোমাকে সেই কথা বলিতে হইবে। অসিদ্ধবাবু হাসিয়া বসিলেন। কি কথা সরম! সরম নিজ স্বাভাবিক বিলোল কটাক্ষ অসিদ্ধবাবুর উপর নিক্ষেপ করিয়া আরও বুঁকিয়া—সুন্দর মুখখানি প্রায়—অসিদ্ধবাবুর নবমুকুলিত সূচাক গুপ্পের সন্নিকটে লইয়া গিয়া মৃদু মধুর সরম ভাসে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, তুমি আমায় যা বলবে বলেছিলে, সেই—কথা।” অসিদ্ধবাবুর সর্ব শরীরে তাড়িত প্রহার ছুটিল। অসিদ্ধবাবু সরমের মুখেরদিকে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। অসিদ্ধ বাবু উত্তেজিত হইয়া সরমকে বক্ষে টানিয়া লইল। এই সময় কি—জানি কেন অসিদ্ধবাবুর সর্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। এমন সময় অসিদ্ধবাবুর কি যেন মনে পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে অসিদ্ধবাবুর ভাবান্তর ঘটিল, সরম ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। সরলা বালিকা অসিদ্ধবাবুর বাহু পাস ছিন্ন করিয়া, দাঁড়াই, আগে দরজা দিয়া আসি। বলিয়া, আন্তে ব্যস্তে উঠিয়া দৌড়াইয়া গিয়া দরজার অর্গল বন্ধ করিয়া আগিল; পুন আন্তে ব্যস্তে খটানোপরি অসিদ্ধবাবুর পার্শ্বে আসিয়া বসিল।

অসিদ্ধবাবু কিছু অন্তর্মুগ হইয়া ছিলেন, বোধ হয়; ভাবিতেছিলেন, সরমকে তাহার মনোগত কথা বলিবে কি না,—বলা উচিত কি না। এই অন্তর্মুগ সময়োপযোগী কি না। পরে বিবেচনায় বলা, সাব্যস্ত করিয়া বলিল, “সরম! দেখ তোমাকে এমন গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব,—যে কথা প্রত্যহ আমাকে প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে নানাবিধ চিন্তা-তরঙ্গে নিক্ষেপ করে,—যে তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে আমি অবসন্ন হই, আমার চিত্ত বিভ্রম—ঘটে; এইরূপ গুটিকতক প্রশ্ন। দেখ,—সরম! আমি যখন আমার বন্ধু ইন্দুবাবুর অহরোধে তোমার বাড়ি প্রথম এলেম,—যখন আমি তোমার প্রথম দেখিলাম।—তুমি আমায় দেখিয়া ইন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি কে?—এই গুটিকতক কথায় তোমার—ছই একটী ভাব ভঙ্গিতে, তখনি আমার মনবোধে সহসা ঐ প্রাহেলিকা ময় প্রশ্নের উদয় হয়। তুমি এখানে কেন? তুমি কি বাস্তবিক এখান কার? সরম অসিদ্ধবাবুর এই শেষোক্ত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিল। এ—কি প্রশ্ন! অসিদ্ধবাবু আরো বলিলেন, সরম, তোমার মনমধ্যে এই ভাবের উদয় হইতে পারে যে, এ আমার কি নকম প্রশ্ন। কিন্তু কেন এ প্রশ্নের উদয় হইল। শোন। বাল্যকাল হইতে—আমার কেমন এক অভ্যাস দোষ, সাধারণ

ভদ্রাহুসাক্ষিণী, তাহা ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা বিপদ বা সম্পদ-সমূহ হউক, তাহার--সেই তবের যৎকিঞ্চিৎ রহস্তোদ্ভেদ করিতে পারিলেই আমার আশোদ । এই আশোদ লাভার্থ, আমার সকল স্থানে, সকল মস্ত্রদ্বায়ে সতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া গমনাগমন করি ; ইহাতে লাভের পরিবর্তে, বেশীর ভাগ আমাকে অপমান ও লজ্জিত হইতে হয়, তবু আমি এই ভদ্রাহুসাক্ষিণী অভ্যাগ ছাড়িতে পারি নাই ; ঐ যে কেমন একটা আশোদের লোভ, ইহাই অভ্যাগ পরিবর্তনের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে । বাহা হউক ; ইহার ফলেই বারাক্ষরী মহলে গিয়াছি, তথায় অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত একটিও দেখি নাই,—যেন এই স্থানে তুমি আমার নয়ন সমক্ষে প্রথম । তার পর তোমার সহিত আলাপ পরিচয় বনিষ্ঠতার, আমার ঐ ধারণা আর দৃঢ় হইল । আরও আমি উহাদিগের সহিত বাহু আশোদ করিয়া দেখিয়াছি, উহাদিগের প্রাণে প্রাণে, অন্তরে অন্তরে, নয়নের প্রতি কটাক্ষে কটাক্ষে, কালকূট ভরা বিষবান, অলক্ষিতে অতি-সংগোপনে অতি মাযধানে লুকাইত আছে । তাহার। অবসর বুঝিয়া ঐ কালকূট ভরা বিষবান নিষ্ক্ষেপ করিয়া, মুহূর্ত্তে অসাধ্য সাধন করিতে পারে । সরম ! আমি দেখিতেছি, উহাদিগ হইতে তুমি সম্পূর্ণ বিত্তিয়—সম্পূর্ণ নূতন—সম্পূর্ণ প্রভেদ—আকাশ পাতাল প্রভেদ । সরম ! তুমি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি । সরম ! তুমি এ জগতের কিছুই জানি না ! সরম ! তুমি এ পথের নও—তোমাকে এ পথে বঙ্গপূর্ব্বক আনা হইয়াছে,—তোমার আজ্ঞাতে, তোমাকে ধ্বনিত বিপদ-সমূহ নারকীয় জীবনোপায় বেষ্টাবৃত্তি দীক্ষায় দীক্ষিত করা হইয়াছে । আমি ইহার জন্ত বড়ই দুঃখিত, আরও দুঃখিত, কারণ তোমার পথপ্রদর্শকের চিত্তবৃত্তি কি দারুণ বিবাদ নির্মিত ভ্রম আবরণে জড়িত ! যে ভৌতিক নখর দেহের পরিণাম পঞ্চভূতে অক্ষয় মিলন, সেই ভৌতিক দেহের পুষ্টির জন্ত যুগিত বিপদময় বেষ্টাবৃত্তি উপায় অবলম্বন !—কি দারুণ পরিতাপ ! সরম ! তুমি জান না—তুমি এখন কি ! তুমি কতদূর অসহায়, তোমার ভবিষ্য নিয়মর জীবনের পরিণাম কি ভীষণ ভয়ানক ! সরম !” —

এখানে বলা উচিত, সরম ইহার এক বর্ণও বুঝিল না, এতক্ষণ অসিদ্ধাবাবুর মুখ পানে চাহিয়া, তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতেছিল এবং মনে মনে ভাবিতেছিল,—আজ অসিদ্ধাবাবু এ—কি বল্‌চেন ! তৎপরে কথায় বালা দিয়া বলিল, “অসিদ্ধাবাবু আপনি আজ এসব কি বল্‌চেন ? আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ।” অসিদ্ধাবাবু তাঁহার কথিত কথা ছাড়িয়া দিয়া, সরমের জিজ্ঞাসিত

কথার উত্তরে বলিল, “সরম ! তুমি এসব কথা বুঝতে পারবে না ! সরম ! তুমি যেমন সুন্দর, তোমার অন্তরও তেমনি সুন্দর—সরম ! কেননা এসব কথা কেহ কখন তোমায় বলে নাই—তুমি কার নিকট গুন নাই ; তাই তুমি আমার কথা বুঝতে পার নাই ।

অসিদ্ধবাবু এই সকল কথা এমনভাবে, এমন উত্তেজিত স্বরে বলিতেছিল যে, তাহাকে তৎকালে মনের ছায়া প্রতীক্ষমান হইয়াছিল । সরম ইহার এইরূপ ভাব দেখিয়া কিছু শঙ্কিত হইয়াছিল, কিছু চঞ্চল হইয়াছিল, যখন বেগতিক দেখিল । তখন সরম নিজ ক্ষুদ্র করপলাব দিয়া অসিদ্ধবাবুর মুখ চাপিয়া ধরিল—বলিল, “ওগো ! তোমার পারে পড়ি, তুমি অমন চেষ্টা চেষ্টা কণা কণা ! দিদি-মা এসে পড়বে ! ওগো ! তোমার পারে পড়ি, তুমি চুপ কর ।” অসিদ্ধবাবু ইতি পূর্বে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল, কি বলিতে গিয়া কি বলিয়া ফেলিয়া ছিল ।

অসিদ্ধবাবু সরম কর্তৃক ঐরূপ বাধা পাইয়া, নিজ বাক্যের অপব্যয় বুঝিতে পারিল—আমি একি কহিতেছি—তাবিয়া লজ্জিত হইল—অপ্রস্তুত হইল । এইরূপে বেলা অবসান হইল ।

এইরূপ সময়ে সরমের দরজা কে ঠেলিল । সরম তাড়াতাড়ি অসিদ্ধবাবুর মুখ ছাড়িয়া দিয়া, ঐ দিদি-মা এসে পড়েছেন, বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল । সরমের দিদি-মা একটা প্রদীপ হস্তে সরমের কক্ষে প্রবেশ করিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, “ভ্রমণে পড়ে কিসের ঝগড়া কবু ? আমাদের মধ্যস্থত, আমি মিটিয়েদিব ।” বলিতে বলিতে সবমেন কক্ষান্তর দীপাগারে প্রদীপ রাখিল । অসিদ্ধবাবু কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দিদি-মা আমাদের ঝগড়া খবর তোমায় কে দিল ।” সরমের দিদি-মা হাসিল, “খবর আমার দেবে কে, আমি নিচেকার ঘর থেকে তোমার গলার আওয়াজ শুনে, মনে করণেম, বোকা মেয়ে, কি কথা নিয়ে বুঝি ঝগড়া বাধিয়েছে, তাই মেটাতে মধ্যস্থ হই এলাম ।” “ও তাই, তা তোমার আমবাব আগেই আমাদের ঝগড়া, আপসে মিটিয়া গিয়াছে ।” “তা হলেই হনো তাই, আমি আর নিচ্ছে কেন দোষের ভাগি হতে এসেছি ।” এ বলিয়া মুখ হাস্য সহকারে কক্ষান্তরে গমন করিল ।

দশম পরিচ্ছেদ ।

“কার ফটো ?—বেশত !”

বেলা প্রায় ৫টা পাঁচটা ! চোরবাগানের চৌরাস্তায় এখন লোকে লোকারণ্য । কলিকাতার যত রাজ পথ আছে । তন্মধ্যে এই স্থান সকল সময়ে, সকল দিকে, সকল রকমে জম জমাট !—বিশেষতঃ বৈকাল বেলায় ! যে দিকে চাহিবে, সেই দিকে দেখিবে,—গুলজাব ! উপরে চাও—দেখিবে, বারান্দায় বারান্দায়, রং বিরংয়ের তোয়াজে কোটা ফুল, ফুটিয়া বাহারে আছে । নিম্নে রাজপথের একদিক হটতে, অন্যদিকে চাও দেখিবে, ট্রামগাড়ি—বাড়ির গাড়ি, ছকরগাড়ির সারি সারি, পামাপাসি, চলন্ত গাঁদি লাগিয়াছে ! সমস্ত গাড়ি ঠানঠানি পূর্ণ আরোহি নইয়া, উদ্ধমুখে অধোমুখে—এই—এই—হৌই—হৌই রৈই—রৈই রবে ছুটিয়াছে !

আবার উহার মধ্যে, কোন কোন নব্য গৌথিন যুবক, বৈকালিক বায়ু সেবনার্থে টেঙামে চড়িয়া, বাড়ির বাহির হইয়া, বোধ করি,—পথ ভ্রমে, এই দিকে আসিয়া, ঐ ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া, বড়ই ফাঁপরে পড়িয়াছে । তাহারা না পারিতেছে ছনিয়ার মজার দিকে, নজর ফিরাইয়া, আশ্চর্য আশ্চর্য বাহারে চলিতে, না পারিতেছে কমরতি বাহারুরি দেখাইতে ইত্যাদি রকম ফাঁপরে পড়িয়া পুনিসের উপর একটু বিরক্ত হইয়াছেন, কেন না বড় বেবন্দোবস্ত !

কি করিবে মনের ছুঃখ মনে চাপিয়া, গাঁদির ভিতর দিয়াই চলিয়াছে । ফুটপাতে চাও, দেখিবে—বিরস বদন কেরাণী বাবুগণ, অফিসের ফেরতা, কেহ চিন্তাভাব, কেহ দেহভারে, কনের পুতলি মাজিয়া চলিয়াছে । উহাদিগের মধ্যে যাহাদের ক্ষণে ক্ষণে প্রাণ খানাপ হইয়া মন ছুঃ করে, তাহারা সেই ছুঃ কয়াইবার নিমিত্ত পথপার্শ্বে মামার দোকানে ঢুকিয়া, গ্লাস গ্লাস ভোর—চুকু চুকু চড়াইয়া, সাদা প্রাণে চলিয়া, কেহ বারান্দার শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে টাল খাইয়া চলিতেছে, আর ভাবিতেছে—ইহারা স্বর্গের পারিজাত লক্ষপাল জোরে মর্ত্তে আসিয়া ফুটিয়াছে । আর যিনি বেরসিক, তিনি ভাবিতেছেন—ইহারা পুতিগন্ধময় অন্নকার নরকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোনাকি পোকা টিম টিম জ্বলিতেছে । এইরূপ নানা লোকে, নানা ভুচ্ছ আয়োচনার বশবর্তী হইয়া বামাভিমুখে রওনা হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে পকেট মারায় অভাব নাই । ইত্যাদি নানা প্রকার !

এই সময় শান্তবাবুও অফিসের ফেরতা বাড়ি ফিরিতেছেন । তাহার গা-
ধানে থান ধুতি, তাহার উপর চাপকান, স্কো একখানি পাট করা শাল, পদে
হাপ মোজা ও চিনাবাড়ির এক জোড়া বার্ণিস করা জুতা । হস্তে একখানি
ফ্রেমে বাঁধনে ছবি ও মুখে চুকট গুঁজিয়া, রাজপথ দিয়া বনাবব উত্তরাভিমুখে
চলিয়াছে । ইহার বিপরীত দিক দিয়া, মণিলালবাবু একটি পারিষদের মাহত
নিজ টেম্পে চড়িয়া আসিতেছিলেন । মণিলালবাবুর বাবান্দার্কমিত উর্দ্ধ চক্ষু
চক্ষু, হঠাৎ শান্তবাবুর দিকে আকর্ষিত হইল । অমনি ক্ষণিক যাঁকতামের
বাজাবে গাড়ির বেগে সংযত করিতে কবিত্তে “শান্তবাবু!”—শান্তবাবুর দৃষ্টি
মণিলালবাবু আকর্ষণ করিলেন । অমনি চারি চক্ষুর মিলন—অমনি সঙ্গে সঙ্গে
উভয়ের অধরপ্রান্তে হাসি ফুটিল ।

শান্তবাবু তাহার গাড়ির নিকট গমন করিতে না করিতে মণিলালবাবু
তাহার নিকট আসিয়া বলিল, “আমি তোমার বাড়িতে যাইতেছিলাম, পথে
দেখা হইল—বেশ ভালই হইল ! এস গাড়িতে এস ।” শান্তবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে
গাড়িতে চড়িলেন । পারিষদ ইজিত অনুযায়ী পূর্বাভিমুখে গাড়ি হাকাইলেন ।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল শেষ হইল । মণিলালবাবু জাব কোন কথা না কহিয়া
শান্তবাবুর হস্ত হইতে সেই ছবিখান, নিজ হস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,
“কি ছবি হে ? ওঃ !—ফটো ! বেশত কার ফটো হে ?” শান্তবাবু বলিলেন,
“আমার জীর ফটো । বল কি ! মণিলালবাবু ফটোখানি অনেক বেশ নিবিষ্ট
চিত্তে দেখিল । দেখিয়া প্রত্যপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় তুলিয়াছেন ?
শান্তবাবু বলিল, “বেঙ্গল ফটো ষ্টুডিওতে ।” এইখানে ইহাদের এই সকল কথা
শেষ হইল । তৎপরে, মণিলালবাবু শান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন ইন্দুবাবু
কোথায় ?—বাড়িতে না ওখানে ? শান্তবাবু বলিলেন, “সম্ভবতঃ এখন বাড়িতে
থাকিবার কথা, কেন—ঠিক হইয়াছে নাকি ?” মণিলাল বাবু মুচকিয়া হাসিয়া
বলিলেন, “তা আর বলতে ।” শান্তবাবু বলিলেন, “তবে শুভ কাজ করিতে
বিলম্ব হইল কেন ?” “একটু ব্যস্ত ছিলাম” বলিয়া মণিলালবাবু বলিলেন, “এই
জন্ত আজ তোমার বাড়িতে যাইব মনে করিয়াছিলাম । আমার মতে আজই
কাজ শেষ হউক ।” শান্তবাবু এক গাল হাসিয়া বলিলেন, “তাই হউক বৃথা
বিলম্ব কেন ?”



একাদশ পরিচ্ছেদ ।

কি ঘণার কথা ! কি লজ্জার কথা !!

ঋধুসুদন বাবুর সাবেক নিবাস দত্তক গ্রামে । ইনি কলিকাতার কোন বিদ্যালয়ে সুশিক্ষিত হন । পরে কলিকাতা মহানগরীর অটনক সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাবু বামলাল সরকার মহাশয়ের সুপারিসে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের মৈনিক বিভাগে কমিসিওনরেটে চাকরী প্রাপ্ত হন । এবং তাহাতেই বিপুল ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হন । শেষ জীবনে কাস রোগাক্রান্ত বশতঃ কর্মে অবসর গ্রহণ করিয়া পেনসন ভোগী হন । ইনি শেষ জীবনে শাস্তি সুখের অধিকারী হন নাই । কাস রোগ ও দাকন মনপীড়া তাঁহাকে আরও জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল । তিনি পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে একমাত্র সন্তান ইন্দুবাবুকে রাখিয়া নিজ সহধর্ম্মিনীকে অগাধ ছুংখ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া, এই জালাময় জগৎ সংসার হইতে বিদায় লইয়াছেন ।—ইন্দু-জননী উপযুক্ত পুত্র মুখ দেখিয়া, স্বামী শোকে যৎকিঞ্চিৎ প্রবোধিত না হইয়া, বরং তাঁহার শেকাবেগ আরো উৎলিখা উঠিয়াছে । কারণ সন্তান অবাধ্য তাঁহার অভাবে তাহার পরিণাম ঘোর অমঙ্গলময় ।

ইন্দুবাবু, তাঁহার স্বর্গীয় পিতার আন্তেষ্টিক্রিয়া সুসমাধা করিয়া কেবলমাত্র চারি দিন বাড়ির বাহির হয় নাই । ইন্দু-জননী মনে করিলেন, এইবাবু বুঝি মা-সর্ব্ব মঙ্গলা মুখ তুলিয়া চাহিলেন । ওমা তা নয়, যে ইন্দু,—সেই ইন্দু, আবার বাড়ির বাহির হইল । আবার চব্বিস ঘণ্টা বাহিরে কাটাইল ; কেবল হৃদয়স্থির সময় একবার আসে । বারণ কয়ে —হিতকথা বলতে গেলে, চোক রাঙ্গিয়ে কথা কয়—মারতে আসে । ওমা যাব কোথা ! পেটের ছেলে—সে আবার চোক রাঙ্গিয়ে কথা কয়—মারতে আসে । কি ঘণার কথা কি লজ্জার কথা অ্যাঃ ইত্যাদি কত কথা ; ইন্দু-জননী তাঁহার প্রতিবেশীবাগুনদের মেজগিল্লির নিকট এইরূপ মনো বেদনার কাহিনী জানাইয়া ছুংখ প্রকাশ করিতেছিল । আর বাগুনদের মেজগিল্লি—আজ কাল কলির ছেলেরা সব পারে,—তা কি করবে মা ! পেটের ছেলে ফেলতে পারবে না । এইবার একটি টুকটুকে মেয়ে দেখে বিবাহ দাও । “তা মা, অনেক সম্বন্ধ এসেছিল, আমাদের কর্তার মত হইল না । ওপাড়ার সেনাদের বাড়ি হইতে আজ ছইয়াস হইল সম্বন্ধ এসেছিল, মেয়েটি দেখতে বেশ !—আহা ঘেন মাফাৎ

লক্ষী ! আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল সেই, মেয়েটির সহিত শুভকার্য্য করিতে, কিন্তু তা হইল না ; কর্ত্তা যে টাকা চাহিলেন, তা শুনিয়া উহারা পেচপাত হইল ।” ইত্যাদি অন্তপুরে বসিয়া ছুই জনে, এইরূপ সুখ—দুঃখের কথা কহিতেছেন । এমন সময়ে ঐ আসিয়া সংবাদ দিল যে, “শান্তবাবু আর ছুইজন ভদ্র লোক এসেছেন । আমাদের দাদাবাবুর সহিত দেখা করিবার জন্ত তাঁহারা বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছেন ; আর তাঁহারা বলিলেন কি ! তোমার দাদাবাবুর সহিত বিশেষ দরকার আছে,—তুমি একবার তাঁহাকে ডেকে দাও । হা-মা ! দাদাবাবু কি বাড়িতে আছেন ?” ইন্দুর মা বলিলেন, হ্যাঁ আজ আর বাহির হয় না নাই । ঘরে আছে ; তুমি গিয়া ডাক না ।”

ঐ, ইন্দুবাবুর কক্ষে গিয়া দেখিল,—ইন্দুবাবু কি লিখিতেছেন, ঐ অপেক্ষা না করিয়া কহিল, “দাদাবাবু! তোমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্তে শান্তবাবু আর ছুইজন ভদ্রলোক, বার বাড়ির বৈঠকখানায় অপেক্ষা করছেন ।” ইন্দুবাবু ঐর মুখের দিকে চাহিয়া অন্তমনস্ক বলিলেন, “শান্তবাবু আর ছুই জন ভদ্রলোক ! তাঁরা কে ?” তাহার পর কহিল, “আচ্ছা যাও—আগি যাচ্ছি ।” বলিয়া ইন্দুবাবু আপাততঃ লেখা বন্ধ করিয়া সদর অভিমুখে বৈঠকখানায় চলিলেন । বৈঠকখানায় আসিবারকালে, ইন্দুর মাতা ইন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “শান্তবাবুর সঙ্গে কি দরকার ?” ইন্দুবাবু বোধ হয়, তাহার জননীর জিজ্ঞাস্তা শুনিতে পান নাই, অথবা শুনিয়াও কোন উত্তর না দিয়া, অরিত পদে নিম্নে নামিয়া গেলেন, ইন্দুবাবু বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলেন, শান্তবাবু ও মণিলালবাবু পরস্পর কি কথা কহিতেছেন, আর একটি ভদ্রলোক মৌনি হইয়া তাঁহাদিগের কথা শুনিতেছেন । ইন্দুবাবু আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে বিলক্ষণ সদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে করিতে আসন গ্রহণ করিলেন ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

শুভস্ব শীত্রে ।

তৎপরে কিছুক্ষণ রমালাপের পর মণিলাল বাজে কথা ছাড়িয়া কাজের কথা পাড়িলেন—বলিলেন, “সে দিন তুমি টাকার কথা পাড়িয়া আসিয়াই নিশ্চিত আছে, আর তোমার দেখা নাই । আমি তোমার টাকা যোগাড় করিয়া তোমার ঘরে উপস্থিত ।” হাসিতে হাসিতে মণিলালবাবু এই কথাগুলি কহি-

লেন। ইহা শুনিয়া ইন্দুবাবু যেন, স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। আনন্দে উৎসাহে তাহার বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, ক্ষুধা সহকারে কহিল, “বলেন কি মনিলাল বাবু! সব টাকা যোগাড় করিয়াছেন?—আপনি আমায় চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিলেন; আমি বিশেষ ভাবিত ছিলাম,—মনে করিয়াছিলাম? আমার বন্ধুগণের নিকট আর মুখ দেখাইবার পথ রহিল না। কারণ ইতি মধ্যে একদিন রাত্রিতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় আপনার বাড়িতে গিয়া মহাশয়ের ঘরবানের মুখে শুনিয়াছিলাম, আপনি পার্টনার বিশেষ প্রয়োজন উপলক্ষে আপনার ভ্রাতার নিকট গিয়াছেন। আমি এইরূপ আশা করি নাই, আপনি এত শীঘ্র আসিবেন, বাস্তবিক আমি এই নিমিত্ত যে কি পর্যন্ত চিন্তিত ছিলাম তাহা আমিই জানি। সে যাহা হউক এখন সুখবর যথার্থ? শান্তবাবু ঠাট্টার ছলে বলিলেন, “তুমি কি মনে কর?” “আমি মনে করি সত্য।” শান্তবাবু মুহূর্ত্ত হাসিয়া কহিলেন, “তবে তাই।” পরে মনিলালবাবু হাসি-কথায় বলিলেন, “ইন্দুবাবু আমাদের যে কথা মেই কাজ।” ইন্দুবাবু বলিলেন, “তবে আমাকে—আমাকে আপনার নিকট কবে যাইতে হইবে?” মনিলালবাবু বলিলেন, “সেখানে আর কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না, উপস্থিত আমার নিকট সমস্ত গজুত আছে,—আপনি প্রস্তুত হইলেই হয়।” “বলেন কি মনিলালবাবু! প্রথমে এক কথা আমি তামামা মাত্র মনে করিয়াছিলাম। আমার উপর আপনার এত অত্যাচার! বেশী কি বলিব মনিলালবাবু! আপনি আমায় কিনিয়া রাখিলেন এবং কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না।” নির্ঝোঁধ ইন্দুবাবু গলিত প্রাণে মনের উল্লাসে কৃতজ্ঞ-নমিত-ভাবে ঐ কথাগুলি বলিল। ইহা শুনিয়া মিথ্যা লুপ্ত ছদ্মবেশী অজ্ঞাত শত্রুরূপী-মিত্র মনিলালবাবুর কুটিল মস্তিষ্ক স্তরের নিভৃত প্রদেশ বাসিনী শূন্য-কায়া কুহকিনী, শব্দহীন—নিরব—হাস্ত সহকারে বলিল, মুখ তোমায় এখন ক্রয় করি নাই—তোমায় ক্রয় করিব বলিয়া তোমায় যথা সর্বস্বঃ লইব বলিয়া, তোমায় উপর আমার এই স্মার্ত্তসিদ্ধিসূচক নির্ধাত অত্যাচার। তৎপরে পিশাচ-আবৃত্ত কুহকিনী, ইঙ্গিতে কুহক জাল বিস্তার করিয়া, বিজ্ঞ শব্দ-রূপে পিশাচ-মুখ নিসৃত হইয়া প্রকাশ হইল, “ইন্দুবাবু তুমি এই সকল কথা বলিয়া কেন আমায় লজ্জিত করেন, এমন কি উপকার করিলাম যে, আপনাকে ক্রয় করিয়া রাখিলাম; ও সব কথা ছাড়িয়া দিন, আমি উহাতে বিশেষ লজ্জিত হই।” নষ্ট চতুর ইন্দুবাবু মনিলাল বাবুর এই ছল ক্রমায়িকা-তায় দীর্ঘ অপ্রস্তুত হইলেন।

এই সময় মণিলাল বাবু, শাস্ত্রবাবুকে টেবিলের উপর হইতে মস্তাধার, লিখনী, ইন্দুবাবুর সম্মুখে আনিয়া রাখিতে, ইঙ্গিত করিলেন। পরে নিজ বজ্রাভ্যন্তর হইতে একখণ্ড কাগজ ও একটি রসিদ ষ্ট্যাম্প বাহির করিয়া ইন্দুবাবুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। শাস্ত্রবাবু ইঙ্গিত মাত্র ইতি মধ্যে মস্তাধার ও লিখনী বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখন তিনি স্মরণ দেখিয়া, নীরব হস্ত সহকারে, শুভ্র শীঘ্র আর বিলম্ব কেন? ইন্দুবাবু ভাবিলেন, তাই ত আর বিলম্ব কেন! এখন বিলম্ব করিলে আমার উপস্থিত মোতাগ্যের হতাতর করা হয়। তজ্জন্ত ইন্দুবাবু আর কাল বিলম্ব না করিয়া শুভ কার্য্য শীঘ্র সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আর মণিলালবাবু ইন্দুবাবু লিখনী সঞ্চালন দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিলেন। একবার গাঁথিতে পারিলে হয়, তারপর তোমায় মনের মাধে খেলাই। শাস্ত্রবাবু ভদ্র ধীরে মহাশয়ের দৃষ্টির আকর্ষণ করিয়া ভাবিতেছিল, যে দিক দিয়া হউক, আমার কিছু হইলেই হইল। ইহা হইতে তোমরা বাচ আর মর। আর সেই নব পরিচিত ভদ্র লোকটি ভাবিতেছেন, মনিয়ার রূপিয়া রোজগারের ফিকিরে বলিহারি যাই! যাই হ'ক এই ভাবাভাবির সন্ধিস্থলে ইন্দুবাবু চড় চড় করিয়া বন্দোবস্ত মতানুযায়ী ১৫০০ দেড়হাজার টাকা প্রাপ্য স্বীকার করিয়া, হাওনোট লিখিয়া দিয়া, রসিদ ষ্ট্যাম্প নিজ নাম সহ করিলেন। পরে বিনা বাক্যব্যয়ে শাস্ত্রবাবু ও সেই ভদ্রলোকটি সাক্ষি স্বরূপ ঐ হাওনোটে নিজ নিজ নাম সহ করিলেন।

এইরূপে হাওনোট কাটা সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য শেষ হইল। মণিলাল বাবু বজ্রাভ্যন্তর হইতে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া, ইন্দুবাবু হস্তে দিলেন ও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “দেখ উহাতে একখানা নোট কম আছে, দিন কতক গোনে আমি তোমাকে দিব,—বুঝিলে?”

ইন্দুবাবু মণিলাল বাবুর কথায় কান রাখিয়া, কোন কথা না কহিয়া, নোটগুলি একে একে গণনা করিয়া দেখিল, নয়শত টাকার নোট তখন তিনি মনে করিলেন, ইহা উপরি লভ্য, এই জন্ত কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া, মণিলাল বাবুর কথায় সম্মত রহিলেন। কিন্তু পরে মণিলাল বাবু অঙ্গিকার মত, ঐ এক শত টাকা চুকাইয়া দেন নাই। যাই হ'ক, মণিলাল বাবু উক্ত ব্যাপার অতি সূক্ষ্মশীল সম্পন্ন করিয়াছেন, মনে করিয়া, আনন্দে ইন্দুবাবুকে আপ্যায়িত করিয়া সে দিনকার মত কোশলীগণ সহ বিদায় লইয়া খাটি অভিমুখে গমন করিলেন। আর আমাদের ইন্দুবাবু বক্ষ ক্ষীণ করিয়া আপনা

আপনি বলিতে লাগিল । 'আর আমার পায় কে, এইবার ছই ডানা বাহিব
করিয়া মনের সাধে উড়িব । দেখিব, কে আনায় বাধা দেয় ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

হাতে টাকার কাঁড়ি ।

ইন্দুবাবু যে দিন হাওনোট কাটিলেন । সেই দিন তাঁহার অতুল আনন্দ
আনন্দ হইবারই কথা । কেবলমাত্র নাম সহ কবিতা একেবারে এককালীন
এতগুলি টাকা হাতে আসিয়া পড়িল । ইহা কি কম আনন্দের কথা, কম
স্বাস্থ্যের কথা । এইরূপে টাকা লওয়ার ভবিষ্য পরিণাম যত বিষম হউক
না কেন,—উপস্থিত আগোদ প্রমোদ করিয়া নবাবি আনা কামদায় চলিয়া
সকলের নিকট—আমি একজন মোড়োল সাজিয়া, বাহাছরি দেখাইতে
পারিবেন ত । ইহা হইলেই ইন্দুবাবুর যথেষ্ট । ইহা পাইলে বোধ করি,
ইন্দুবাবু ইচ্ছাও তুচ্ছ মনে করেন ।

ইন্দুবাবুর আনন্দ করিবার আরও কারণ আছে । ইন্দুবাবুর বাৎসরিক
এককালীন এতগুলি টাকা কখন হস্তগত হয় নাই । তবে এতগুলি না
হউক, কিছু কিছু হইত । তা আবার কেমন করিয়া, মায়ের বাস ডাকিয়া
কোন নিঃস্বার্থ পরায়ণ পরামর্শ-দাতা-বন্ধুর গুপ্ত পরামর্শে, স্থল স্থলের প্রা-
লোভনে পড়িয়া ঘরের ভাল ভাল মূল্যবান সামগ্রী গোপনে আনিয়া পরামর্শ
দাতা-বন্ধুর নাসায়ে হউক কিম্বা অন্য কোন উপায়ে হউক, উহা অল্পমূল্যে
বিক্রয় করিয়া ২০।২৫শা যাহা হইত, তদসমুদয় সরমের পাদপদ্মে অর্পণ
করিয়া, সরমের দিদি-মার মনতুষ্টি সাধন করিতে যত্নবান হইত । ইহাতে
তবুও মনখুশি রহিয়া যাইত । কেন রহিয়া যাইত ? বুঝি খাতির অটুট রহিল
না—বুঝি দিদি-মার প্রাণে—কিন্তু থাকিয়া গেল । এইরূপ অন্তর বহমান
চিত্ত তরঙ্গে তাঁহার অন্তর সদাই ইতঃস্তত করিত । ইহা হইবারই কথা !
এইবার তাঁহার দিদিমার প্রাণের কিন্ত অপসারিত হইয়া তাঁহার মনক্ষুণ্ণতা
টুটিয়া, খাতির সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে । ইহাই হইল, আনন্দের প্রধান বিষয়,
ইহা ভাবিয়া ইন্দুবাবুর প্রাণে, তাই আজ অতুল আনন্দ । 'সেই দিন—
এই উচ্ছাসিত আনন্দ তরঙ্গে পড়িয়া, ইন্দুবাবু সেই টাকার সংব্যবস্থা

বিষয়ে মনোযোগী হইতে পাবেন নাই । অধিকন্তু আনন্দ বিকায়ে তাঁহার শরীর জ্বর-জ্বর হইয়াছিল ।

যাই হোক, পরদিন অনেক পৰিমাণে আনন্দ বেগ উপশমিত হইলে, বিবলে—এক প্রান্তে বসিয়া, টাকাব ব্যবস্থা বিষয়ে মনোযোগী হইলেন । ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন—সবামব সামান্য রকমের একশ্রুট অলঙ্কার বস্ত্রাবরণ ও নগদ কিছু টাকা, আপাততঃ ইহা দিলেও চলিবে, ইহাতে আব কত খবচ হইবে । সর্বনগেত ৫০০ টাকা হউক,—আবার কি ? আর বৃদ্ধ গণের প্রীতি ভোজের নিমিত্ত ২৫০ টাকা এবং আমাকে ১৫০ সামান্য রকমেব পকেট খরচের জন্ত রাখিয়া দিতে চাইবে, ইহা না হইলে চলিবে না এবং ইহাতে যদি কিছু অকুলান পড়ে ; তখন মাযের নিকট যে কোন প্রকারে হোক আদায় হইবে । তাবপর মণিলাল বাবু—আমার বাঁধা হাতি, আমার মুটোর ভিতর বাঁধা আছে । যখনই এইরূপ নাম সহ করিব । তখনই আমার হাতে টাকা—নগদ করুকরে টাকা ।

ইন্দুবাবু এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া নিষ্কারণ করিয়া, অবশেষে সরসেব বাড়িতে গেলেন । সেখানে গিয়া দেখিলেন ? অসিন্দুবাবু আসিয়াছেন । অসিন্দুবাবু ও সরস, দুইজনে পবম্পর হাসিয়া হাসিয়া কত কথাই কহিতে ছিল । ইন্দুবাবু অসিন্দুবাবুকে তৎকালে তথায় দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য হইলেন । কারণ স্বহৃদ সৎপরামর্শদাতা মন্ত্রী—শাস্ত্রবাবু, তখন অফিসে গিয়াছিলেন । স্বজ্ঞরাং তাঁহার তাত্ক্ষালিক বাঞ্ছনীয় গুণকাৰ্য্যের বিহীন মতামত দাতা মন্ত্রীর অভাব ছিল । এই নিমিত্ত ইন্দুবাবু অগভীর পঙ্কজিনী মধ্যে কাণ্ডারীবিহীন, অপরিজ্ঞাত, উপায়হীন নির্দোষ নৌকারোহীর স্থায় উপস্থিত কোন কর্তব্যতা অবধারণ করিতে না পারায়, আপনা আপনি কেমন বিরক্ত হইয়াছিলেন । এই হেতু, তদবস্থায় এমন সময়ে তাঁহাকে তথায় দেখিয়া, আপাততঃ পরামর্শ কবিবার পাত্র জুটিয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার মনে ক্ষুণ্ণির সঞ্চার হইল । ইন্দুবাবু, আনন্দে সরসের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বসিকতার সহিত আনন্দ ধ্বনি তুলিয়া, অসিন্দুবাবুকে আদর সম্ভাষণে পরিভূষ্ট কবিয়া বলিলেন, “নিরামিস মহাশয়ের গুণাগমন কতক্ষণ ? কহিতে কহিতে আসন গ্রহণ করিলেন । অসিন্দুবাবু বলিলেন, “হেথায় মহাশয়ের পদার্পণ পূর্বে অর্দ্ধ ঘণ্টা যতক্ষণ ।” ইন্দুবাবু বলিলেন, “এ সময়ে মহাশয়কে দেখিয়া আমার আনন্দ বিলম্ব ।” এইরূপে উভয়েব প্রীতি আলাপ সম্পন্ন হইল ।

সবম ইন্দুবাবুকে কহিল, “কাল তোমার জন্ম দিদি-মা, কত রাত্রি পর্যন্ত খাবার আশ্রয় বসিয়া ছিলেন, কাল তুমি আসনাই কেন? শান্ত বাবু আসিয়াছিলেন, তিনিও বাস তোমার জন্ম অনেক রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শেষে বাড়ি গিয়াছিলেন।” ইন্দুবাবু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, “কাল বড় অস্থির করিয়াছিল? তাই আসিতে পারি নাই।” সরম বলিল, “তা বই কি, মিছা কথা! আমরা বুঝি জানিতে পারি নাই, কাল তুমি যাহা করিয়াছিলে। শান্তবাবু সব দিদি-মার নিকট বলিয়া দিয়াছেন।” ইন্দুবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “শান্তবাবু দিদি-মাকে কি বলিয়া দিয়াছেন?” ইন্দুবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতে, তথায় সরমেব দিদি-মা আসিয়া দেখা দিলেন। সরমের দিদি-মা রক্তনের উদ্যোগে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া, ইন্দুবাবু আসিয়াছেন জানিতে পারিয়াও এতক্ষণ আসিতে পারেন নাই,—তাও কার্য্য বাকি রাখিয়া, উদ্বিগ্ন বশতঃ সরমেব কক্ষে আসিতে বাধ্য হইলেন।

সরমের দিদি-মা, ইন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন; “হ্যাঁ ইন্দু। কাল তুমি আস নাই কেন? আমি রাত্রি একটা পর্যন্ত তোমার খাবার কোলে করিয়া বসিয়াছিলাম। শেষে এই আসে, এই আসে করিয়া গিয়া শুইলাম। শীতালেব রাত্রি কতক্ষণ বসিয়া থাকা যায় বল? আর শান্তবাবু তিনি তে মার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া, শেষে বাড়ী গেলেন।” পরে সন্দিগ্ধ মনেব সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হ্যাঁ ইন্দু। কাল একটা কথা শুনিয়া ছিলাম। সেটা কি সত্য?” ইন্দুবাবু মুখটেপা হাসি হাসিয়া বলিলেন? “কি কথা দিদি-মা?” সবমেব দিদি-মা (একটু বাড়াইয়া) বলিলেন, “তুমি নাকি মণিলালবাবুর নিকট হইতে ২০০০ টাকার ছাওনোট কাটিয়াছ?” ইন্দুবাবু পূর্ববৎ হাসিয়া বলিলেন, “২০০০ টাকা নয়, ১৫০০ টাকা।”

তখন শান্তবাবুর কথা ঠিক জানিয়া সবমের দিদি-মা বলিলেন, “এ সব গুলি কেন? তোমার বিয়ের অভাব। মিছা মিছা অতগুলি টাকা নষ্ট করা কেন?” সরমের দিদি-মা উপবে দেখাইলেন এক ভাব, ভিতরে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। তাহার ইচ্ছা, আবও বেশী কাটিলে ভাল হইত, ইহাতে কি হইবে? হাতে মাথিতে কুলাইবে কেন? তৎপবে আচ্ছা এইত সব প্রথম, এখনও দিন পড়ে আছে, শেষে এই বলিয়া, মনকে প্রবোধ দিয়া আর কোন উচ্চ বাচা কান্দ না। এমন সময় আনন্দবাবু উঠিয়াছিলেন। ইন্দুবাবু

সরমের দিদি-মার কথা উত্তর সম্বরণ করিয়া, “তোমার সহিত জামার বিশেষ কথা আছে।” বলিয়া অসিদ্ধবাবুকে বসাইতে চেষ্টা করিলেন। অসিদ্ধবাবু আপত্তি করিয়া বলিলেন, —“না ভায়া আর নয়—বেলা হইয়াছে। এখন বাড়িতে গিয়া স্নান আহার করিতে হইবে।” ইন্দুবাবু বলিলেন—“আমিও যাব এখন—আমারও সব বাকি।” তখন অসিদ্ধবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “তবে এখনি দুজনে একসঙ্গে যাই চল না? তোমার প্রয়োজনীয় কথা পথে যাইতে যাইতে হইবে এখন, সেই ভাল না? ইন্দুবাবু সন্তুষ্ট হইলেন। সরমের দাদি-মা হুহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন। “ওকি—অসিদ্ধ! মানুষ বাহির হইতে আসিল—একটু বিশ্রাম করুক। আপনার যদি সবুর না হয়, আপনি আগে যান না কেন?”

উভয়ে দিদি-মার কথা না শুনিয়া গাত্র উত্থান করিলেন। যাইবার কালে ইন্দুবাবু বলিয়া গেলেন, “দিদি-মা ও বেলা শান্তবাবু আসিলে তাঁহাকে বসাইয়া রাখিবে।” “আচ্ছা” বলিয়া তৎপরে সরমের দিদি-মা ইন্দুবাবুকে বলিল, “আজ একটু সকাল সকাল এসো কালিকার মত ভোগাইওনা।” অসিদ্ধবাবুর উপর সরমের দিদি-মা চটিয়াছিল। কারণ ইন্দুবাবুর সহিত তাহার আরও কি কথা ছিল; অসিদ্ধবাবুর জন্ত হইল না। যাই হোক সরমের দিদি-মা সন্দিক্ত মনের সন্দেশ দূর করিয়া রক্ষন কণ্ঠের অনঙ্গাণ্ড উচ্চোগ সমাধানার্থে গমন করিল। যাইবার পূর্বে সরমকে বলিয়া গেল,—“ছাবি! খুব সাবধান,”—খুব খোসামোদ করিয়া চলিবে—বুকে? এইবার হাতে টাকার কাড়ি!

পথে যাইতে যাইতে অসিদ্ধবাবুর সহিত ইন্দুবাবু যে সকল বিষয় সম্বন্ধে কথা বার্তা হইয়াছিল। অসিদ্ধবাবু সেই সকল বিষয়ে উদযোগী হইয়া করা, তাঁহার পক্ষে অচ্যায় অসম্ভব, লজ্জার বিষয় বোধে, ইন্দুবাবুর প্রস্তাবিত বিষয় কোশলে, বিনত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন তিনি দেখিলেন, শান্তবাবুর না আসা পর্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে যিবেচনায়, অসিদ্ধবাবু নিকট বিদায় লইয়া বাটী অভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

“এই যে তুমি”

হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া ইন্দুবাবু টাকার বস্তি দেখিয়া হঠলে মণিলালবাবুকে বিদায় দিয়া, শান্তবাবু বাড়িতে যথা সম্ভব বিশ্রামে বেকালিৎ জলযোগ সমাপন
 ১৯০৭ খ্রিঃাব্দে ১১ নং চতুর্দশ পরিচ্ছেদে

আসিয়াছিলেন। তাহা পাঠক মহাশয়। সরমের মুখে শুনিয়াছেন। কিন্তু উনি কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলেন তাহা আপনি বোধ হয় অবগত নন। কেবল উহার স্বার্থ নিহিত মতলব অনুযায়ী, সেই টাকার ব্যবস্থা করণোদ্দেশ্য মাত্র। যখন উনি সে দিনকার মত নিরাশায় বাড়ি ফিরিয়াছিলেন। তখন পথে যাইতে যাইতে ও শয়ন কালিন,—এখন কি করা আবশ্যক—তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া, পছন্দ অনুযায়ী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই আজ মধ্যাহ্ন—ভোজন সমাপণ করিয়া অফিসে না গিয়া ইন্দুবাবুর বাড়ি গেলেন। সেখানে গিয়া গুনিলেন—ইন্দুবাবু বাড়ি নাই। কতক্ষণ হইল, বাহিরে গিয়াছেন। শান্তবাবু একেবারে নিরাশায় ডুবিয়া গেলেন। পরক্ষণে মনস্থির করিয়া অল্পমান করিলেন, এ সময় সরমের বাড়িতে থাকাই সম্ভব; না হইলে আর কোথায় যাইবে! তবে এখন সেইখানে যাওয়াই কর্তব্য বিবেচনায়, সরমের বাড়ি অভিমুখে গমন করিলেন। তথায় গিয়া গুনিলেন, ইন্দুবাবু ও অসিদ্ধবাবুর সহিত এই কতক্ষণ হইল যাইতেছেন। ইহা গুনিয়া, শান্তবাবু বড়ই আশ্চর্যভাবে বলিলেন, “অসিদ্ধবাবুর সহিত ইন্দুবাবু এই কতক্ষণ যাইতেছেন?—কি আপদ?” সেখানে তিনি আর দাঁড়াইলেন না। ভ্রান্ত পদে আবার ইন্দুবাবুর বাসাভিমুখে ছাটলেন। “ও শান্ত—শান্ত! শোন—শোন—ব্যাপার কি?—এত তাড়াড়ি কেন?” আর তাড়াড়ি কেন! শান্তবাবু একবার ফিরিয়াও দাঁড়াইল না। আর ফিরিয়া দাঁড়াইবে কি! এখন মন পাড়িয়াছে, তার ইন্দুবাবুর পাছু পাছু।

শান্তবাবু এ সময় তাহার পদযুগলের জড়তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ট্রাম-ওয়ে কোম্পানীর উপর ভারি বিরক্ত হইয়াছিল। কারণ ট্রাম ওয়ে কোম্পানী কেন এই সকল গাল খুঁজতে ট্রাম ওয়ে স্থাপন করে নাই। যাই হোক! ইন্দুবাবু যখন তাহার বাড়ির নিকটবর্তী হইয়াছেন। শান্তবাবু তখন সেই স্থানে উপনীত হইয়া তাহাকে ধরিলেন। এতক্ষণে শান্তবাবুর মনভার লাঘব হইয়া চিন্তা সুস্থির হইল। শান্তবাবু অব্যক্ত আনন্দ মুখ অল্পভব করিতে করিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে কহিল, “বেশ যা—হক!” আরও কি বলিও কিন্তু ইন্দুবাবু তাহাকে এই অসময়ে পাইয়া, উচ্ছাসিত আনন্দবেগে বলিলেন, “এই যে তুমি।” আম মনে বাঁধিয়াছিলাম, তুমি অফিসে গিয়াছ এহুংথায় শান্তবাবুর কথা প্রতীত হইয়া, আর না ফুটিয়া মুখ ধবরেই বিলীন হইল। উভয়ের আবহিচ্ছ বালিবার আবশ্যক হয় নাই। প্রাণী জগতের এই

সাক্ষাৎ বহমো পবম্পব বিলক্ষণ প্রীতিলভ কবিল, অতঃপূর্ব ইন্দুবাবু শান্তবাবুব সহিত বাটী প্রবেশ করিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। ইতিপূর্বে ইন্দুবাবু ঐ টাকার ব্যবস্থা, মনমধ্যে যেরূপ নিক্কাবণ করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় খুলিয়া প্রকাশ করিয়া বলিলেন। আবও বলিলেন, “এতক্ষণ তোমার জ্ঞান আমি কিছু কবিতে পারি নাই।” ইহা শুনিয়া শান্তবাবু বলিলেন, “আমিও তাই মনে কবিতেছিলাম, একে তোমার দিল দিয়া বিশেষ, তাহাতে তুমি কি কবিতে কি করিয়া ফেলবে। সেই জ্ঞানইত আমি অফিস কামাই করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত, ইত্যাদি বকম কথা শেষ হইলে। অতঃপূর্বে সেই সকলেব আয়োজন কবিতে হইবে, ইন্দুবাবু এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া, শান্তবাবুকে বৈঠকখানায় বিশ্রাম কবিতে বলিয়া, স্নানাহার মানসে অস্তঃপূর্ব মুখি হইলেন। এই অবসবে শান্তবাবু দিব্য করিয়া একঘুম ঘুমাইয়া লইলেন, তিনি যখন জাগ্রত হইলেন, তখন দেখিলেন, ইন্দুবাবু মধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধান করিয়া তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট। শান্তবাবু মুখ হাসিয়া চক্ষু কচলাইতে কচলাইতে উঠিয়া বসিলেন—বলিলেন, “তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ? আমায় ডাকিও নাই।” ইন্দুবাবু বলিলেন, “আমি আন্দাজ ১০ দশ মিনিট হইল আসিয়াছি, একটু বিশ্রামেব পর তোমায় ডাকিব মনে করিয়াছিলাম।” শান্তবাবু আব কোন কথা না কহিয়া, বাহির হইতে মুখ চোখ প্রক্ষালন করিয়া আসিলেন। ইন্দুবাবু অমনি ভবিত কন্ধ্যাব স্থায় ক্যান লইয়া প্রস্তুত হইলেন। পবে আব কাল বিলম্ব না করিয়া স্বকর্ম সাধনে উভয়ে তৎপর হইয়া চলিলেন। পথে গিয়া একখানি গাড়ি ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া হইল। গাড়ি কথা মত ববাবব বড়বাজাব আভ্যুথে ধাবিত হইল। অবশ্য পূর্বে হইতে ইহা স্থিরিকৃত ছিল। যাহা হউক, সেখানে গিয়া শান্তবাবুব আলাপি বজ্র বিজ্রোভাব নিকট হইতে উত্তম উত্তম পছন্দমত বেনারসী সাড়ি, মূল্যবান বেশমী বজ্রাবরণ ও পবিচিত পো-দারাদগেব নিকট হইতে ভাল ভাল ইংবাজ, বাঙ্গালা স্বর্ণালঙ্কার সহিত আরও কত কি খবিত হইল। বজ্রটে যাহা ধরা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খবচ হইয়া গেল। অবশ্য শান্তবাবুব প্রোবচনায় ইন্দুবাবুব নিমিষ্ট অভিপ্রায় অপেক্ষা খবচ বেশী হইয়া গেল। যাই হোক; শান্তবাবু ইহাতে বেশ দু-দশ টাকা পাইয়াছিলেন। তৎপরে ইতি কথ্য সূচাক্র কপে সম্পন্ন করিয়া সবমেব বাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

যথার্থ কি তাই !

ঠিক এই সময়ে সরমের দিদি-মা একটি লোকের সহিত গুপ্ত কথায় নিবত্ত ছিল। এই গুপ্ত কথা, আমাদের অসিদ্ধবাবু মন্থকে হইতেছিল। তাঁহার নাপক্ষে—নয় বিরুদ্ধ। তিনি একটি গুরুতর অপরাধ কবিয়াছিলেন। সে অপরাধ আব কিছু নয়। আজ সকালে ইন্দুবাবু যখন এখানে আনিয়াছিলেন, তখন অসিদ্ধবাবু তাঁহাকে বসিতে দেন নাই, তাঁহার সহিত সবমেব দিদি মার কত কথা ছিল, বডলোকি চালবাজ অসিদ্ধবাবু। তাঁহার একটিও মনের কথা, তাঁহাকে বলিতে দেয় নাই। ইহা কি রাগের কথা নয় ইহা কি চটানব কথা নয়। হোক না নে বড় লোক। এত খাতিব কিসেব যে তাব কথায় উঠা বসা। আব বুঝি বড লোক নাই, ইন্দু বুঝি তাব চেয়ে কম। সে হতভাগাও কেমন যে, তাব কথা শুনে। ইহা কি সবমেব দিদি-মাব প্রাণে সহ্যহয়। “এই বাব বাড়িতে ঢুকলে হয়, তাহলে যেটিয়ে আলম্বীকে বিদেয় করবো।” এইরূপ ব্যাপ্তবে সবমেব দিদি-মাব মস্তিষ্ক বড়ই ঝুঁকি হইয়া উঠিয়াছিল।

সরমেব দিদি-মার অন্তবে একেবারে এতটা বিবক্তি একসঙ্গে আসে নাই, ক্রমে ক্রমে, তিল তিল পরিমাণে, তাহার সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে এই বিবক্তি সঞ্চিত হইয়াছিল। সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, সময় অসময় নাই, অসিদ্ধ সরমেব মুখাটব নিকট মুখ দিয়া গুজুব-গুজুর ফুণ্ডব-ফুণ্ডব করিয়া, ছুইজনে কি সব কথা কয়—কি গল্প পবামর্শ করে। এই সকল ক্রমান্বয় দেখিয়া শুনিয়া, সবমেব দিদি মাব ইহা ভাল লাগিত না ভাল বোধ হইত না, কেমন একবকম মান্দহ হইত। এই সন্দেহের মূলে কি অসম্মল নিহিত আছে, তাহা সবমেব দিদি-মা বেশ ভাল বকম বুঝিতে পারিয়াছিল। একদিন সরমের দিদি মা অসিদ্ধকে দেখিয়া মনে কবিয়াছিল। শিকাব জালে পড়িয়াছে, এইবাব স্থখ আশা মিটিবে ভাল। এখন দেখিয়া শুনিয়া, তাহার সে ভ্রম ঘুচিয়াছিল। এখন বুঝিয়াছিল, এ শিকার নয় শিকারী। এই কাবণ, উপস্থিত আবাব ঐ কারণ। এতদিন ইন্দুবাবু বন্ধু বলিয়া খাতিব বাখিয়া চলিয়াছে। এখন আব চলিবে না, সহ অসহ একটা আছে ত। সবমেব দিদি-মা তাহাবাদিব পব নিজ কক্ষে বসিয়া, এইকপ বাগত চিন্তায় মোনমতি। আব একটি ব্যক্তি সেই কক্ষস্থিত পালঙ্কপরি বসিয়া, এই মোনমতি রাগত রমণীর প্রতি কটাক্ষ নিপাতিত কবিয়া আছে। এই লোকটির বয়স প্রায় চল্লিশ বর্গ মলিন, গঠন সুডে ল নহে কিন্তু ক্ষীণ ও স্তূঢ় মাংসাপক্ষীয়, আকাব ইন্দ্রিত শঠতা নৃশংসতা ব্যঞ্জক,

উহা কেমন ছদ্মবেশী অমাইকত' জ্ঞাপক, নয়নের কোণে হলাহলময় পঙ্খিল
 ও স্তম্ভভেদী মণ্ডম্পশি তিক্তদৃষ্টি মধ্যে কেমন প্রোচ্ছন্ন থাকিয়া। কেমন মধুবতাব
 ভাণ কবিতোছে। এ ব্যক্তি সরমের দিদি মাব নিকট ঝুঁকদাচ কখন আইসে,
 পবে দশ-পনের দিন গোপনে থাকিয়া, আবার কোথায় চলিয়া যায়—তাহাব
 সন্ধান বাখা দুক্ল। এ ব্যক্তির সহিত সবমেব দিদি-মাব সহিত কতদিনেব
 আলাপ কি সম্বন্ধ তাহা জানিবার উপায় নাই। শুধে অল্পমানের উপর
 ইহার ভিত্তি স্থাপন কবিলে, ইহার মীমাংসা এইকপ হয় যে, উহাদিগেব
 পাম্পরের ভাব ভঙ্গিতে বুঝা যায় উহাদের আলাপ পরিচয় বতকালেব, এবং
 সবম ইহাকে দাদাদহাশয় বলিয়া থাকে। তাহা হইলে সবমেব দিদি-মাব
 সহিত ইহাব কি সম্বন্ধ, তাহা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, সরম এই
 ব্যক্তিকে অত্যন্ত ভয় করিত। কেন যে ভয় করিত, তাহা সবম নিজেও ইহার
 কারণ নিদারণ কবিতে পারিত না। সরম কখন ইচ্ছাপূর্বক ইহার সম্মুখীন
 হইত না। আজ দেড় দিন হইল, এই ব্যক্তি বাড়ি ঢুকিয়াছে, এ পর্য্যন্ত
 সবম ইচ্ছাপূর্বক তাহাব কক্ষ হইতে বাহির হয় নাই। এই লোকটির নাম
 বড়গোপাল—ইনি প্রায় পাঁচ মিনিট কাল, ঐরূপ ভাবে সবমেব দিদি-মাব
 মুখ পাশে চাহিয়াছিল। পরে তাহার কথা কহিবার আগে, তাহাকে সে
 জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “আচ্ছা তুমি অসিদ্ধেব সম্বন্ধে যা বলিলে—যথার্থ কি
 তাই।” “হ্যাগো, হ্যা! ইহা তাই— তাই নয় ত আবার কি।”

যত সরমের দিদি-মাব উপর নিষ্কিপ্ত কটাক্ষ, মেজের উপর নিষ্ফেপ
 করিয়া “হম” পরে তাহাব কক্ষ গুঞ্জে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, “তাহা হইলে
 যাহাতে, অসিদ্ধ আব এ বাড়িতে না আসিতে পাবে, তাহার ব্যবস্থা তোমাকে
 আগে কবিতো হইবে। উপস্থিত ইহাব বিহিত আমি কিছুই করিতে পারিব
 না। কারণ কাল আগায় যাইতেই হইবে, না হইলে তাহাদের সকল পরিশ্রম
 পণ্ড হইবে। এখন বুঝিলে—কেন এ কথা বলিতেছি। আবার আট দশ
 দিনের ভিতর একবার আসিবে।” সরমের দিদি-মা তাহার কথায় বাধা দিয়া
 কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সহসা তাহারও কথায় বাধা পড়িল। কি
 একটা সাংঘাতিক গুপ্ত পরামর্শের সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইতেছিল।
 এমন সময় হিন্দুবাবুর আগমনে তাহার টনক নড়িল। সরমেব দিদি-মাব
 আর কথা কহা হইল না। অল্প সময়ে কহিব—এখন থাক, নিরিবিলি ভিন্ন
 হইবে না, এই বলিয়া অমনি সবমের কক্ষেব দিবে অগ্রসর হইল।

মনে কথিয়াছিলাম, এইবার হৈন্দুবাবুকে বেশ ছ-কথা শুনাইয়া দিবে । অমিত্রবাবুর সহিত এত—কিঙ্গের বন্ধুত্ব যে, তাহার কথায় উঠা-বসা । কিন্তু মুখ হইতে কিছুই বাহির হইল না । কারণ তাঁহার সহিত উপস্থিত নিবাত আয়োজন দেখি । এখনকাঁব মত, কতক আনন্দে ভুলিয়া গেল ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

“তার কোন মানে নাই ।”

আফিংয়ের চৌরাস্তা । এখন রাত্রি আনাজ, ১২।০ সাড়ে বারটা হইবে, রাজপথ এখন জনশ্রাণি হীন ; অগ্রশস্ত রাজপথের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দ্বিতল, দ্বিতল বিশিষ্ট বড় বড় অট্টালিকার একটিরও সদর ফটক খোলা নাই । এই সকল অট্টালিকার সুষুপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে, কোন কোন ব্যক্তির নামিকা ধ্বনি, জনহীন রাজপথে উছলিয়া পড়িতেছে । কোন কোন ধনী মাড়ওয়ারী মহাজনের শ্রমশীলতার পুরস্কার স্বরূপ, রোপা মুদ্রার বম্ বম্, শ্রুতিমধুর শব্দ লহরী, সেই সকল অট্টালিকার কোন কোনটিতে ক্রীড়া করিয়া, নিদ্রিত রাজপথে আসিয়া পড়িতেছে । তদ্ব্যতীত আর কোন প্রকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না ।

এইরূপ নিভৃত সময়ে মণিলাল বাবু পারিষদবেষ্টিত হইয়া, তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত নিজ বৈঠকখানায় দ্রুত ক্রীড়ায় মগ্ন । তাঁহার মুখ-মণ্ডল গভীর ভাবাপন্ন, ললাট পটে গভীর চিন্তা রেখা স্পষ্ট সন্মুখত ; বিন্দু বিন্দু স্বেদবাসি তাহার উপর সমুজ্জ্বল রহিয়াছে ; নয়ন পলকহীন, তাহাতে অস্তর ভেদী স্তম্ভীক দৃষ্টি, কুঞ্চিত যুগ্ম ভ্রুর নিম্নে চিক চিক করিতেছে । মস্তিষ্কের বুদ্ধিস্তর, সম্পূর্ণ আলোড়িত । যেন, তিনি তন্ন তন্ন করিয়া কোন অসম্ভব সম্ভব-কারী লুক্কায়িত বুদ্ধি—কৌশল অব্যেযণে নিরত । তাঁহার দর্শক পারিষদবর্গের মনোভাব এইরূপ না হউক—তাহারাও অতি উৎকর্ষ ঔৎসুক্যচিত্তে যেন, রুদ্ধধামে পলকহীন কুটিল কটাক্ষে, ক্রীড়ার ফলাফল দেখিবার নিমিত্ত ব্যস্ত । শুদিকে, মণিলাল বাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রীড়কগণের ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত । তাহাদিগের মুখাবয়ব ক্ষুণ্ণ ব্যঞ্জক, চক্ষু হাস্যরসে সমুজ্জ্বল, হাধ ভাবে ব্যস্ততার লেশ মাত্র নাই ; বরং তাহাতে কৌতুকের ছলনায় নিশ্চেষ্টতা পূর্ণ । যেন, তাহারা সকল বিষয় নির্ভাবনা । যেন,—তাহাদের সকল মনোরণ, আগ্রহ সহকারে অঙ্কলগ্ৰীহইবার আশায় হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইয়াছে । শুজ্ঞ এই

প্রতিদ্বন্দীপনের ঐ ভাব। কতক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর, প্রতিদ্বন্দীপনের জয় উল্লাসে সেই বৈঠকখানা পরিপূর্ণিত হইল। মণিলাল বাবু পরাজিত হইলেন; একেবারে ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা হারিলেন। মণিলাল বাবু, এই চিন্তাভার লাঘবে, আরাম নোদে ঘেন, উপাধানে শরীরখানি এলাইয়া দিলেন।

আজ দিন কয়েক ধরিয়া, কি জানি কেন মণিলাল বাবুর মানসিক ভাব অত্যন্ত মন্দ, সদাই চিত্ত চাকল্য, সদাই অন্তঃমনস্ক; তাই, প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দী ক্রীড়ক বন্ধুগণ, মণিলাল বাবুর মত দ্যুতক্রীড়ায় দক্ষ—অসাধারণ নৈপুণ্যশীল ব্যক্তিকে আজ অসহেলায় প্রতি বাজিতে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন। দ্যুত ক্রীড়ায় পশ্চাৎপদ বিমুখ মণিলাল বাবু, আজ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আগত বন্ধুজনের দ্বারা দ্যুত ক্রীড়ায় আহত হইয়া তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন মাত্র। তজ্জন্মই আজ প্রতি বাজিতে হারিয়াছিলেন। মণিলাল বাবু তাই এই আড়াই হাজার টাকা জুন্নে দিয়া, খেলা অদ্যকার মত সমাপ্ত করিলেন। তৎপরে কিছু সময় বন্ধুগণকে সমধুর আদর আলাপে পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগকে অন্য কোন দিনের জন্য দ্যুতক্রীড়া হেতু নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপ নিমন্ত্রণ, দ্যুতক্রীড়কদিগের চিরন্তন প্রথা। কিন্তু ইহা ত্যতীত, মণিলাল বাবুর এইরূপ নিমন্ত্রণ করিবার আর একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। সেই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, আর কিছুই নয়, কেবল তাঁহাদিগকে জীপিতে দিনকতক আসিতে নিষেধ করা হইয়াছিল মাত্র। পরে বন্ধুগণ চলিয়া গেলে, মণিলাল বাবু পার্শ্বস্থিত বাক্স হইতে একটি ঢাবি বাহির করিয়া, জনৈক পারিষদের হস্তে দিয়া ভিত্তিগাত্র অন্তর্গত একটি কেনেস্তারা খুলিয়া কি বাহির করিতে জীপিত করিলেন। পারিষদ বন্ধু হস্তমুখে কেনেস্তারা খুলিতে গেল। এতক্ষণ পারিষদ বন্ধুগণের মুখে হাস্য রেখা দেখা দিল। মণিলাল বাবু একে ২ এতগুলি টাকা হারিলেন, এই হুঃখ ইহাদিগের হৃদয় গত, কি মৌখিক, সে বিষয় সাধারণের পক্ষে সন্দেহ জনক; কারণ ইহারা পরস্পর ভ্রাতৃ অনুচক্ষুরে বলাবলি করিতেছিল, “ভায়া আজকের দিন রবি, ফাঁকে ফাঁকেই যায়; চল আর কেন; ক্রমেই রাত্রি বেশী হয়ে পড়ছে, আমাদের ত আরও দু এক জায়গায় চেপ্টা বেপ্টা দেখতে হবে। এ জায়গায় হলো না বোলে যে নিশ্চিন্ত থাকতে হবে, তার কোন মানে নাই।” অবশ্য ইহাদিগের এসকল কথাবার্তা, মণিলাল বাবু শুনিতে পান নাই। খেলার পর, মণিলাল বাবু কিয়ৎক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে অন্যমনস্ক কি

চিন্তা করিতেছিলেন বলিয়া, পারিষদবর্গ মধ্যে ঐরূপ কথাবার্তা হইতেছিল। পরে যখন মণিলাল বাবু উক্ত পারিষদকে কেনেস্তারা খুলিতে সৈজিত করিলেন, তখন ইহাদের সমস্ত ভাবনা দূরীভূত হইয়া অধর প্রান্তে, খাতিরে হাসি দেখা গিয়াছিল। এই কারণে ঐ সন্দেহ। সে যাহা হউক; ঐ পারিষদ অতি ক্ষুধিত সহকারে গিয়া কেনেস্তারা খুলিল। ও হরি! কেনেস্তারাময় যে ধান্যখরি! খুড়ি—ধান্যখরী হইবে কেন? দেশী নজর এমনই বটে! বিলাতী আমদানী স্বয়ং শ্রামপিন্ ইত্যাদি, মায় মাজসরঞ্জম আনুমানিক অলঙ্কার সহিত—হাঃ—হাঃ—হাঃ—কেয়াবাৎ। পারিষদ আমোদভরে, অভিযোগ্যতারসতি খুব—সম্পূর্ণে একে একে তৎসমুদয় মণিলাল বাবুর সম্মুখে উপদেশ অনুযায়ী মাজাইয়া রাখিল। পরে আনুমানিক অপেক্ষা না করিয়া পাত্র পাত্র অমৃত ঢালিল; মণিলাল বাবুকে দিল। নিজেরা পান করিল। এইরূপ, কিছুক্ষণের মধ্যে তাহারা একটি একটি অবতার বিশেষ হইয়া দাঁড়াইল। মণিলাল বাবু একটু প্রকৃতিস্থ ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে আজ আর এতরাত্রে, এরূপ অবস্থায় বাড়ীর বাহির হইতে নিষেধ করিয়া, সেইখানে সকলকে রাত্রি যাপন করিতে বলিয়া, নিজ শয়ন কক্ষে গমন করিলেন।

তারপর ইহাদের ভিতর যাহাদের আশা এখনও মিটে নাই, তাহারা দুই—এক মাত্রা ঢুকু ঢুকু চালাইতে ছাড়িল না। ইহাদের ভিতর একজন দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল, “হজরত পেসোয়ারী এ সময়ে না থাকলে আসন্ন সরগরম হয় না; তোরা খালি মদ খেতে শিখেছিস, আমোদ ইয়ারকির কিছুই জানিস না; সে থাকলে কেমন রং উড়ত; মণিয়া যেমন বেরসিকের ডিম্; একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে, অত বড় মজবুত লোকটাকে অপমান কোরে তাড়ালে।” আর একটি লোক সভয়ে তিরস্কারচ্ছলে তাহাকে বলিল, “তুই বড় আহাম্মক;” এখন মণিয়া, তোর মুখে হজরতের কথা যদি শুনিতে পায়, তাহলে মণিয়া এখনি এসে, আমাদের রং উলটে দিবে। তুই কি, জানিস না, তার উপর মণিয়া কতদূর চটা।” এই কথা শুনিয়া সে লোকটা চুপ করিল। আর একজন হজরতের সম্বন্ধে এইরূপ কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল। “হ্যাঁ হে ভাই, হজরতকে কিম্বের জন্যে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে?—ও,—তাই দেখি নাই। আমি মনে করছিলাম, সে দেশে গেছে, তাঁ নয়,—কি হয়েছিল ভায়া? কি হয়েছিল ভাই সতীশ?” সতীশ একটু নিরস্ত হইয়া বলিল, “তুই নতুন হয়ে এলি নাকি? ও—ঠিক ঠিক, তখন তুই এখানে

ছিলিস্নি, তাহলে তুই কি করে জানবি ?” এই কথা বলিয়া সে হজরতের কথা বলিতে লাগিল ।

একদিন বৈকালে আমরা, এখানে হজরতের সহিত গল্প করিতেছি ; এমন সময় মনিয়া, ভয়ানক গরম হয়ে এসে, হজরতকে বৈটখানার বাইরে ডাকলে । হজরত তাহার নিকট গেল ; অমনি পটাপট পায়ের জুতা খুলে লাগাতে লাগাতে বলে—বেইমান, গোলাম—বিশ্বাসঘাতক বেরও এখন থেকে ।” হজরত বেচারির রাগে, সেই লালমুখ, অপমানে আরো লাল হয়ে উঠল ; সে দ্বিরুক্তি না কোরে চলে গেল । আমরা ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে রইলুম ; মনিয়ার তখনকার ব্রহ্মমূর্তি দেখে তাহাকেও ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারলেম না । তারপর একদিন পথে হজরতকে, ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, সে বলে, মনিয়ার একটি শিয় সবুজ পরী আছে । সে একদিন হটাৎ, তার সামনে কি করে এসে পড়ে, এবং তার কোন ভাব ভঙ্গী দেখে, হজরতের মনে হয়, এ সবুজ পরী তার ; আর কারো নয় । এই দুস্ত্রাপ্য মালা উপহার, এখন কানোর নিকট গচ্ছিত আছে, কালে তাহারই কণ্ঠদেশে এই পারিজাত মালা ছলিবে । সে এই ভাবিয়া ইহার চেষ্টায় ফিরিতেছিল । সে একটি ঘটনায় বুঝিতে পারিল, সে যাহা মনে করিয়াছিল, তাহা ঠিক নয় । রূপসী ললনাগণের স্বাভাবিক প্রফুল্লিত হাস্যমুখ ও তাহাদিগের স্বাভাবিক অপাঙ্গ, ভঙ্গী, হাব ভাব ভঙ্গীতে, সেই গোয়ার যুবকের এই ভুল সঞ্চিত হইয়াছিল ।—“কিসে এই ভুলটুকু বাহির হইয়া পড়ল ভায়া ?” “সেই—যে দিন তাহার উপর পটাপট পড়ে, সেইদিন,—অনেকদিনের চেষ্টার পর সেইদিন, সে ছঃসাহসে ভর করিয়া সেই সবুজ পরীর কামরায় ঢুকিয়া, তাহার অলঙ্কিতে, তাহার কমণীয় কাঙ্ক্ষিতে ফুলের তোড়া ছুড়িয়া মারিয়া নবাগত প্রেমিকের আগমন বার্তা ঈর্ষিতে জানাইয়া ছিল । পরে সে অদৈর্ঘ্য প্রেমাবশে নীল পানিনীর পদপ্রান্তে নতজামু হইয়া অনেকদিনের সঞ্চিত হৃদয় বেদনা তাহাকে কত যত্না দিতেছে, তাহা জানাইতে গিয়া, যুগপৎ সাক্ষ্য—সবিস্ময়ে দেখিল, সে এতদিন ধরিয়া যে প্রেমআশা কল্পনায় পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা দারুণ ভ্রমাত্মক সুখস্বপ্ন । তখন সেই অপমানিত তেজস্বিনী রমণীর ভৈরবী মূর্তি দেখিয়া, হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্য-বিমূঢ়, কামাক্ত যুবক, হজরত, প্রাতি মুহূর্তে ভয়ানক বিপদ আশঙ্কা উপলব্ধি করিতেছিল । কিছুক্ষণ সেই উদ্ধত স্বভাব হজরত, স্তম্ভরূপে চরণে বিনয়াবনত হইয়া নিজ ভ্রমের কথা উল্লেখ করিয়া, ক্ষমা ভিক্ষা

চাহিল, এবং ঐ বিষয়, অতের নিকট প্রকাশ না হয়, একপ অমুরোধ করিল । সেই স্বভাবসুন্দরী মনোমোহিনী, প্রকৃত কথা শুনিয়া, উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মনে মনে হান্ত সংবরণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিল । এবং তিনি ঐ বিষয়ে সেই বলিষ্ঠ যুবককে সতর্ক হইতে বলিয়া দিলেন । আর একটা নূতন দেখিলাম । সেই বদমাইস হজরত, সেই সুন্দরীর অমায়িক কোমলতায় বড়ই মুগ্ধ । তাহার স্থখাতি, তাহার একমুখে ধরে না ।” শ্রোতা হাসিয়া বলিল, “ইহা মরণের পূর্বলক্ষণ । যাই হউক ; বড়ই আশ্চর্যের কথা, ছুঁদে হজরতের প্রকৃতিতে এত অপমান সহ হইল ।” না—সহ হয় নাই, সে বিষয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে—যে কোন প্রকারেই হউক, মণিয়ার হৃদয় হইতে সেই সবুজ পরী কাড়িয়া লইয়া নিজ অক্ষয়গিণী করিবে ; ইহাতে শানিত ছুরিকা প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাও করিবে, মণিব বলিয়া খাতির রাখিবে না ।”—“বল কি ! ছোঁড়াটা শেষে নিমক হারাম হইতে চলিল” বলিয়া শ্রোতা দুঃখ প্রকাশ করিল । তারপর আবার জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্ছা ভাই, আমার নিকট এই কথাও বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, যাহার কথায়—যাহার বিশ্বাসঘাতকতায়, হজরত মণিলালের নিকট এতদূর লজ্জিত ও অপমানিত হইল ; তাহার উপর জাতক্রোধ না হইয়া, তাহার উপর অমুরাগ ! হজরতের প্রকৃতিতে এ কেমন কথা ভাই ?” বক্তা বলিল, “হজরত একথা আদৌ বিশ্বাস করে না, যে, সে তাহার কথায় লাজিত হইয়াছে । হজরত বলে মণিয়া হঠাৎ কোন স্ত্রে, উহা অবগত হইয়া, আগাকে লাজিত করিয়াছে ।” “তাহ’লে গোঁয়ার পুরুষ—প্রেমিক পুরুষ হইতে চলিল ; তা বেশ ।” শ্রোতা এই কথা বলিয়া বক্তাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কোথায় আছেন ?”—“তিনি এখন সহরের বাহিরে আছেন ।” “সহরের বাহিরে কেন ?”—পুলিশ সাহেব ক্রমাগত তাহার বদমাই-সিতে বিরক্ত হইয়া তাহাকে সহরের বাহির করিয়া দিয়াছে । এখন বাছাধন একবার ভুল ভ্রান্তিতে সহরে হদি এসে পড়েন, তাহা হইলে অগনি একেবারে জ্বিবে ।” “ও !—তাহা হইলে ছোঁড়ার মাথাটা একেবারে ধারাপ হয়ে গেছে ? এই সময় কি একটা শব্দ হইল । ঐ রে, বোধ হয়, মণি আবার কি মনে করে আসছে ; বোধ হয়, আমাদের কথা শুনতে পেয়েছে । ওরে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শিগুগীর—শুয়ে পড়—শুয়ে পড় ।”

পাঠক ! যাহার সম্মুখে এত কথা বলা হইল, বোধ হয় সম্পূর্ণ বুদ্ধিতে পারেন নাই, সে ব্যক্তি কে ?—সে ব্যক্তি একজন কুস্তীগির পালোয়ান যুবক ;

মণিলাল বাবুর নিকট কন্ম করিত । মণিলাল বাবু নিজ হুকার্খা সাধনের জন্ত তাহাকে গুপ্ত অঙ্গুরূপ ব্যবহার করিত ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

কুছ-পরওয়া নেই ।

মণিলালবাবু নিজ শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া একটি কোচের উপরে বসিয়া পড়িলেন । মণিলাল বাবুর এই শয়ন-কক্ষ দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও পরিপাটি সুসজ্জিত, আরামদায়ক । এই কক্ষের অভ্যন্তরীণ চতুঃসীমা একটু মনোযোগ পূর্বক নিরীক্ষণ করিলে, বুঝা যায়, এই কক্ষের সহিত আর একটি কক্ষের অভ্যন্তরিক সংযোগ আছে । মণিলাল বাবু যে কোচের উপর বসিয়াছিলেন, সেই কোচের সম্মুখে—উত্তরে, একটি বহুমূল্যবান আলমারির পার্শ্বে, একটি ভিত্তিগাত্রে যে, একখানি হরিৎবর্ণের বস্ত্রাবরণ, কক্ষের সৌন্দর্য সাধনের চুল প্রকাশ করিতেছে ; উহা, আর একটি কক্ষের প্রবেশদ্বারাচ্ছাদনী ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

মণিলাল বাবু কোচের উপর, শরীরখানি আলস্তে এলাইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন । অস্থির চিন্তানিবন্ধন নির্জন চিন্তাও ভাল লাগিল না । নেশায় অবশ, হেলিত গ্রীবদেশে ঈষৎ তুলিয়া, কাহাকে ডাকিল, ও মোহাগ ? মো—হা—গ ? যাহাকে ডাকিল ; সে উত্তর দিল না । আবার নীরবে কি ভাবিতে ভাবিতে অস্পষ্টস্বরে আপনা আপনি কি বলিতে লাগিল ।—তোমায় যে কোন রকমে পারি, হাত করাই—কব্ব ; না পারি, আমার নাম মণিলাল নয় । ইহা বলিতে বলিতে মুখ যেন বুজিয়া আসিল । অনেক চেষ্টার পর আবার যেম মুখ ফুটাইয়া কাহাকে ডাকিল, “মোহাগি ও মোহাগি ?” এবারও কেহ উত্তর দিল না । আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জড়িতস্বরে বলিতে লাগিল,—যত টাকা খরচ হয়, খরচ করিব ; কুছ-পরওয়া নেই । আমার চামেলিয়া—আমার হৃদয়ের চামেলিয়া, আমার চক্ষে যখন পড়েচ ; তখন আমি তোমায়—ঠিক ছোঁ মারচি ; তোমার হাসি মুখে, য—ত—ফ—গ—না,—চ—ম । মণিলালবাবুর মন আবার অত্মদিকে টলিল । “মোহাগী,—ও—মোহাগী—আঃ—এ বেটি আচ্ছা যুগুচে—যা হোক ! আমি না উঠিলে, তোমার ঘুম ভাঙবে না—তোমার কাণে শুড়শুড়ি না দিলে, তোমার

ঘুম ভাঙতে না—বুঝিচি” বলিতে বলিতে কোঁচে হইতে উঠিলেন ; টলিতে টলিতে কল্পিত হস্তে সেই দ্বারাছোদনী সরাইয়া অল্প একটী কক্ষাভাস্তরে প্রবেশ করিলেন । উহা একটী বিজাস-কক্ষ ; সাজ-সজ্জায় এই কক্ষটি, একটী শ্রেষ্ঠ নৃত্যগৃহের সহিত তুলনা হইতে পারে । মণিলাল বাবু একটী বিচিত্র পালঙ্কের পার্শ্ববর্তী হইয়া দাড়াইল । নেশায় ঢুলু ঢুলু আঁফি ছুইটি মেলিয়া একটী নিদ্রাতুরা, নবহর্ষাদলশ্যামা অপ্সরীকৃত্যার মৌল্যচ্ছটা, অনিমেঘ নয়নে কতক্ষণ দেখিতে লাগিল । যেন,—কাহার সহিত তুলনায় রত । ইহা তুলনা হইলেও, এই তুলনা ঠিক হইতে ছিলনা । এই তুলনায় একটু পক্ষপাতীয়া দোষ আছে । যে দিক অপেক্ষাকৃত লঘু, মণিলালবাবু যেন জোর করিয়া সেই দিক, গুরু বলিয়া ধবিত্তেছিলেন ; কিন্তু সাধারণ যুক্তি প্রভাবে এই পক্ষপাতীয়া দোষ টুকু ছলিতেছিল । গেমবাজ মণিলাল বাবু, তবু—নিজসত্ত পোষকতার জন্ত পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনোরাজ্যের সুন্দরী বিহঙ্গিনীর রূপ, ও বাহিরে নয়নসমক্ষে শায়ায় শায়িতা রূপসীর রূপ, মানসিক তুল্যদণ্ডের আশ্রয়ে তুলনা করিতে লাগিলেন । ইহার ফলে তিনি ভ্রম প্রমাদিত হইলেন । লঘু—গুরু বোধে অপারগ হইয়া, চিত্রার্পিতের স্থায় সেই নিদ্রিত সুন্দরীর রূপ ভাঙি দেখিতে লাগিলেন ।

রমণীর রূপ, রমণীর ললিত-লাবণ্য ঘটা, রমণীর মারাত্মক স্খাভাবিক অপাঙ্গ ভঙ্গী, মিতম্বিনী কামিনীগণের নিতম্ব-বাহার ইত্যাদি, পুরুষ-হমন করিবার এক একটী বেশ স্নকোমল যন্ত্র ! সত্য. ত্রেতা, দ্বাপর ও আধুনিক কালি, এই চারি যুগে, দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব ও মানব মহাশয়দিগের দ্বারা উহা বারম্বার স্তুতমাণ হইয়া গিয়াছে । এবং আধুনিক গ্রন্থকার মহাশয়দিগের অমর লেখনীর মুখেও প্রকাশ পাইয়াছে ; স্মরণ্যে আমার ক্ষুদ্র লেখনী, ইহার বিষয় কি লিখিব ।

যাই হউক, এই মণিলাল বাবু বার বার হত হইয়া, এখনও নিজ অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন । কলির মানব কি না ? ঐ, নিদ্রাবশে বিকলা সুন্দরীর জন্ত মণিলাল বাবু মর করিয়াছেন, কত অসহ্য সহ্য করিয়াছেন ; নিজ সজ্জা সছোদর ভাতা ও মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন ।

ঐ শ্যামাঙ্গী নিদ্রিতা রূপসী, বঙ্গজরমণী । ইহার সঙ্গী পাটনায় কোন দেশীয় মওদাগরের আফিসে কর্ম করিতেন । এই কর্ম উপলক্ষে পাটনাই তাঁহাদের চির বাসস্থান মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । ইহার সঙ্গী একজন সজ্জাত কুলীন-বংশোদ্ভব । ইনি যখন দশমবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার জননী স্বর্গা-মোহণ করেন । বালক একগণ্ডে চিরতরে মাতৃশেহে বঞ্চিত হইলেও তিনি, পুত্র-

বৎসল পিতার আদরে, আশ্রয় স্বজনের অমায়িক ভালবাসা ও প্রতিবেশী জন সাধারণের হাসি কথায়, মাতৃবিয়োগ জন্মিত দুঃখ কিছুই অনুভব করেন নাই । এইরূপ কিছুদিন আদর যত্নে, সুখে-স্বচ্ছন্দে বালকের দিন চলিতে লাগিল । বালক সংসারের কিছুই জানে না ; পিতার স্বচ্ছল সংসারে হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়ায়, কোন ব্যস্ততা নাই ।

এমন সময়ে কোথা হইতে এক কল্যাণদায়ক ব্যক্তি একটী বয়স্ক অনুভূত কল্যাণ লইয়া, সেই বালকের পিতার দ্বারস্থ । অনেক অমূল্য বিনিয়, — “মহাশয় আমার মান, সম্মান, জাতি, ধর্ম, আপনি অনুগ্রহ করিয়া রাখুন ; আমি গরীব, আপনি না রাখিলে কে রাখিবে” ইত্যাদি, নানা শ্রবণ স্তুতি করিতে লাগিল । এই বিপন্ন ব্যক্তির—এই নবকে পতনোন্মুখ ব্যক্তির, নিষাদেভরা মলিনমুখ দেখিয়া, প্রতি বাসিরাও তাহার হইয়া তাঁহাকে দুই কথা বলিল । আপনি কুলীন, আপনি দুইটা ছাড়িয়া দশটা বিবাহ করিলে কাহার বলিবার ক্ষমতা আছে ? তাহার পর আপনার সম্মানটি শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছে, আপনি এই বিপন্ন ব্যক্তির কুল-মর্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিলে সম্মানটি মা বলিয়া তাহার কোলে বসিয়া জুড়াইতে পাইবে । আহা ! ছেলেটির মুখ দেখিলে কষ্ট হয় । এইরূপ আশ্রয়স্বজন প্রতিবাসী মহাশয়েরা তাঁহাকে বিধিগত কত প্রকারে বুঝাইতে লাগিল । তিনি প্রথমে আপত্তি করিয়া বলিলেন, দেখ আমার বয়স হইয়াছে ; এ বয়সে বিবাহ করিলে কাগে আমার ছেলেটা পর হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । তোমরা থাকিতে আমাকে কেন ? আর তোমার না পার, তোমাদের সম্মানের মধ্যে যিনি এই কল্যাণ পাণিগ্রহণের উপযুক্ত হন, তাহাকেই, নয়, দান করিয়া কল্যাণকর্তার কুলমর্যাদা বজায় রাখিয়া, এই গ্রাম্য ভদ্রমণ্ডলিকে সম্মানিত কর না ? ইহার বেলায় সকলেই নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়া পশ্চাৎপদ হইল । আসল কথা—ঐ কল্যাণকর্তার বিবাহের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল । উহাতে তত কাজ আটকাইত না । কুলীনের ঘরে অমন অনেক হয় । তবে রূপচাঁদ মনের মত নয় ; এই যা আপত্তি । না হইলে, ঐ কল্যাণকর্তার দ্রুতদলিনী হইয়া দাঁড়াইত । আর কল্যাণকর্তা কিছু তাহাদের দ্বারস্থ হয় নাই, যে, লৌকিক চক্ষুজ্জ্বল খাতিরে তাহারা বাধ্য হইবে ? তবে বাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছে ; তাঁহাকে (যিনি আজ বাদেশাল বৃদ্ধ হবেন) কল্যাণকর্তার হইয়া দু দশটা যুক্তি দ্বারা সংসারান্তর গ্রহণে রাজী করিয়া দিয়া, পর উপকার করিলেই, যথেষ্ট ।

যাই হ'ক; তিনি গ্রামস্থ ভদ্র প্রতিবাসী মহাশয়গণের এত অনুরোধ উপরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। ইহা যথার্থ হইলেও, তিনি এ বিষয়, স্বগত বিচারে দেখিলেন, ইহাতে তাঁহার লাভ বই, লোকমান নাই। প্রথম কথা এই, মেয়েটি লায়েক, এক রকম বাড়া ভাতের সামান, দ্বিতীয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু রূপচাঁদও ঘরে ডুববে; তৃতীয়, ছেলেটির কিনারা হইবে, সে মা বলিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারিবে। ইহা ব্যতীত; তাঁহার মনের কথা,—অনেক দিন হইল, তাঁহার হৃদয়াসন পরিত্যাগ করিয়া, গৃহিণী কোথায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন;—তাহা বিহনে উত্তম প্রাণের সন্তাপ নিবারণ কবিত্তে, তদ স্থানে আর একটি না হইলে,—কে পারিবে? স্ততরাং উহা যুক্তি সঙ্গত, উহাতে আপত্তি নাই। তবে যদি কেহ, তাঁহার মত লোকের এ কার্য্য; কেহ দোষের মধ্যে গণনা করিয়া, তাঁহার নিন্দা করে, তাহা হইলে, ঐ ভদ্র প্রতিবাসিগণের অনুরোধরূপ নজীব দেখাইয়া ছুর্নামের হস্ত হইতে পরিজ্ঞান পাইবে।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেই আসন্ন নব-যৌবনা বালা স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া প্রতিবাসিগণের মুখ ও সেই বিপন্ন কণ্ঠ্য কর্তার কুল মান, সকলি রক্ষা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদাই হইলেন। যাই হক; নূতন নূতন এই নবদম্পতির দাম্পত্য-প্রেম বড় সুখের হইয়াছিল। এবং কিছুদিন পরে উর্বর ক্ষেত্রে, পব পর ছুইটি পুত্র কন্যা সন্তান-রত্ন লাভ করিয়া নিঃসন্দেহে অক্ষয় স্বর্গ লাভের পথ অতিঃসুগম করিলেন।

কিন্তু ইহার পর হইতে, বর্ষাকালিন উভয় তীর প্লাবনকারি বহ্যাব ছায়, তাঁহাদের প্রেম বহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। তখন তাঁহাদের বসন্ত মানসক্ষেত্র একেবারে মরুভূমির ছায় শুষ্ক হইয়া পড়িল। তৎপরে সেই প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানকে লইয়া, সোণার সংসারে অবনি-ধানার স্বরূপ বিষবীজ উৎপন্ন হইয়া,—সেই সোণার সংসারকে বিষময় করিয়া তুলিল। অদূরদর্শি, অল্প শিক্ষিত বিবেচনাবিহীন ব্যক্তির ভাগ্যে যাহা ঘটে, দীন দয়াল বাবুর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। ইহার ফলে তাঁহার শাস্তি প্রিয় উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিরক্ত হইয়া, কোন বন্ধুব স্পারিসে, পাটনায় একটি কর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার একমাত্র বালা স্ত্রী সমভিব্যাহারে তথায় তিনি জুড়াইতে গমন করিলেন। ঐ বালা স্ত্রীর পিতা, তাঁহার একমাত্র কণ্ঠ্য ভবিষ্য সুখস্বচ্ছন্দতার প্রীতি দৃষ্টি করিয়া,—তাঁহার যথা স্বকীয়

সি পালের অকিস হইতে প্রকাশিত।
নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রাষ্ট, কাগজ মওদাওয়ার এ,
৩৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রাষ্ট, কাগজ মওদাওয়ার এ,
প্রণীত।
দত্ত
জীবনবিদ্যা

দিয়া দীনদয়াল বাবুর জ্যেষ্ঠ সন্তানকে, নিজ প্রাণের-আদরের কণ্ঠা-রক্তকে দান করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন ।

সুতরাং জামাতা সংক্রান্ত বিষয়ে, তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না । এখন পিতার দ্বিতীয় সংসারের বিষ-ফলাস্বাদনে ব্যাকুল হইয়া, দূর দেশে শান্তি অন্বেষণে, কেবল একমাত্র অপরিপক্ক-বয়স্কা বালা জীর সহিত গমন করিতেছে,—আগমন করুক ; উপযুক্ত জামাতার সন্নিবেশনায় তাঁহাদের আদর্শিণী কণ্ঠা, স্থখে থাকিবে ; এবং সময়ে বুদ্ধিমান জামাতা নিজের স্বার্থ বুঝিয়া লইয়া স্থখী হইবে ; চিন্তায় কতকটা এইরূপ স্থির করিয়া, তাঁহারা এই বিষয়ে নীরব রহিলেন । যাই হউক ; জামাতা ভূপেন্দ্র বাবুর বুদ্ধিমতী বালা জীর সাংসারিক সুবন্দোবস্তে ও সওদাগর মনিবের অনুগ্রহে সেই দূরদেশ পাটনায় তাঁহাদের বেশ সুখ-স্বচ্ছন্দে শান্তিমুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল । এইরূপ ছই বৎসর অতীত হইল ।

এমন সময়ে একদিন তাঁহাদের সুখ দাম্পত্য আকাশে এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল ; সহসা সেই মেঘখানি ভয়ানকরূপে বিস্তৃত হইয়া তাঁহাদের সুখ দাম্পত্য ভূমি, ভীষণ তিমিরাবৃত করিয়া ফেলিল, তাঁহার মধ্যে, কোথা হইতে কে আসিয়া ভূপেন্দ্র বাবুর জাগতিক প্রেম বন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাহাকে লইয়া কোথায় পলাইল । এই আকস্মিক শোচনীয় ঘটনায়,—সেই দূরদেশে বিধির দুর্ভেদ্য ঘটনা-বৈচিত্রে, সেই অনাথিনী অবলা-বালা যুগপৎ শোক ছঃখে ভাবনায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল । হইবারই কথা ; আহা সে এখনও জগতে সম্পূর্ণ প্রবেশাধিকার পায় নাই । তাঁহার নিম্নলিখিত সুকোমল ঘাত-প্রতিঘাত শূন্য ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু, কালের এই আকস্মিক মহাপ্লাবনে কেমন করিয়া স্থির থাকিবে,—জগতের এমন কোন কোণ নাই যে, ঐ শোক সন্তপ্তা বিলোড়িতহৃদয়া ক্ষুদ্র রমণীর ব্যাকুলিতা প্রাণকে, এই সাধারণ কাল মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিয়া, ক্ষণেকের নিমিত্ত সান্ত্বনা করিতে পারে ।

যাই হক, এই অসময়ে, তাঁহার স্বামীর একটি যুবক বন্ধু বড়ই উপকার করিয়াছিল ; তাঁহারই উদ্যোগে তাঁহার পরোলোকগত স্বামির অস্তেষ্ঠী ক্রিয়া সন্মাহিত হয় ।

এই যুবক ; তৎদেশবাসি জনৈক সম্ভ্রান্ত বংশীয় । বিদেশে এই বন্ধুটি তাঁহাদের অকৃত্রিম উপকারিজনদের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল । সরল ভূপেন্দ্র বাবু, তাঁহার উপর এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তিনি

কোন সময়ে তাঁহার নিকট সাক্ষাৎ করিতে আসিলে ; নিজ সহধর্মিণীর সম্মুখীন হইয়া, তাঁহার নিকট আসিতে কহিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না । এই হেতু, তাঁহার সহিত তাঁহাদের বৈদেশিক পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল ;—এই হেতু তিনিও বন্ধু স্নেহ সমাগম ইচ্ছায়, তথায় আগমন করিয়া, তাঁহার অনুপস্থিতিকালে নিঃসঙ্কুচিত চিত্তে, তাঁহার ক্ষুদ্র মহলে বিশ্রাম করিতে পারিতেন ।

এইরূপে বা এই স্বেচ্ছায় ঐ বন্ধুটি উহাদিগের সহিত বন্ধুত্বভাব বিশেষ রকমে পরিপক্ক করিয়া লইয়াছিলেন । তজ্জগাই কি ;—সেই অনাথিনী পতি-বিয়োগ-বিধুরা বালা রমণীর বিষম অসময়ে দাঁড়াইয়া, অকুমিত্র বন্ধুত্বের নিদর্শন দিয়াছিলেন ? তাহা নহে । উহার হৃদয়ে সতত এক নিগূঢ় ভাব নিহিত ছিল । ঐ নিগূঢ় ভাব আর কিছু নয়, কেবলমাত্র তিনি ঐ মৃত পতিকা কিশোরীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ভাল-বাসিয়াছিলেন । এই অন্তর-দহ গুপ্ত ভালবাসার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া তাহার চিত্তে ধীরে নিকট পরোপকার-ব্রতধারী মহাপুরুষ হইয়াছিলেন মাত্র । এই পরোপকারি বন্ধু মহাশয় ঐ অকুলপাথারশায়িনী হতভাগিনীর অভিভাবক রূপে, তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন ; এবং পরোপকার ব্রত মানবের নিত্য ধর্ম, উহা যে পায়ও পালন না করে, তাহার মুখদর্শন করা উচিত মনে । এইরূপ গৌরচন্দ্রিকা বেশ রঞ্জিয়ায় সাজাইয়া ঐ রূপসী ললনার কর্ণকুহরে বর্ষণ করিতেন । জাগতিক জ্ঞান বিবর্জিতা সরলা বিধুরা বালা, এই মধুর কথায় মোহিত হইয়া, সেই যুবকের টুকটুকে মুখের দিকে অনি-গেমন-নয়নে চাহিয়া থাকিত ।—ভাবিত ; ইনি বুঝি দেবতা ।

এইরূপে, ঐ যুবক ক্রমে ক্রমে অসহায় যুবতির হৃদয়ে, তাঁহার অজ্ঞাতে অলক্ষিতে প্রবেশাধিকার পাইয়া, পরে একদিন যুবক সমতান, স্বেচ্ছায় মৃত্যু, বহুদিনের সঞ্চিত গুপ্তমনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া, অবসন্নপ্রায় মা বন্ধু-দ্বারার স্বক্ষে, পাপের বোঝা চাপাইয়া, মাকে আরো ক্লিষ্ট করিলেন ।

এইরূপে ঐ অনাথিনী বিধবা রমণী ঐ গায়াবী ছবৃত্ত সমতান কর্তৃক ঘোর পদস্রাবনে পতিতা হইয়া, ক্রমে তাহার কলুষিত সহবাসে তাহাকে বিশেষ রকমে চিনিতে পারিলেন ;—বুঝিতে পারিলেন যে, ব্যাধের মধুর বংশীধ্বনির সুর-লহরী, তাঁহাকে—হরিণীকে মহাজমে ফেলিয়া হরিণীর সর্বনাশ করিয়াছে, ভাবিয়া কিশোরী অবলা হরিণী মরমে মরিণেন । কিন্তু কি করিবেন,

আর কোন উপায় নাই ; ভ্রমাত্মক মনে বুঝিয়াছিলেন—ইহার আর উপায় নাই । যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা আর ফিবিবে না । কাজেই মৃগ-ললনা নিজ স্বভাবসিদ্ধ কোমল কমলীয় মায়াবী় বুদ্ধিকোশলে ব্যাধকে, এমন ভাবে জড়িত করিলেন যে, তাঁহাকে লইয়া, তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের মেহে জলাঞ্জলি দিয়া, নিন্দার বোঝা মাথায় করিয়া, সংসার সমুদ্রে ভাসিতে হইল । এই যুবক আর কেহ নয়, আমাদের মণিলাল বাবু । আর ঐ খটুপরি ছন্ধ-ফেননিভ শয্যায় শায়িতা শ্রামাঙ্গি রূপসী যুবতি ; আর কেহ নহে, সেই বিধবা রমণী সোহাগি ।

সোহাগি মণিলাল বাবুর অকৃত্রিম বন্ধুর স্থায় স্মৃথ ছুঃখের ভাগী ছিলেন । সোহাগী মণিলাল বাবুর স্মৃথের জন্ত রমণীর স্বভাব-বিরুদ্ধ—এমন অনেক কাজ করিয়াছে ;—পাপপথের পন্থিনী হইয়া পাপপথকে আর স্মৃগম করিয়া, মণিলাল বাবুর পাশবীয় ছুকার্য্যের সহায়তা করিয়াছে ; কেন করিয়াছে, কেবল মণিলাল বাবুকে বশে আনিতে ; কারণ যে ব্যক্তি যে প্রকৃতির, সে তাহার প্রকৃতিগত পথে চলিবে, কদাচ তাহার স্বভাববিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করিবে না,—ইহাই স্বাভাবিক । এইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে হইলে, যে পন্থা অবলম্বন করা উচিত ; উহা—সোহাগির সেই পন্থা ; এই পন্থা ধরিয়া মণিলাল বাবুকে অনেকটা বশে আনিয়াছিল ; সম্পূর্ণ পারে নাই,—পাবিত ; যদি সে ক্লান্ত হইয়া না পড়িত । জীবনোক হইয়া পুরুষের সহিত এতটা যুঝিতে পারিয়াছিল ; সে কেবল তাহার মহিমুতাগুণে ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা গুণে । আচ্ছা মণিলাল বাবুকে বশে আনিতে, তাহার এত আকিঞ্চন কেন ?—এখন মণিলাল বাবু ভিন্ন তাহার অন্য গতি নাই ।

সোহাগী স্মৃথের পায়বা নয় ;—ছুঃখের, না হইলে,—এতদিন পিঞ্জর ছাড়িয়া, আকাশমার্গে উড়িয়া স্বাধীন বায়ু ভক্ষণের মজা দেখিত । বিশেষ মনকষ্ট পাইয়াও তাহা দেখিল না—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিল না । তাই বলিতেছি, সোহাগি স্মৃথের পায়বা নয়—ছুঃখের, তাহার আর উপায় নাই ; তাই সে—যে তাহার গলায় ফাঁসি দিয়াছে, তাহাকে মনের মত করিবার আশায়—যতদিন তাহার পাপ দেহভার ধবিলী ধরিবে—ততদিন ; দুই জনে স্মৃথে থাকিবার আকিঞ্চনে, সমতানেব সহিত সমতানী সাজিয়া, চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিল ; যদি তাহাকে, তাহার পথ হইতে ফিরাইয়া তাহার দিকে আনিতে পারে ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

“এ আবার কি মূর্তি ?”

মণিলাল বাবু চিত্রার্পিতের স্থায়, কতকক্ষণ পালঙ্গপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন ; তাহা তিনি অবগত নহেন । তাঁহার যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইলেন—অনর্থক এখানে আমি দাঁড়াইয়া কেন ? এখানে আমার এখন কি আবশ্যক ? ভাবিয়া, কিছু বোধ করিতে না পারিয়া ক্লিষ্ট বিরক্তি-কর মনে, নিজ শয্যাভিমুখি হইলেন ; এক পদ—ছুই পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় মনে হইল, এখানে এখন বিশেষ আবশ্যক আছে বই কি ! অমনি ফিরিলেন,—অবশ্য পদ বিক্ষেপে, যথায় দাঁড়াইয়াছিলেন, আবার—তথায় অগ্রসর হইয়া, শুষ্ক সুন্দরীকে জড়িত স্বরে ডাকিল । সোহাগি-সোহাগ—ও সোহাগ ; শুষ্ক সুন্দরী উত্তর দিল না । তখন মণিলাল বাবু বারগী পানে প্রফুল্লিত নিজ রক্তিম মধুর অধর—সেই শুষ্ক সৌন্দর্য্যভূতা বিকলা রূপ-ললনার গৃধিনীলাঙ্ঘিত কর্ণের উপর রাখিয়া, ডাকিল । “সোহাগ সোহাগ” ; মণিলাল বাবুর এইরূপ সোহাগে সোহাগীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, সোহাগী নিষ্পন্দে নিমিলিত নিদ্রালু বিশাল পঙ্কজ আঁখি, উন্মিলিত করিয়া, মণিলাল বাবুর তাৎকালিক ভঙ্গিমা অবলোকন করিয়া, অমনি তাঁহার অলঙ্কারগরজিত সুধার অধরপ্রান্তে মধুর হাস-রেখা বিকাশিত হইল, জড়িতস্বরে কহিল ; এ আবার কি মূর্তি ? এত রাত্রি, কি মনে করে, হঠাৎ আবির্ভাব কোথা হইতে বলিয়া, পার্শ্ব পরিবর্তন করিল ।

সোহাগীর এ ভাব অতি মনোহর ; এ ভাব দেখিয়া মণিলাল বাবু ভিন্ন, অন্য ব্যক্তি হইলে, তিনি কদাচিত আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেন না ; মণিলাল বাবু বলিয়া পার পাইলেন । কারণ উহা তাঁহার পক্ষে নূতন নয় ।

যাহা হউক ; মণিলাল বাবু সুযোগক্রমে পর্য্যাক্ষোপরি উপবেশন করিয়া, নিজ দক্ষিণ হস্ত সোহাগীর স্নকোমল অঙ্গে স্থাপন করিয়া বলিলেন ; “ছজুরের শ্রীচরণে, এ দীন অধীনের একটি নিবেদন আছে, শুনিতে আজ্ঞা হউক” । সোহাগী উপাধান কোলে সুন্দর মুখখানি আবৃত করিয়া বলিল । “এখন আর, নিবেদন টন শোনবার সময় নয়, অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন শোও গে,—নয়, এখানে শোও । কাল দরখাস্ত কল্লের কাজ চলিতে পারে ।”

মণিলাল বাবু, উহা বড় জবাবি বলিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, আবার শুনিতে कहিলেন ; মোহাগী বড় কড়া হাকিমের মত, বিরক্ত হইয়া অত্ৰকার মত নিশ্চিন্ত হইতে कहিলেন । মণিলাল বাবু নাছোড়বান্দা, ইহাতে হইল না দেখিয়া, অত্ৰ উপায় অবলম্বন করিলেন । বহু মূল্যবান মুক্তাবরণ জড়িত, মনোহর কবরীতে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন ; “বুঝোচ” । মোহাগী বলিল “হা বুঝি, এখন ছাড়—তোমার জালায় জালাতম ; তোমার কি বলবার আছে বল” ।

মণিলাল বাবু তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বক্তব্য বিষয় তাহাকে বলিতে লাগিলেন । মোহাগি তাঁহার বিজ্ঞাপিত বিষয় শুনিতে শুনিতে ক্রমেই গম্ভীর ভাব ধারণ করিল ; মণিলাল বাবুর বিজ্ঞাপিত কথা শেষ হইলে । গম্ভীরা মোহাগী গম্ভীর শ্লেষ বাক্যে कहিল ; “দেখ মণি, তোমায় একটা কথা বলি ; আর কেন ?—চের হইয়াছে । এখনও কি, সাধ মিটে নাই ? এত্ৰ দেখে শুনে, এত করে,—তবু তুমি তোমার মনকে বাঁধতে পারেন না,—কি জানি তোমাদের মন কি ধরণের । এত সৰ্কনাশ করেও তোমার সাধ মিটল না—তুমি একটুও শিখলে না । এই সৰ্কনাশ, অনিষ্ট বই ইষ্ট নাই—অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল নাই ; তবু এ সৰ্কনাশ অনুষ্ঠানে, তুমি—এত আগ্রহ প্রকাশ কর কেন ? ছিঃ—মণি এততেও কিছু শিখলে না । মোহাগী অভিমানে আরও গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বিষাদে নীরব হইল ।

মণিলাল বাবু মোহাগীর এই তেজঃস্বিনী সার গর্ত হিত বাক্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন । মণিলাল বাবু সব জানে—সব বুঝে,—তবু এমন কেন ; মণিলাল বাবু ইহা বুঝিতে পারেন না । মণিলাল বাবু—মোহাগীর এবিধ তিরস্কার বাক্য শুনিয়া, কিছু সম্মুচিত, কিছু লজ্জিত হইয়াছিলেন ।

আশ্চর্যের বিষয় যে মণিলাল বাবুর বুদ্ধি-কৌশলে, বাক্য-চাতুর্যে অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মোহিত হইতেন—পবাজয় স্বীকার করিতেন, সেই মণিলাল বাবু, এই বিংশতি বর্ষিয়া সমাধি রূপসির স্মৃষ্ণ বুদ্ধি চাতুর্যে, স্মৃষ্ণ দূরদর্শিতায় মোহিত হইতেন—পরাজয় মানিয়া, নিজের ভ্রমাত্মক বিষয়ের প্রতি সলজ্জিত চিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, ত্রিসমগ হইতেন । আজও উল্লিখিত তিরস্কারে মণিলাল বাবু ত্রিসমগ হইয়া নীরব হইলেন । পরে আপনা আপনি তাহার অজ্ঞাতে তাহার মুখ হইতে এই কথাগুলি নিঃসরণ হইল । মোহাগ, আব একবার—আর একটবার, আমার এই মনোভিলাষ পূর্ণ

কর—আমার চিত্র চাঞ্চল্য দূর কর। পরে, আর তুমি আমার একপ দেখিতে পাইবে না। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি; এই আমার শেষ—বলিতে বলিতে সোহাগীর পক্ষজ নয়নোপরি নিজ বাগ্র চঞ্চল চক্ষু স্থাপন করিয়া, সোহাগীর শেষ কথা শুনিবার আশায় মনযোগী হইলেন; সোহাগী মণিলাল বাবুর এই শেষোক্ত কথা শুনিল; শুনিয়া কি ভাবিল; মনে মনে কি মীমাংসা করিল। তারপর পূর্বমত গম্ভীরস্বরে বলিল।

দেখ মণি, আমি মরিয়াছি না, মরিতে আছি। তোমার জন্ত আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনেক অকাজ করিয়াছি—এও করিব। কিন্তু তুমি এও—ঠিক জেন, আমরা নরকের খুব নিকটে আসিয়াছি। আর সামান্য দূর বাকি আছে—এইটুকু আসিলেই সব চুকিয়া যায়। আমরাও নরকের জ্বলন্ত ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া মরিব, ঠিক জেন,—ইহা নিশ্চয়। সোহাগী এই কথাগুলি অতি উত্তেজিত স্বরে বলিয়া নীবব হইল। মাত্র মণিলাল বাবু, সোহাগীর এই তেজস্বিনী ভবিষ্যত কথা শুনিতে শুনিতে অস্থমনকে,—কি একটা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

“ছকম ফার মাইয়ে ।”

পর দিন সোহাগী স্নান আহার সমাপন করিয়া আপন কক্ষে, পুষ্প সজ্জিত একটি টেবিলের পার্শ্বে কেদারায় বসিয়া, আপন মনে চিন্তা স্রোতে ডাসমান। সোহাগীর এইরূপ দৃষ্ট ভাব অতি মনোহর—অতি হৃদয় গ্রাহি। নিকটে যদি কোন ভাবুক চিত্রকর থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আজ তাঁহার তুলিকায়, তাঁহার নবোদিত কোতূহল নিবৃত্তি করিয়া, চিত্রকর সমাজের এক নুতন ছুপ্রাপ্য অভাব গোচন করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বোধ হয়, চিত্রকর অবর্তমানে, সুপরিহৃত, সুসজ্জিত ক্ষিতি সংলিখ্ত একখানি বহু মূল্যবান্ সুবৃহত মুকুর, আপন গাত্রে, সেই কামিনীর মোহিনী মূর্তির সজীব ছায়া ধরিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে যেন বোধ হইতেছে, একটা মর্ম পীড়িতা গভীর দুঃখময় দুঃশ্চিন্তায় মানা; এক অপূর্ব শ্রামাজি-রূপসি যুবতীর তৈল রঞ্জিত চিত্রময় প্রতিমূর্তি—এ সুসজ্জিত ভিত্তিপাটে সুরঞ্জিত।

সোহাগি ভাবিতেছে । পরমেশ্বর কেন—তাহাকে, এইরূপ জলন্ত দুঃখার্ণবে ফেলিয়া অহরহ দগ্ধ করিতেছে ; সে পূর্ব জন্মে, এত কি—গুরুতর পাপ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল ; যে এ জন্মেও তাহার গুরুতর পাপ ফল ভোগ করিতে হইতেছে ? ভগবান্,—আমরা আপনার অকৃতি অজ্ঞান সন্তান, আমরা সদা সর্বদা অজ্ঞান আধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি । ইহাতে আমরা কিরূপে ভাল মন্দ পথ বাছিয়া লইয়া চলি ? পরমেশ্বর, এই স্থলে পথভ্রম আমাদের পদে পদে হইতে পারে । পিতা, ইহার জন্য কি এই অসহায় অবলা সন্তানকে এইরূপ করিয়া দগ্ধ করিতে হয় ? পিতা আর সহ্য হয় না, ক্ষমা করুন—আপনি ক্ষমা না করিলে, আমি ক্ষমা প্রার্থী হইয়া কাহার নিকট উপস্থিত হইব, আমাদের আব কে আছে । এইরূপ ভাবিয়া কখন চক্ষের জলে ভাসিতেছে, আবার কখন, মণিলাল বাবুর প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ভাবিতেছে ? মণি ? তুমি আমার এ সর্বনাশ কেন করিলে—আমায় কেন ডুবালে ? যদি আমায় ডুবালে, তবে আমায় স্মৃতি কুলিলে না কেন ? আমার স্মৃতি কাড়িয়া লইয়া, তুমি বিভীষিকাময় ভয়াবহ দুস্তর অগাধ পাপ সলিলে সত্তরগ দিতেছ কেন ? মণি—প্রাণের মণি, ইহাতে তুমিও স্মৃতি নও—আমিও স্মৃতি নই । কেবল ইহাতে, আমাদের শাস্তিহারক হৃদয় বেদনা, বাড়িতেছে বই কমিতেছে না ? তবে শাস্তির পথ ছাড়িয়া অশাস্তিজনক বিষময় দুঃখার্ণবে সত্তরগ দিতে তোমার এত সাধ কেন ?—

মণি তুমি বুঝিলে না—আমার অদৃষ্ট দোষে বুঝিলে না—সোহাগির বড় বড় বিস্ফারিত পঙ্কজ নয়ন ফুটিয়া টম্ টম্ করিয়া অশ্রুবারি পীণোন্নত বক্ষে পড়িতে লাগিল ।

এমন সময়ে দ্বারদেশে, কাহার পদ শব্দ সোহাগী শুনিতে পাইল ; অগমি শশবাস্তে অঞ্চল দিয়া অশ্রুবারি মুছিয়া ফেলিল ; মন ভাব যতটা পারিল,—ততটা পরিবর্তিত করিয়া সহাস্ত বদনে দ্বারদেশে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দেখিল ; মণিলাল বাবু তাহার সমক্ষে । হাস্ত মুখে, ঈষৎ ক্লান্তি বশতঃ মণিন অবস্থায় তদীয় কক্ষে প্রবেশ করিলেন । সোহাগী দেখিল তাঁহার হস্তে একটি অনাবৃত ছায়াচিত্র রহিয়াছে ? সোহাগী ইহা দেখিয়া কোতূহলে দ্রুত কেদারা ছাড়িয়া তাঁহার হস্ত হইতে ঐ ছায়াচিত্রখানি লইয়া, পুন কেদারায় উপবেশন করিয়া চিত্রখানি নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল । যাহা মনে করিয়াছিল ; তাহা নহে । তবে ঐ চিত্রখানি—ঐ ছায়া-অঙ্কিত যুবতীটি ;—সুন্দরী ? মনে

মনে ইহা গীমাংসা করিল। মণিলালবাবু এতক্ষণ মোহাগীর মুখের দিকে পলকহীন চক্ষে চাহিয়াছিলেন। কারণ সেহোগী, ঐ চিত্র অঙ্কিত যুবতি মূর্তি সম্বন্ধে নিজের কি অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু মোহাগীর যে অভিমত, মণিলাল বাবু তাহা পূর্বে হইতেই জাঁচিয়া লইয়াছিলেন। মোহাগী বলিল ; “আমি মনে করিয়াছিলাম,—না জানি তুমি—কি অপরূপ রূপসী, রূপজালে জড়িত হইয়াছ। আশ্চর্য্য! এরি—জন্তু; তোমার চিত্রচাকল্য;—এরি জন্তু আমাকে পর্য্যন্ত, তোমার সাহায্য করিতে হইবে?” মণিলালবাবু বলিলেন, “আমি তাই মনে করিয়াছিলাম। দেখ ইনি, তোমার চক্ষে সুন্দরী না হইলেও, ইনি আমার চিত্রচাকল্যের হেতু। বাহা হউক, এখন এ সম্বন্ধে তোমার আমার তর্ক করা দূর। তৎপরে বলিলেন; দেখ আগাদেব সময় হইয়া আসিল; তুমি সেই স্ট্রট পরিধান করিয়া সজ্জিত হও; আমি খানিক পরে আসিতেছি বলিয়া; মণিলাল বাবু নিজ বৈঠকখানাভিমুখে গমন করিলেন।

মোহাগী বৈকালিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া, মণিলাল বাবু কথিত বেশভূষায় সজ্জিত হওন উদ্দেশে, স্নহৎ মুকুর সন্নিহিত, একটি কার্য্যকার্য্য শোভিত সজ্জাধার পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। মবীন নবনীত স্কোমল ব্যাগ্রজাব বিরহিত হস্তে, সজ্জাধার উগ্ৰুক্ত করিয়া, যেন বাছিয়া বাছিয়া, একটি মনমত পরিচ্ছদ বাহির করিয়া, সেই সজ্জা তোরঙ্গ সাবধানে,—যেমন ছিল, তেমনি রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত বিশাল মুকুর সম্মুখে রাখিত, একখানি কেদারায় দসিল; বলিয়া এক অপূর্ণ বেশ পরিধান করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে মোহাগী দিব্য একটি নবীন নগর—অতি অল্প বয়স্ক পাঞ্জাবি যুবকে পরিণত হইল। মোহাগী মুকুর সম্মুখে দাঁড়াইল,—আপাদ মস্তক কমণীয় মূর্তি মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইল। একটি অপরিচিত নব্য যুবক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইল, সে মুহূর্ত্ত মাত্র আত্ম-বিস্মৃতি জনিত মলজ্জায়—যেন পদাঙ্গনে ঈচ্ছুক; দর্পণস্থ তাহার ছদ্ম-বেশী ছায়ামূর্ত্তিও তাহার অঙ্গসরণে ব্যগ্র—যেন তাহাকে রসিক নাগরের মত উপহাস করিল। মোহাগীর পদকে চমক ভাঙ্গিল। এই ব্যাপারে তাহার হৃৎকোষাক্রান্ত মনে হাঁসি আসিয়াছিল, হাঁসি আসিবারই কথা। তাহার মস্তক-স্থিত স্নহৎ পাগড়িটি আমোদভরে এই হাঁসিটুকুকে আরো কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াছিল। মোহাগী যখন শিক্ষিত অভিনেত্রী ভ্রাতা, প্রাণের বিষাদ ঢালিয়া, মর্শ্বকরূপ দর্পণ সম্মুখে যৎকিঞ্চিৎ হাঁসি খুসিতে ছিলা। তখন মণিলালবাবু

৩৪নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কাগজ সপ্তদাগর এ, সি, পালের অফিসে ইহাতে প্রকাশিত।

মোহাগীর অজ্ঞাতসারে তাহার পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়া, বন্দিগি আশ্রয় বলিয়া, একটি বড় রকমের সেলাম চুকিয়া দাড়াইলেন। বলিলেন ; “ছজুরকা ওয়াস্তে, ইয়ে তাঁবেদার গাড়ী মজুত কিয়া হ্যায়। আউর কেয়া হুকুম ফারমাইয়ে।” মোহাগী গ্রীবদেশে দ্বিগুণ হেলাইয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল ; হাস যাতে হৈ, তুম্, হাসার। সামনে হোকে চল। মনিলালবাবু ছজুরের হুকুম মত সম্মুখে সম্মুখে এবং ছজুর সাহেব পশ্চাতে পশ্চাতে তাহার অনুসরণ করিল। সম্মুখে আসিয়া উভয়ে থামিলেন। মনিলালবাবু ঘোবারীককে কি কথা বলিলেন। পরে দ্বার পাদপ্রান্তে আসিয়া, মোহাগীকে রাজপথে, সহিস রক্ষিত একটি ট্যাঙ্কোম গাড়িতে আরোহণ করিতে বলিলেন। উজ্জিত অনুযায়ী মোহাগী গাড়িতে উঠিল। পরে, মনিলালবাবু, উক্ত গাড়িতে উঠিয়া, ইডন উদ্যানান্তিমুখে ধাবিত হইলেন।

এইরূপ ভ্রমণ, এই নুতন নহে। এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য বায়ু সেবন ; না—ইহাতে অন্য অভিপ্রায় নিহিত আছে ? যাহা হউক ; বাটি প্রাক্যগমন-কালে, কি একটা বিশেষ কর্তব্য অনুবোধে তিনি একবার শান্তাবাবুর বাসায় গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বোধ হয়, ইন্দুবাবু সংক্রান্ত কোন আবশ্যকীয় কথা ছিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।



—“আমার ভয় করে।”

ইন্দুবাবুর এখন আর সেদিন নাই ; তিনি জাতীয় স্বর্করতামূলক সেই শোক-মলিনদের হস্ত নিজ্রান্ত হইয়া সভ্যজনোচিত আয়তাবীন হইতে পারিয়াছেন।—অশৌচ-স্থলনে, জাতি মিলন ভোজ সামাজিকতার পর ; অন্য সময়ের বাড়িতে লাক্ষ্য প্রীতিভোজের চালওয়া উৎসব ছুটাইয়াছে।

তাই সময়ের বাড়িতে আজ, কি নিম্নে, উপরে, কি কক্ষে, বহির্ভাগে ; সর্বত্রই গীত বাদ্যের হাসিখুসি আমোদ উল্লাসের প্রতিধ্বনিময়, পৈশাচিক রোগে পরিশূর্ণ। বাড়ির সকলে নারকীয় আমোদ প্রমোদে মাতোয়ারা। সকলেই ঘৃণিত স্বচ্ছাচারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য। কি—বাবু বিনি, কি—চাকর চাকরানি,

সকলেই মদিরা পানে উন্মত্ত । কেহ কাহারো কথা শুনিতেছে না ; সকলেই স্ব স্ব প্রাণ ।

সরমের কক্ষের ত কথাই নাই । সেখানে ছ-শ-মজা ; পাঁচ-শ-রগড় । ঠাসা-ঠাসি বাবু বিবিধ বাহোবা কেয়াবাত রূপ শরীত সংক্রামক উৎসাহের রঙ্গভঙ্গির মধ্যে সুরা-রস-রঙ্গিনী নর্তকী সরমা বিভোরা । এই ঠৈশাটিক অভিনয়ের প্রধান নায়ক ইন্দুবাবু, বিভোরা নর্তকী সরমের রূপমাগরে, সীমাবদ্ধ জামায়াণ বিবুর্ণিত লৌহময় 'বয়রা' । অসিদ্ধবাবু তাহাতে বাতাবিতাড়িত লক্ষলষ্ট উন্মাদ তরণী । মণিলালবাবু ও অল্লাল নিমজ্জিত বন্ধু বান্ধব সহচরবর্গ তন-উপরিস্থ উল্লাসিত বিমান-বিহারী শিকারী পক্ষি ।

প্রিয় পাঠক ! সুরা-রস-রঙ্গিনী নর্তকী সরমের রূপমাগরে, আজ অসিদ্ধ বাবু বাতাবিতাড়িত লক্ষলষ্ট উন্মাদ তরণীর মত কেন ; জানেন ?—অবশ্যস্তাবি ভাগ্য-পরিবর্তনলীল অক্ষক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, নিরাসিয়া ছাড়িয়া, মদিরা পানে আমিষ হইয়াছেন ; কেমন করিয়া জানেন ? 'দশ চক্রে ভগবান ভূত হন, যেমন রকমে'—

সেই সমাগত নিমজ্জিত বনিয়াদি, আমিষ মহাশয়গণের মধ্যে—সেই সুরা-রস-রঙ্গ-রাজ হুড়ামণি ব্যক্তিগণের মধ্যে অসিদ্ধবাবু কি একা—গোড়া ঠাকুর দাসের মত, নিরাসিয়া হইয়া থাকিতে পারেন কি ?—কখনই না ; তাঁহারা প্রথমতঃ তাঁহাকে আমিষ দলভুক্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা, তাঁহার পেঁচোয়া কথায় হার মানিয়া, শেষে তাঁহারা সুরা-রস-রঙ্গিনী সরমকে ধরিলেন । সরম ; ইন্দুবাবুর জঁজিতে সুরাপূর্ণ পাত্র অসিদ্ধ বাবুর অধরপ্রান্তে লইয়া গিয়া, নিজ মৃণাল ভূজবল্লি, তাঁহার কক্ষে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল । অসিদ্ধবাবু, সরমের উপযুক্ত পরিমধুময় অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না । তিনি সুরবেশা রস-রঙ্গিনী সরমের হস্তস্থিত পাত্র হইতে একটু, একটু, পরে চুমুকে চুমুকে পাত্র নিঃশেষ করিলেন, তাঁরপর মদিরা আপন প্রভাব যখন তাঁহার মস্তকে বিস্তার করিল, তখন তিনি মদিরা-রমাপ্রাদ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অনুরোধ উপরোধের আর অপেক্ষা না রাখিয়া, পাত্র পাত্র মদিরা নিঃশেষ করিতে লাগিলেন । এইরূপে তিনি নিরানিয় হইতে আমিষ হইলেন । এইরূপ অথগুণীয় ভবিতব্যের অক্ষক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, আশোদভরে দিগনাত উন্মাদ তরণীর মত সরমের উচ্ছাসিত রূপমাগরে নাচিতে নাচিতে ফিরিতে পারিলেন ।

এদিকে ব্যাপার এইরূপ। অতীতকে শুদ্ধ সরমের দিদিমার অর্গলবদ্ধ কক্ষে ব্যাপার অতীতরূপ। তথায় তাহার অভ্যন্তরে জগতের তিনটি ছেয় প্রাণ, কাহার সর্বনাশ কবিনার আশায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কুমন্ত্রণা করিতেছে। এই তিনটির মধ্যে একটি আপনার পরিচিত, তিনি সরমের দিদিমা। অপর দুইটি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহার মধ্যে একটি জীলোক অতীত পুরুষ। জীলোকটি বাড়ির; পুরুষটি বাহিরের। দুই জনই প্রায় দেখিতে সমন্বয়; কিন্তু জীলোকটি পুরুষ অপেক্ষা বয়সি, আনুভূতি,—সাদা কথায় বলিতে হইলে, ছুঁত্ হাঁড়ি; আর পুরুষটি দেখিতে ছুঁদে বাগ্দি। ইহারা সকলেই মদিরা পানে রঞ্জিত। ইহা বলাই বাহুল্য।

জীলোকটি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিতেছে; “ও সব বাবু, আমি পারব না, তবে আর যা কিছু করতে হয় করব,—ও সব বাবু—আমার ভয় কবে।” সরমের দিদিমা চাপা গলায় সেই জীলোকটির শেষ কথা বিজ্ঞপের ছলে প্রতিধ্বনি করিয়া, শ্লেষ বাক্যে কহিল; ছুঁড়িকে—এতদিন ধরে খাওয়ালুম;—পরালুম—সব বৃথাই গেল। একটা কাজ বলুন তা পারবে না।” সেই জীলোকটি, অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চ গলায় বলিল; “তোমার বাবু একলি অনাস্থি,—অত বড় জোয়ান মদ মিশের গলাটা আমি টিপে বাগাতে পারবো কেন?” “হারামজাদি, আস্তে—আস্তে, বাহিরে লোক আছে—জাননা!” সরমের দিদিমা, তাহাকে দন্তনিষ্পেষিত রাড় তিরস্কার করিয়া, আবার বলিল। “তোকে কি, একলা এই কাজ করতে বলাচি? যত্ন কাছ থেকে, এই লোকটা, তবে কি এত্রে এসেচে! তুই কেবল (সেই লোকটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া,) এই লোকটার একটু—সাহায্য করবি। আর যত্ন, যদি এর মধ্যে এসে পড়ে—তার আসবার কথা আছে—তা হলে তোকে দরকার হবে না,—না হলে তুই একটু,—এর সাহায্য করবি।” সে জীলোকটি, ইহার কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। সরমের দিদিমা আরো বলিল; “আমাদের এ কাজে একটা—বেশ সুযোগও হয়েছে; যা কখন মনে করি নাই, পরমেশ্বর তা ঘটিয়ে দিয়েছেন। ছোঁড়াটা মদ খেয়ে বে-আকসে মাতাল হয়ে গেছে; এখন আমাদের এ কাজে কোন ঝোঁক থাকবে না;—সকলো বয়েই হবে; মজল মদ খেয়ে, সামলাতে না পেরে, মদ আটকে মরে গেছে। তবে এই আহাঙ্কদের ঠোঁটকির তুফান, আকসে মদ্য নাগাদ, একটানা রাখতে

পারেনি হইয়া । —তা থাকবে ; এখনও যেকোন রং জমাট আছে, —এ সময়ে অবধি থাকবেই থাকবে ; তারপর, তখন রং উল্টে দিয়ে সকলকে বিদেয় করে—বুঝি । তারপর সেই—মদ্য মাংস ধ্বংসকারী, শ্রোতার প্রতি মুখ ফিরাইয়া বলিল, ‘কেমনগো ।’—

ঠিক—এমন সময়—সরমের রংমহলে, ভয়ানক একটা বিকট গাঙগোলে, তাহার চমকিত নিষ্পন্দ নিকীক হইল । তারপর তাহার মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, গম্ভীর দরজা খুলিয়া, ব্যাপার কি,—জানিবার নিমিত্ত সরমের কক্ষ-প্রতি ধাবমান হইল ; তথায় গিয়া দেখিল ; সরমের রংমহল হইতে, রং উল্টাইয়া গিয়া, তথায় ভয়ানক গাঙগোল উপস্থিত হইয়াছে । ইন্দু-বাবু ও অসিদ্ধবাবুর সহিত মহা দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে ; পরস্পর ছঁকা ও মদিরাপূর্ণ বোতল নাইয়া, হৈ চৈ রকমের দাঙ্গা করিতেছে । তাহাদিগের গম্ভীর আওয়াজে, বাড়ি ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতেছে, সমাগত বন্ধু বান্ধব-গণ ;—কেহ বিবসন, কেহবা কটিকটে অর্ধ সংলিপ্ত বসনে, কক্ষময় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মদিরা মাংসে একাকার করিয়া,—অহা অহা জিনিশ পত্র তচনচ করিয়া, ইন্দুবাবু ও অসিদ্ধবাবুর পরস্পরের প্রতিঘনিষ্ঠা ছিন্ন করিবার আশায় তাহার উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে,—কিন্তু পারিতেছে না ।

সরমের দিদিমা ব্যাপার কি—শুনিয়া, বুঝিল ; অসিদ্ধবাবুরই যত দোষ । দোষ এই ;—সেই রংমহলে নর্ত্তকী-ভাবময়ী গায়িকা সরমের স্তমধুর মুখরিত—এই গীত শুনিয়া,—

সোহাগে বৈধে ছিলে প্রাণ, করিয়া যতন, যখন ।

তখন দিয়াছি আমি ; তোমার ঢালি (আমার) জীবন যৌবন ॥

এখন আর নয় ;—

ওহে প্রাণ ধন ॥

এই গীতে একটি ইয়ার-চুপ্‌কের প্রাণ, বড়ই গাতিয়া উঠিয়াছিল, সে শুদ্ধ বসিয়া গান-শ্রবণজনিত মজার পরিতৃপ্ত না হইয়া, সরমের সহিত যুগল মিলাইয়া কর্কশ সুরতানে নৃত্য করিতে করিতে গান ধরিল ।—

হক্সিয়ার মালমা যেমন নিতুই নূতন ।

বিধুমুখি তেমনি কি তোমার ভালবাসার গুণ ॥

সরমের গানে, এই গান গিস্ খাইয়া সেই কক্ষস্থিত যাবতীয় রসিক-লাগরণকে উদ্ভাসের প্রায় করিয়াছিল ।

অধিকন্তু অসিদ্ধবাবুর প্রাপকে—মদিরার নেশায়, ময়মের কিয়দংশী কণ্ঠে ও সেই লোকটির মধুর মিলন গীতে,—উচ্ছাসিত ভরজে পরিণত করিয়াছিল। অসিদ্ধবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি যুগলে যুগল মিশাইয়া যেন-আক্কেলের মত, নৃত্য সুরা করিয়া, রসভঙ্গ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি ইন্দুবাবু ও আর সকলে বিরক্ত হইয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে সংযত হইতে কহিল। কে শুনে কার কথা! অসিদ্ধবাবু, বড় ধাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন; ইহাতে ইন্দুবাবু দৈর্ঘ্যচ্যুত হইয়া অসিদ্ধবাবুকে—কি একটা কটু কহিলেন; তাহাতে অসিদ্ধবাবুর রঞ্জিত প্রাণে আঘাত লাগিল।

এই সূত্রে, ছুই এক কথা হইতে হইতে ঐ দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ইহাতে ত স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, অসিদ্ধবাবুর দোষ।—আর যায় কোথা,—তখন ময়মের দিদিমা, সেই মধ্যস্থদিগের মধ্যবর্ত্তি হইয়া—“বেটারা পরের খনে, পোড়ারি করে,—আর তাদের তেজ দেখনা।” ইত্যাদি কটু কাটব্য প্রয়োগ করিয়া অসিদ্ধবাবুর পৃষ্ঠের উপর, একটি শতমুখির দস্তরমত মৎ ব্যবহার করিয়া লইল।

এই আকস্মিক কাণ্ডে, সেই কক্ষ-প্লাবনকারী জন-তরঙ্গ-নির্নাদ, মুহূর্ত্তে কোথায় অন্তর্হিত হইল। ময়মের দিদিমার, এই অভাবনীয় কার্যে, সকলেই লজ্জাবনত বদনে, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া, নীরব ভাষায় কি বলাবলি করিতে লাগিল। ইন্দুবাবু, ময়মের দিদিমার এই কার্য্য ব্যবহারে যার পর নাই অপ্রস্তুত হইয়া, লজ্জাবনত মস্তকে থমিয়া পড়িলেন। অসিদ্ধবাবু—তার কথা—আর বলিবার নয়, তিনি নির্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া ময়মের দিদিমার অনলবধি চক্ষের উপর, নিজ বিষয় বিক্ষান্তিত চক্ষু রাখিয়া, হতভম্বার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন,—তাঁহার ছুই চক্ষু দিয়া, অত্রাবারি বিগলিত হইতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল,—ঠিক হয়েছে,—আমার উপনৃত্ত শিক্ষা হইয়াছে—আর কেন।—

তিনি আর কাহাকেও কিছু মা বলিয়া—যেন মতমে মরিয়া, ধীর পদ-বিক্ষেপে কক্ষের বাহিরে আসিলেন,—নেশায় অবশ পদে, হস্ত সাহায্যে পাছুকা পরিলেন; ধীরে ধীরে রেজিং অবলম্বন করিয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া, সেই পিলাচপুরী ত্যাগ করিলেন; তার পর তিনি কোন লোকের সাহায্যে, একটি গাড়ি ভাড়া করিয়া, বাড়ি রওনা হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।



—“তুই পালিয়ে যা—পালিয়ে যা !”—

এই আকস্মিক অভাবনীয় কাণ্ড কারখানায়, এত যে আয়োদ্র এয়োদ্র,—
এত যে রঙ্গরঙ্গ, সব কোথায় বিলীন হইয়া গেল। কি—এক বিষাদের
ছায়ায়, সকলে ত্রিসমান হইয়া পড়িল।

এই সময় আর একটি লোমহর্ষণ ছুঁটনা—আর একটি ভীষণ গর্ভস্পর্শ
কাতর আর্তনাদ, তাঁহাদিগকে আরও চমকিত, ভীত, উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল।
সকলে তাড়াতাড়ি সসব্যস্তে, সেই কাতর আর্তনাদ,—যাহা বায়ুসহ এখন
মিশাইয়া যায় নাই—সেই ক্ষীণ শব্দ লক্ষ্য করিয়া সকলে বাহিরে আসিল—
বাক্সা হইতে, যাহা দেখিল,—তাঁহাতে সকলের আত্মাপুরুষ শুকাইয়া, মুখ
বিবর্ণ হইয়া গেল—দেখিল; সরমের দিদিমা আর নাই,—তাঁহার সমস্ত
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—সোপান হইতে হঠাৎ পদখলনে
পড়িয়া গিয়া সোপান ঘাত প্রতিঘাতে একেবারে পিণ্ডাকার হইয়া, নিম্নতলে
গিয়া পড়িয়াছে।

এই অবস্থায় তাঁহারা—বাটিন্স সকলেই, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে
না পারিয়া, সকলেই অস্পষ্ট প্রলাপ কোলাহলে, কেবল বাটী প্রতিধ্বনিত
করিতে লাগিল। যাহারা উহাদিগের মধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ ছিল, তাঁহারা
তাড়াতাড়ি সরমের দিদিমার সেই চেতনাশূন্য কণ্ঠের প্লাবনে রঞ্জিত ভগ্ন
দেহের শুক্রা বিধানে ব্যস্ত হইল।

প্রিয় পাঠক ! অকস্মাৎ এই অভাবনীয় ঘটনা কিরূপে ঘটিয়া গেল—
জানেন ? অসিদ্ধবাবুর অপমাণে কক্ষস্থ সকলেই, কেমন এক রকম
গস্তির ভাব ধারণ করিয়াছিল;—এই বিপরীত দেখিয়া, সরমের দিদিমা,
কিছু অন্তমনস্ক হইয়াছিল, তারপর যখন তাঁহার চমক ভাঁজিল; তখন
দেখিল; অসিদ্ধবাবু নাই—এই ছিল,—আর নাই; ফুন্ মন্নে উড়ে গেল
নাকি ! তাও কি—কখন হয় ? বাহিরে আসিল;—উগ্রচণ্ডার মত একজনকে
জিজ্ঞাসা করিল; “অসিদ্ধ গেল কোথা ?”—“তিনি এইমাত্র নিচে নেমে
গেলেন।” যাবে কোথা,—দরজা বন্ধ করি বলিয়া যেমন নিম্নে অবতরণ

করিবার নিমিত্ত, একটি ছইটি সোপান, অতিক্রম করিয়াছে, অগ্নি পদ-
অগ্নে, তাহার দশা-বিপর্যায় ঘটিল ।

প্রিয় পাঠক ! সরমের দিদিমা অসিদ্ধবাবু—দূর পশ্চাতে, কেন
বাবমান হইতে যাইতেছিল, বুঝিয়াছেন কি ?—আপনার বোধ হয় অরণ
আছে ? সেই অর্গলবন্ধ নিভৃত কক্ষে, সরমের দিদিমা, ছইটি লোকের
সহিত, যে একটি লোকের বিরুদ্ধে,—একটা সামাজিক যড়যন্ত্রে রত ছিল, সে
লোকটি আর কেহ নয়, আগাদের অসিদ্ধবাবু ।—শিকার হস্ত হইতে পলাইবে
কোথায় !—এখন বুঝিলেন কেন ?—

সে যাহা হউক, সেই ব্যাস্তবাগীশ গুপ্তচাকারীর দল ; সরমের দিদিমার
বহুকণস্থায়ি অচেতন অবস্থা দেখিয়া, তাহারা তাহাকে মৃত মনে করিল ।
তখন সকলে মহা ভীত হইল । পুলিশ আসিয়া, না জানি তাহাদিগের
কতই ছুঁদা করিবে—হাতে হাতকড়ি দিয়া, সকলকেই চালান করিবে ;
কাহাকে ফাঁসি দিবে,—কাহাকে হরিণবাড়ি দিবে, কাহাকেও বা আর কোথায়
পাঠাইবে ;—কার ভাগ্য, কি আছে, কে জানে । এই ভয়ে ভীত হইয়া
অনেকে গা ঢাকা দিলেন ;—আগেত অনেকেরই দিয়াছেন—এখন যাহারা
রহিলেন, তাহার মধ্যে, যিনি বিজ্ঞ—তিনি বাড়ির লোকদিগের সহিত
পরামর্শ করিলেন ; এখন আর, এ বিষয় চেপে রাখা উচিত নয়, পুলিশে
সংবাদ দেওয়াই মঙ্গল । কপালে যা হবার হবে ; এই স্থির করিয়া,
বাড়ির একটা লোক, পুলিশে সংবাদ দিতে গেল ।

ইহার কিছুক্ষণ পরে, সরমের দিদিমার অঙ্গে অঙ্গে চেতনা সঞ্চার হইল ।
ধীরে ধীরে নিমিলিত নয়ন উন্মিলিত করিয়া উর্জদৃষ্টে আকাশ পানে চাহিল ।—
একটি গভীর যজ্ঞা-বিজড়িত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল । ক্ষীণ-
স্বরে কহিল—বড় পিপাসা—একটু জল ;—তখনি জল আনিয়া দেওয়া
হইল । জল পান করিয়া যেন, একটু সুস্থ হইল । নয়ন উন্মিলন করিয়া যেন,
কাহাকে দেখিবার ইচ্ছায় চারিদিকে চাহিতে লাগিল ;—যাহাকে দেখিতে, ইচ্ছা
করিল, তাহাফি দেখিতে না পাইয়া, পুনঃ নয়ন মুদ্রিত করিল । ধীরে ধীরে,
যজ্ঞা বিজড়িত ক্ষীণস্বরে ডাকিল ;—“সরম !—সরম নিকটে ছিল । সে উত্তর
দিগ ; এই যে দিদিমা, আমি এইখানে,—শিয়রে ।”—“তুই শিয়রে ! এখন ত
তোমার শিয়রে থাকবারই কথা । না—না—তুই পালিয়ে যা—পালিয়ে যা !—
আমি তোমার শত্রু—শত্রু—আমি তোমার যেকোন শত্রুতাসাধন করেছি ! আহা !

ভুট্ট কটি মেয়ে;—তোব শত্রুতাসাধন করে—উঃ !—উঃ !—একটু জল দাও, তখনি জল দেওয়া হইল। পরে কথকিৎ স্নহ হইয়া, আবার বলিতে লাগিল;—তোব যে অনিষ্ট করেছি; তার দণ্ড, এ জগতে নাই। আমি রাফগি, বয়সকালে পোড়া পেটের জন্মে, তোকে—উঃ ! যত্ন,—সরতান যত্ন,—উঃ !—

সরমের দিদিমার মুখ হইতে, আর কথা ফুটিল না,—একটি যজ্ঞাদায়ক শব্দের সহিত পাপীষসীব পাপময় জীবনপ্রদীপ নিৰ্ব্বাণ হইয়া গেল।

সমাগত ব্যক্তিগণ, সবমের দিদিমার এই সকল কথা শুনিয়া, অবাক হইল, তাহারা একবার—সেই শোকে, ছুঁথে ম্লান। বিষাদ প্রতিমা, সরলা সরমের মুখপানে; আর একবার সেই পাপীষসীর কলঙ্কিত প্রাণশূন্য শব্দেহের প্রতি তাকাইয়া তাকাইয়া, কি দেখিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।



—“বাস্তবিক এ লোকটা খুনি !”

ইহাদের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন পুলিশ সদলবলে, সেই ব্যক্তির সহিত ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল। পুলিশ যথাবিহিত তদন্তে—প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া, লাস হাঁসপাতালে চালান করিবে; এমন সময় দারগা সাহেবের নজর—সহসা সেই বাটির মধ্যস্থ একটি লোকের প্রতি আকর্ষিত হইল। দারগা সাহেব যুগপৎ চরম বিস্ময় উৎসাহিত হইয়া, কেদারা ছাড়িয়া, নক্ষত্রবেগে লোকটির সম্মুখীন হইল, দৃঢ়স্ববে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি নবীন? সে লোকটির মুখ পাংগুর্ণ হইয়া গেল। সে যতমত থাইয়া আম্তা আম্তা করিতে লাগিল। দারগা সাহেব তাহার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া বজ্র-গভীরস্বরে, আপন অমুচরগণকে বলিল; “একে বাঁধ”—অমুচরগণ সজ্বর আসিয়া তাহাকে বন্ধন করিল।

বাড়ির সকলে যার পর নাই—বিস্মিত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহারা সকলে সমস্তরে বলিল;—“ইনি যে, আমাদের দাদাবাবু—বাড়ির কর্তা।” দারগা সাহেব অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল;—“কি! এ ব্যক্তি আমাদের বাড়ির কর্তা;—দাদাবাবু! এই বদমাইস কি—এই বাড়িতে

থাকে ?” “না—ইনি এ বাড়িতে থাকেন না ।” দারগা সাহেব তাহাদের মুখের কথাটি কাড়িয়া বউয়া, ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিলেন ; “ইনি তবে তোমাদের বাড়ির কর্তা হইলেন কিরূপে ?” “ইনি এই বাড়ির গিরির নিকট (সেই পাণীয়সির মৃতদেহ দেখাইয়া) কখন কখন আদৃতেন । ইহাকে আমরা বাড়িতে খুব কম দেখি ।”

দারগা সাহেব অধর দংশন করিয়া, জঙ্ঘা মর্দন করিতে করিতে—যে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিল ; তাহার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিয়া বলিলেন ;—“তবে আসকে ইনি হঠাৎ এসে পড়েছেন—কেমন ?” “হঠাৎ আসবেন কেন ! ইনি আজ এখানে আসবেন,—এই কথা আমরা জানি ।”

দারগা সাহেব বিস্ফারিত নেত্রে ভ্রুকুটি করিয়া, আশ্চর্যের কক্ষসরে বলিলেন । “তবে নাকি, এ ব্যক্তি—এ বাড়িতে কখন কখন আসে—তোমরা ইহাকে খুব কম দেখ ।—যে ব্যক্তি কোন্ দিন, এখানে আসবে,—যখন তার একটা কিছু স্থির নিশ্চয় নাই ; সে স্থলে তোমরা কিরূপে জানতে পারবে যে, এ ব্যক্তি আজ এখানে আসবে ?” “পূর্বে হতে ইনি খবর দিয়েছিলেন ।” “চিঠি লিখে ?” “না—লোক মারফত ।” “কবে ?” “কাল ।”

দারগা সাহেব তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন ; “কাল ?” তার পর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন । “এ—লোকটি যখনই, এখানে আসে—তখনই কি লোক মারফত খবর পাঠায় ?” “না—এইবার দিয়েছিলেন ।” “কুন্নে এইবার দিয়েছিল ?—তাব কারণ ?”—“তার কারণ, আমরা জানি না” যিনি এর, আসবার খবর এনে দিলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি এর কারণ বলতে পারবেন ।” “তিনি কোথায় !” “তিনি এখানে আছেন ।”—এই কথা বলিয়া সে লোকটি চতুর্দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল । কিন্তু কথিত লোকটিকে দেখিতে না পাইয়া বলিল ; “এখানে ত তাকে দেখতে পাচ্চিনা, বোধ হয়, উপরে গিয়ে থাকবে ।

কখনই দারগা সাহেব, তাহাকে—তাঁহার নিকট ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত, তাহার সহিত দুইজন পাহারাওয়া ও একজন জমাদারকে উপরে পাঠাইয়া দিলেন, বহু অনুসন্ধানের তাহাকে সেখানে পাওয়া গেল না ।

দারগা সাহেব যখন এই কথা জানিতে পারিলেন । তখন তিনি যেন, সেই লোকটির উপর ভারি চট্টয়া উঠিলেন—যেন, তাহার একটিও কথা সন্তোষজনক হয় নাই ।

দারগা সাহেব এইরূপ মহা গরম অবস্থায়, প্রথমে বাহিরের ছজুকপ্রিয় ভামাসা-দর্শকগণকে—বাহারা পরস্পর—সেই ধৃত ব্যক্তিকে ঐ মৃত্যুর হত্যাকারী, এইরূপ আখ্যা প্রদান করিয়া, তাহার সম্বন্ধে বিচারের ছলে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, অস্পষ্ট গোচরযোগ সৃষ্টি করিতেছিল—তাহাদের উপর অকণ্য কু-কথা প্রয়োগ করিতে, করিতে জুতার মদ্যবহার করিয়া জনতার জন-কোলাহল দূরে তাড়াইয়া দিলেন ।

পরে তাহাকে গরম মেজাজে জিজ্ঞাসা করিল। “তুমি এ বাড়ির কে ?” “ভাড়াটে।” “তুমি কি কর ?” “আমার ছকার দোকান আছে।” “কোথা ?” “ডাঙার।” “তুমি এ বাড়িতে কতদিন আছ !” “আজ পনের ঘোল বছর।” “তোমার দেশ কোথা ?” “আমার দেশ নাই।”

তখন দারগা সাহেব তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া সেই ধৃত ব্যক্তির প্রতি নজর ফিরাইলেন। দেখিলেন, সে গলদঘর্মে স্নাত হইয়াছে। তাহাকে ছই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সে উত্তর দিল না। দারগা সাহেব তাহার সহিত আর কোন কথা না কহিয়া, সেই পানীনির শবদেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া, সেই লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ; “এ মাগীটার আর কে আছে ?” “একটি নাতুলী আছে বলিয়া, সেই লোকটি—সেই—কত অস্পষ্ট অসমাপ্ত, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ চিন্তাভাবনতা মলিনা সরমকে দেখাইয়া দিল। দারগা সাহেব চঞ্চল মুখে নেত্র, ছখিনী সরমের সুন্দর মুখখানির প্রতি তাকাইলেন। ছখিনী সরম ; দারগা সাহেবের অন্তরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল।

দারগা সাহেব, কর্কশকণ্ঠে মধুর কথা অবতারণা করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন ; “তুমি এর নাতুলি হও ?” “সরম জানত বদনে কহিল ;” “হ্যাঁ, ইনি আমার দিদি—মা হন।” “তোমার নাম কি ?” “সরম।”—

তৎপরে দারগা সাহেব ; সেই ধৃত ব্যক্তিটিকে দেখাইয়া হাঁসিয়া বলিল ; “তবে এই লোকটি তোমার দাদামহাশয় হন ?” সরম ঠোকার কোন উত্তর দিল না—চুপ করিয়া রহিল। দারগা সাহেব সরমের উত্তরের ছলে বলিল ; “না—এই লোকটা—এই পুরো বদমাইস খুনি আসামিটা—একদিনের জন্ত তোমার দাদামহাশয় হইতে পারে না।

খুনি আসামি—এই কথাটি শুনিয়া, তত্রত্য সকলেই আশ্চর্য্য বিস্ময় বিক্ষা-
রিত নেত্র, সেই খুনি আখ্যাপ্রাপ্ত লোকটির প্রতি চাহিল। দেখিল ; তাহার নয়নদ্বয় খুনি ব্যক্তির স্রায় লোভিত আকার ধারণ করিয়াছে। সে মনন

দোখিয়া তাহাদেব প্রাণ শিহবিয়া উঠিল । তাহাদেব তখন মনে হইল, বাস্তবিক এ লোকটা খুন—

অনেকে ইহাব বিষয়ে কোতুহলাক্রান্ত হইয়া দাবগা সাহেবকে পুনঃ পুনঃ বিনয়াবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা খুন কবেছে মহাশয় ? কবে খুন কবেছে মহাশয় ?—

* * * * আজ প্রায় বিশ বৎসর হইল । বর্দ্ধমান জেলায় কোন স্থানে, বামুন দিঘী নামক একটি পুকুরীর তটে সন্ধ্যাকালে, একটি লোককে, কে অতি নির্দয়রূপে খুন করিয়া পলাবন করে । দুই বৎসরকাল বহু চেষ্টা করিয়াও কর্তৃপক্ষগণ ঐ সাংঘাতিক খুনের কোন কিনারা কবিত্তে পাবিলেন না । একদিন একটি অভাবনীয় উপায়ে সেই খুনের কিনারা হইয়া গেল । তাহাতে জানা গেল, যে খুন করিয়াছে, সে ব্যক্তির আব কেহ নয়—সেই হত ব্যক্তির কুদটা দ্রাব উপপত্তি ।

তখন প্রকৃত অনুসন্ধানেনও সে লোকটাকে ধৃত করা হুস্ব হইয়া পড়িল । কেননা, সে অতি অদ্ভুত উপায়ে আত্মগোপন করিয়া চলিত ;—কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সে অনেক সময়ে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ্যে পুলিশের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া, নিজের কাজ হাঁসিরা করিয়া বেড়াইত, পুলিশ ইহাব কিছুই জানিতে পারিত না । দুশমনেব দু-দিন, সৎ লোকেব একদিন । এই মহাবাক্যের স্থির সিদ্ধান্ত কবিবার জন্তই যেন, সে লোকটি একটি সামান্য কারণে ধরা পড়িল ।

তাবপর সেই স্থলে তার ভয়ানক বহুশ্রময় জীবনের সেই খুন ছাড়া আবও কত ভয়াবহ বহুশ্র বাহির হুয়া পড়িল । যাহা শুনিয়া সকলেই যাবপর-নাই আশ্চর্য্য হইল—সন্দেহ করিল—ভাবিল ; এ লোকটা যাহুমন্ত্র জানে নাকি ?—

বর্দ্ধমান অঞ্চলে তখন মহা ধুমবামে জন্তকোর্টে সেই নবহস্তাব বিচাব হবে—বর্দ্ধমান অঞ্চলে সর্বত্রই এই কথা ঘাইয়া,—যবে বাহিবে, হাটে—মাঠে—ঘাটে—যেখানেইজন লোক এক জায়গায় একত্রিত—সেইখানেই এই প্রসঙ্গ ।—এমন সময় সর্বত্র প্রচার হইল, সেই নবহস্তা পলাতক ।—সকলেই অবাক হইল—মনে কবিল—এ লোকটি নিশ্চয়ই যাহুকব—

আমি তখন বর্দ্ধমান জেলার জজ কোর্টেব হেড কনেষ্টবল । পুলিশের ঐ ভয়ানক গাফিলিতে উপবত্তমালা কর্তৃপক্ষ মহাশয়রা আমাদেব উপর বড় কড়া

হটলেন । 'সুতরাং এই দুর্নাম স্থলনেব জন্তু আমবা প্রানপণ যত্নে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ত, উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম । কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া গেল ।—আমবা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার আব কোন উপায় উদ্ভাবন কবিতে পারিলাম না ।

এইরূপে এতকাল এই বদমাইস পুলিশেব মুখে চুণ কালি দিয়া আসিতে-ছিল ।

দাবগা সাহেব সম্ভবত দুই একটি কথায়, তাহাদিগকে ঐ খুনে বদমাইস বিষয়ক কথা বলিয়া, তদসম্বন্ধীয় আর কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিবার অভি-প্রায়ে কথা বার্তার ছলে, দস্তবমত তদাবক কবিয়া—তিনি সেখানে পুলিশ পাহারা বসাইয়া স্থানে স্থান করিলেন ।

আব বাড়ির সকলে সবমেব দিদিমার ও তাহার—সেই নরহস্তা উপপতির ভয়ানক বহুশ্রম জীবন ব্যাপার আলোচনা কবিয়া, তদসংক্রান্ত সহবাসে তাহাদেব যে কোন অনিষ্ট হয় নাই ; ইহার কারণ, পরমেশ্বকে তাহারা আপন আপন মনোগত পুষ্পাজলি দিল ।

আর সবম কি কবিল ? সরম যাহা কবিল—যাহা দেখাইল । তাহার তুপনা—তাহার মত নিষ্ফল স্বপ্ন চরিত্রে—অতি অল্পই দেখা যায় ।

সরম এখন ধোঁরা, স্থিবা, গজিরা, সরমেব এই আকস্মিক পরিবর্তন সাধা-রণের পক্ষে বড়ই আশ্চর্যজনক । কিন্তু তাহার পক্ষে—ইহা অতি স্বাভাবিক । কারণ দণ্ডে দণ্ডে ঘটনা বৈচিত্রে ও তাহার প্রহেলিকাময় জীবনের গুটিকত অস্পষ্ট শব্দাকার ঈজিত—যাহা তাহার নাপীয়সী দিদিমার প্রমুখ নির্গত হইয়া তাহার মুগ্ধপ্রায় পূর্ব স্মৃতিকে আঘাত করিয়াছিল । তাহাতে সবম স্বাভাবিক নিয়মে আকৃষ্ট হইয়া তন্ময় হইয়াছিল বলিয়া,—মুগপৎ ঐ পরিবর্তন ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।



“বেমানুম সাফ সরে পড়িল ।”

মুগা প্রায় ঝটিকাব পৰ, জগতেব প্রাণিগণ যেক্রপ নীরব নিরাশাপূর্ণ বিধাদ কালিমাব ছায়ায় মগ্ন হইয়া পড়ে । সেইরূপ সেই ছুঁটনার পর, সবমের বাড়িব মুকণ্ডে কেমন এক নিবস অবসাদে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল । বাড়ি

এখনও ৯টা বাজে নাই ;—বাটির সকলে এখনও নিদ্রাদেবীর প্রকোমল
অঙ্গগত হয় নাই ;—তবু যেন বোধ হইতেছে—গভীর নীরব নিশীথ ।

এইরূপ নিস্তব্ধ নিরস নিশায়, সরস আপন কক্ষে শয্যাপরি বিষম চিন্তায়
চিত্ত আলোড়ন বিলোড়ন করিতেছে ;—ভাবিতেছে—সেই কথা,—যে কথা
তাহার গুল্মপ্রায় পূৰ্ব্ব স্মৃতি টুকুকে খোঁচ মারিয়া—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিতে
ক্ষুদ্র বৃহৎ এমন অনেক চিন্তা তরঙ্গের উৎপত্তি করিয়াছে ।—সেই কথা—
ভাবিতেছে—চেষ্টা করিতেছে,—সেই অস্পষ্ট দৃশ্যমান ক্ষীণ তটিনী রেখাসদৃশ—
ক্ষীণ স্মৃতিছায়া—যাহা বিস্মৃতির তলে লুকাইত—তাহা যদি কোন রকমে
বাহির হয় ;—কিন্তু হইল না ; তাহার সমস্ত চেষ্টা, ক্লান্তিভরে ব্যর্থ হইল,—
সে একেবারে নিরাশায় ডুবিল ।—

এমন সময়ে, হঠাৎ অসিদ্ধবাবু একটি কথা, তাহার মনে পড়িল ; অমনি
তাহার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল । ভাবিল—বোধ হয়—অসিদ্ধবাবু
তাহার পূৰ্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত আছেন । যদি নাও থাকেন,—তবু কিছু না কিছু
জানেন ।

এই ভাবিয়া সরস বাকুল হইল ; কারণ অসিদ্ধবাবুর সহিত তাহার আর
দেখা হইবে না । দিদি—মা তাহার সে পথে কাঁটা দিয়া গিয়াছেন ।—অসিদ্ধ-
বাবু ভদ্রলোক—তিনি অকারণ অপমানিত হইরাছেন—তিনি মরমে মারিয়া
চলিয়া গিয়াছেন ।—তিনি কি আর আসিবেন ।—ইন্দুবাবু এই অনর্থের মূল ;
তিনিই ত অকারণ আগে তাঁহাকে কটু কথা বলিয়া তাহার মনঃপীড়া দিয়া-
ছিলেন—তাঁহাকে ক্রোধিত করিয়াছিলেন । অসিদ্ধবাবু অতি ভদ্রলোক—তার
কোন দোষ নাই । অসিদ্ধবাবু অতি সৎ বিবেচক—অতি মিষ্টভাষী পুরুষ ।
তিনি আমাকে কত গল্প শুনাইতেন—কত ভাল কথা বলিতেন । সময়ে সময়ে
আমার জন্ত—কি জানি কেন ছুঃখিত হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়া দীর্ঘ-
নিশ্বাস ফেলিতেন ; না জানি অসিদ্ধবাবু আমার কত ভালবাসেন । আমি
তাহার দাগী হইবার যোগ্য নহি ; ইত্যাদি চিন্তা তাহার মনোমধ্যে যতই
উদিত হইতে লাগিল । সরস অসিদ্ধবাবুর প্রতি ততই পক্ষপাতিনী হইতে
লাগিল এবং ইন্দুবাবুর অভদ্রতার কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ
হইতে লাগিল ।

সরস কি তার এই ঘোর ছুর্দিনে আপন কক্ষে এইরূপভাবে একাকি—
বিষাদ চিন্তায় মৌন মতি ?—তার নিকটে—তার হৃৎখে মহাশুভৃতি প্রকাশ

করে—এমন একজনও কি নাই? সেই মত মধুপ রত্ন—ইন্দুবাবু এমন কোথায়? আর—সেই—যিনি যার কাছে যেমন, তার কাছে তেমন, সেই—সরকারীবন্ধু শাস্ত্রবাবু নাই?—“না তিনি নাই; তিনি অনেক কাল ভৌমরা যাছুর মত—সরমের রংমহলে রং ছুটাইয়া, নিজের মত খানিক রংয়ের মধু-মজা লুটয়া রাতাতিই ভৌমরা—ভৌ দিয়াছেন।”—

“ওঃ! তাই সবমের রংমহলে—রংয়ের বাজারে তার বেশী কিছু মজাদারি বুকনি টুকনি শুনা যায় নাই। আচ্ছা এই বেথরচের মজাটা বে দবদে ছেড়ে বেমানুম সাফ সরে পড়ল; এর কারণ কি?”

“এর কারণ বিববারের পর সোমবার আছে জানত!”

“জানি; তাতে আর হয়েছে কি!”—

“কিছু না; তবে খামখা আফিসটা কামাই হবে।”

“তা হলেই বা,—তাতে কি আসে যায়;”—

“পরমা আর টাকা।”

“তা’বলে, কালে ভদ্রে বেথরচের মজাটা, কেন ছাড়বে?”

“এইটি, তোমার পাগলামি—তোমার নিজের মত কথা—সেকি ছাড়লে,—পেয়াদায় ছাড়লে—সাহেবের চাঁটরূপ একটি বিষম বহর আছে, জানত?”—

“না!—সেটি আবার কিরূপ!”—

“সেটি, জুতোগুচ্ছো শ্রীচরণের হাড়গোড় ভাঙ্গা ঠোক্র।”

“ও বাবা! একদিনআধদিন, কোন রকমে কামাই হলে পরে, ভদ্রলোকের ডেলের গায়ে জুতোগুচ্ছো লাগি,—ও বাবা!—এ সব সাহেব বেটারা ত ভারি পাজি।”—

“ও কথাটি বলোনা,—ওরা রাজার জাত, ওদের জুতো লাগি, আগাদের পক্ষে পুষ্প উপহার তুল্য ধরে লওয়া উচিত।—তুমি খামখা রোজ বোজ অফিস কামাই করে কাজ নষ্ট করবে, আর সাহেব তোমায় পূজো করবে—কেমন!”

“ও—তাই!—এতক্ষণ বুঝিচি;—তা যাই হক, এ সময়ে সরমের নিকট ছই একজন থাকা আবশ্যক; তা ইন্দুবাবু আছেন ত?—যে হয় একজন থাকলেই হলো। আহা! সরম বড় হতভাগিনী।”

* * * * *

ইন্দুবাবুর আমোদপ্রিয় প্রাণে,—এই আমোদ তরঙ্গহীন নিবুম নিষ্ক্রিয় জড়-চিন্তা ভাগ লাগিল না। অদিকন্তু এই ভূতের বোঝার মত নিবুম চিন্তা তাহার

অন্তমনক্ গনকে বাড়ির দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিল । তাহার মনে হইতে লাগিল, আমি আজ বাড়ি ছাড়া কদিন ?—অমনি কেমন একটা উদ্বেগপূর্ণ চঞ্চলতা আসিয়া তাহার চিত্ত অধিকার করিল ।—ভাবিল ; তাইত—

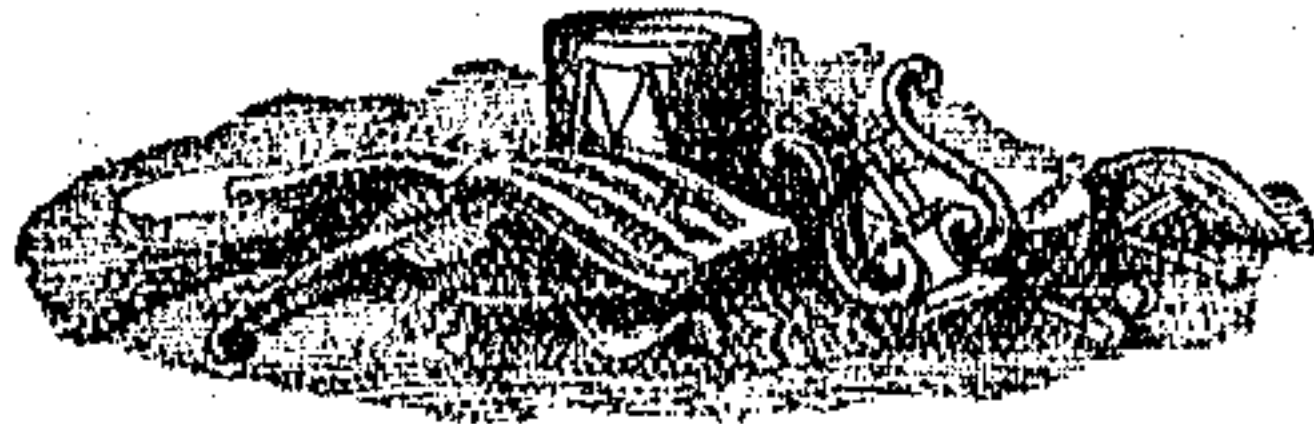
এই উদ্বেগপূর্ণ উন্মেষিত চিন্তা ভালরূপ প্রস্ফুটিত হইতে পারিল না । ইহার কোলে, সহসা আর একটি চিন্তা উদ্ভূত হইয়া ঐ স্ফুটনমুখ চিন্তা মুকুলে শুকাইয়া, তাহার দুর্বল মস্তিষ্ক অগ্নিময় করিল ।—সেই চিন্তা,—অন্য কিছু নহে—তাঁহার স্বর্গীয় পিতার—তৎপতি, সেই—নিষ্ঠুর আদেশ ।

ইন্দুবাবু অমনি তাড়িত সঞ্চারে উঠিয়া দাঁড়াইল । সেই ছুটিস্তায় মুহূ-মানা হতভাগিনী সরমকে ডাকিয়া বলিল ;—“দেখ সরম আমার বড় অসুখ করছে, আমি বাড়ি যাচ্ছি ; তোমার কোন ভয় নাই—আমি আবার কাল সকালে আসিব । “সরম অন্তমনকে ইন্দুবাবুর মুখপানে একবার চাহিল, তার পর বলিল “আচ্ছা যাও”—

ইন্দুবাবু চলিয়া গেলেন ।

আর অকূল পাথারভাসিনী সরম ; তাহার জীবনে—এই যুগ পরিবর্তন দুর্দিনে সন্ত্যোগ ব্যক্তিগত সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়া, একাকী সেই শূন্য কক্ষে সেই ভাবে রহিল—

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ ।



Printed by Bhuth Nath Das.
OF THE "BILARAT DARPAN PRESS."
1173-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

বহস্য-প্রদীপ ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“সর্বনাশ—হীরার আংটি কোথায় ?”—

হুদানীঃ অসিদ্ধবাবুর পরিবারবর্গের চক্ষে অসিদ্ধবাবুর গতিবিধি ভাব-
ভঙ্গি—কেমন এক রকম বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে—কেমন এক রকম
ব্যতিক্রম ঘটয়াছে—এইরূপ বোধ হইতেছে । গৃহে কাঞ্চন প্রতিমা বধুমাতা,
ছদ্মপোয়া স্বর্ণশিশু ;—ইহাদিগের প্রতি যেন তাঁহার আর সে আদর, যত্ন,
প্রীতি সম্ভাষণ সন্মাননা নাই । ইহা ছাড়া রাত্রি একটা, কোনদিন রাত্রি
ভোর, কোন দিন বাড়ি এলেন না—এ সব শুনি কি ?—ভাবিয়া তাঁহার
স্নেহময়ী প্রৌঢ়া জননী কিছুরই কুল কিনারা পান না ।

তাঁহার সরলতার সাক্ষাৎ প্রতিগূর্ত্তি স্ত্রী স্বামীর এইরূপ ভাবের বৈলক্ষণ্য
দেখিয়া সদাই ত্রিয়মানা ক্ষুণ্ণবিশীনা—তাঁহার সেই হরিণী-স্বাস্থিত নয়নযুগল
সদাই অশ্রুসিক্ত ।—

কাল আবার অসিদ্ধবাবু বাড়ি আসেন নাই । আজ সাড়ে ঐরটা বাজিতে
যায়, তবু আসিলেন না । তাঁহার প্রৌঢ়া জননী এখনও কিছু মুখে দেন
নাই ;—উপযুক্ত সম্ভানের আগে কিরূপে থাইবে বলিয়া বসিয়া আছেন ।
তাঁহার স্ত্রী এখনও পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করে নাই, সে এতক্ষণ পর্য্যন্ত জল গ্রহণও
করে নাই । স্বামী না থাইলে কি পাওয়া যায় ? তাঁহারে রাখিয়া আগে আগে

পরিবর্তন ।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত । ১৭৩।১নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, ভারত-দর্পণ প্রেসে মুদ্রিত ।

থাইব ?—তানিয়া বাসগাছে । বৃদ্ধা কি, ভূত চিনিবাস, তাহা কি কিছু কিছু জনমোগ কবিয়াছে মাল ।

যখন ১টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন অসিদ্ধবাবু বাড়ি আসিলেন । ববাবব নিজ কক্ষে গিয়া চুকিলেন । যাহা তাহাবা অসিদ্ধবাবুব বয়স অবধি দেখেন নাই, আজ তাহাই দেখিলেন । যাহা তাহাবা কল্পনাকারে স্বপ্নও ভাবেন নাট । আজ তাহাই ভাবিলেন । যে অসিদ্ধবাবুব স্মৃতিত্ব কথা তাহা দিনকে অতুন আনন্দ প্রদান করিত, সেই অসিদ্ধবাবু আজ অযশেন কুখ্যাতিব নিশান উড়াইয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত দেখিয়া, তাহারা সুগভীর নিবানন্দ হৃদে নিমজ্জিত হইলেন ।

কালেক গতি বিচল, আশ্চর্য্য ।—অসিদ্ধ তোমার দোষ কি ? তোমাব গান্য কি যে, তুমি নিয়তি নিয়মেব বিকদ্ধাচাবী হও । যাহা হইবার—তাহা হইয়াছে । ভবিষ্যতেব অকৃতম প্রদেশে তোমাং জ্ঞাত কি নিহিত আছে—জগতের জ্ঞাত কি নিহিত আছে—কে বলিতে পারব । অসিদ্ধ মন্দিরপান কবিয়াছে—বেশাসক্ত হইয়াছে । ঘটনাব শ্রোতে মিথ্যাবাদী হইয়াছে—বিশ্বাসী অবিশ্বাসী হইয়াছে ।

অসিদ্ধবাবুকে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস কবিলেন না । বৃদ্ধা কি কিছু বলিবাব উদ্দেশে অসিদ্ধবাবুব কক্ষে প্রবেশ কবিয়া দেখিল, অসিদ্ধবাবু জ্ঞাত পবিচ্ছদাদি না খুলিয়া শয্যাপবি গাত্র ঢালিয়া দিয়াছে । সুবাপানজনিত হৃগন্ধ তাহার গাত্র হইতে ভক্ ভক্ করিয়া বাতব হইতেছে । চক্ষু দুটো খোর আরক্ত তাহাতে তীব্র দৃষ্টি দেখিয়া বৃদ্ধা বিব বাক্যক্ষুব্ধ হইল না, ভয়ে কম্ব হইতে নিজান্ত হইয়া, চিনিবাসকে দেখিয়া বলিল, “দেখেচ—দেখেচ সৃষ্টি যজানে ! এঁয়া ! এ কব্লে কি !—একেবারে বগে গেছে, ওতে কি একটুও পদার্থ নাই ? এঁয়া ! ছিঃ ছিঃ ! কি লজ্জাব কথা ;—বাব জায়গায় বেড়ান কাপড় ; সে কাপড় চোপড ছাড়া নেই—একেবারে গিয়ে বিছানার উপবে, ছিঃ !—ছিঃ !—ছিঃ । বৃদ্ধা একেবারে অসন্তোষে এবং হুঃখিত চিন্তে এই কথাগুলি বলিল ।

চিনিবাস শুনিব ।—ধীরভাবে শুনিব—ধীবে অসিদ্ধবাবুব কক্ষে প্রবেশ-কালীন দেখিল ।—

“কি দেখিল ।”

“যাহা দেখিল—তাহা বলিবাব নাই ।”

কি কবিরে? চিনিবাম, অসিদ্ধবাবুর পবিত্রের বজ্রাদি সমস্ত খুলিল। দেখিল, জামার পকেটে ঘড়ি—ঘড়িচেন নাই। চিনিবাম বাস্তবাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“ঘড়ি, ঘড়িচেন কোথায়?”

অসিদ্ধবাবু জড়িত বসনায়, জড়িত স্ববে হাত নাড়িয়া উত্তর দিল, “আমি কি জানি—কোথায়—তুই দেখনা।”

চিনিবাম সবিস্ময়ে আবাব দেখিল, অঙ্গুলিতে হীবকাজুবি নাই, সময়ে উদ্‌ঘাটিতে জিজ্ঞাসা করিল, “সর্বনাশ—হীরের আঙুটি কোথায়?”

অসিদ্ধবাবু ইহার কিছুই উত্তর না দিয়া, পবিত্র বিবস্ত্র হইয়া জড়িতস্ববে গেল, “কি আশ্চর্য্য! বাহিবেও নিস্তার নাই, ঘবেও নিস্তার নাই। এখন শাস্ত্রবিটিক কথা ছেড়ে দাও—এখন আমায় একটু প্রাণভোবে ঘুমতে দাও—ঠাণ্ডা হতে দাও, সোণাবচাঁদ এখন পুনিশের দারগাগিরি ছেড়ে দাও বাবা”—

আরো কি বলিতে বাইতেছিল, এমন সময় সদর হইতে একাট চীৎকার শব্দ আসিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিল। নির্ঝাক চইয়া শুনিলেন, “ও বাবু—বাবু আমি আর কতক্ষণ ডেঁড়িয়ে থাকবো। আমায় ভাড়া পেটিয়ে দিন না।”

ইহা শুনিয়া অসিদ্ধবাবু চিনিবাসকে বলিল, “চিনিবাম এড় তুল হয়েছে। ঐ গাড়িওয়ালা অনেকক্ষণ পর্যাণ্ড দাড়িয়ে আছে, ওকে আগে ভাড়া দিয়ে এস।”

চিনিবাস বিনা বাক্যমায়ে, কত ভাড়া দিতে হইবে জানিয়া, ভাড়া দিতে গেল।

এদিকে ননীবা ॥ স্নানোত্তর বসিয়া সেই কক্ষ প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—❦—

“ও—মা গো”—

❦ ॥ এখন এ নাচটা বাজিয়াছে। অসিদ্ধবাবু এখনও নাসিকান্ধারি বসিত কামিনী নিদ্রা বাইতেছে, জামা ৭৬ পাল্ল বসিয়া ননীবা ॥ বিবস

বদনে স্বামীর অধঃপতন সংক্রান্ত। বয়স ভাবিতে ভাবিতে তত্রাবেশে কত কি স্বপ্ন দেখিল,—যত ছলক্ষণ—তাহাদিগের বিকট বিভীষিকা আতঙ্কদায়িনী মূর্তি,—যেন তাহার দূর অদৃষ্ট আকাশে আসিয়া কত কি অভিনয় করিল। স্বপ্নের শেষ অভিনয় অপেক্ষাকৃত ভীষণ হইতে আরও ভীষণ—দেখিল, সভয়ে দেখিল যেন, ননীবালা স্বামী-কোলে স্থথনিভায় কত কি স্থথ-স্বপ্ন দেখিতেছিল, কিন্তু সহসা চমকিত হইয়া দেখিল; এক ভয়ঙ্কর স্থান হইতে ক্রমাগত নিবিড় পুঞ্জীকৃত কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি উথলিয়া বিশাল আকাশের প্রান্তে প্রান্তে ছুটিয়া বিরাট আকাশ ভরিয়া ফেলিল; মুহূর্ত্তে সমভ্রমিত-চিত্তে আবার দেখিল, তন্মধ্যস্থিত আবিভূতা একটি বিছাৎ-বরণী রমণী মূর্তি,—সে মুছ মুছ হাসিয়া বিছাৎবরণ চম্পক অঙ্গুলি সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিল। ননীবালা তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ, সে আশ্বে আশ্বে স্বামী-কোল হইতে উত্থান করিয়া, বিছাৎবরণী রমণীর নিকট অগ্রসর হইল; এক পদ—দুই পদ করিয়া বিছাৎবরণী রমণী—যেন দ্বলক্ষ রসির ফাঁসি তাহার গলায় পরাইয়া তাহাকে অগ্নে অগ্নে টানিয়া নিবিড় জ্বল্জ্বলকারে লইয়া গেল। ননীবালা বিছাৎবরণী ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইল না,—শূন্যে আছে—কি মৃত্তিকায় আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। মুহূর্ত্তে পলকে সচকিতে দেখিল, বিছাৎবরণী নাই—আবার মুহূর্ত্তে সাম্ভর্য্যে সচমকে দেখিল,—বিছাৎবরণী তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুছ মুছ হাসিতেছে;—পুনঃ সবিস্ময় বিস্ফাবিত নেত্র দেপিল, বিছাৎবরণীর চম্পক কনিষ্ঠ অঙ্গুলি-শিরে অসম্ভব আকার শত শত পোঙ্কলিত অগ্নি শিখা সম্পন্ন যথা জ্বল। ননীবালা মনমুগ্ধ আভ্রিত শত চেষ্টায় ব্যাকস্ক্রবণ হইতেছে না—কি করিলে, তখন নিশ্চেষ্ট অসাড় অনস্থায় দণ্ডায়মান। সহসা বিছাৎবরণী হাত মুখে তাহার হস্ত আকর্ষণ করিল। ননীবালা পলাহতে যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বিছাৎবরণী সেহ আশ্রয় বিকট জ্বল, ননীবালায় উপর নিঃক্ষেপ করিল। ননীবালা ভাঙে চাঁৎকাব কায়া মচ্ছিন্ন হইল। কতক্ষণ পরে মূর্ছা অপনোদন হইলে দেখিল, তাহার শিরোদেশে বহুদিনের পরিচ্ছিন্ন জীবন-বন্ধী, তাহার মস্তক নিজ উপোপরে স্থাপন করিয়া তাহার গুঞ্ঝা করিতেছে।

সহসা তত্রার আবেশ অপমারিত হইল। ননীবালা দেখিল,—কোথায় কিছু নাই। সে পূর্বেকাল মত পতি-পদপ্রান্তে বসিয়া আছে; স্বামীর মুখ গানে চাহিল; দেখিল—সেই মূর্তি;—ইতিপূর্বে—স্বপ্নাবস্থায়—তাহার সঙ্কট-

কাণে যিনি তাহার গুণায় নিযুক্ত ছিলেন—ইনি সেই । তাহাতে ইহাতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই ; তবে তিনি নির্মল প্রফুল্ল এবং জ্যোতির্ময়—আর ইনি জ্যোতীর্হীন প্রশান্ত এবং মলিন ।

এই সময়ে কি একটা কথা—সেই দুঃখ-প্রসূত কি একটা দূর অমঙ্গলময় দারুণ বিভীষিকা ননীবালার মনমধ্যে পতিত হইল—ননীবালা শাহরিল—কি জানি কেন ! ননীবালা ইহাতে নীরবে কাঁদিল ।

* * * * *

এতক্ষণে অসিদ্ধবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল ; এখন তাহার নেশা ছুটিয়াছে,—খোঁষারি ধরিয়াছে,—মন বিগড়াইয়াছে । নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, তাহার পদ-প্রান্তে ননীবালা ; তাহার সেই চল চল সজল আয়ত লোচনে অশ্রুবারি বিগলিত হইয়া রক্তিমাতা গগুস্থল বহিয়া পীনোন্নত বক্ষে পড়িতেছে ।

আর সহ হইল না, জলিয়া গেল ;—“কেবল চক্ষের জলে বুক ভাসাবে—কেবল অনেকের আশ্রয়ের মত অন্তরে অন্তরে পুড়িবে, বড় পেয়ে বসেছ—না ?” এই কএটি কথা বলিয়া, ঘোর বিরক্তি সহকারে সবেগে অসিদ্ধবাবু উঠিয়া বসিলেন ।

অসিদ্ধবাবুর বিরক্তিকর অসাবধানতায় উঠিয়া বসায়,—হটাৎ পায়ের আঘাতে ননীবালা পালঙ্ক হইতে নিম্নে পতিত হইল । দারুণ আঘাতে শ্বাস-রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল—অনেক কষ্টে ক্রন্দন কুটিল,—“ও মাগো ।”

সে ক্রন্দন কক্ষিই রহিল—বাহিরে আসিল না । কেন আসিল না ? যদি কেহ গুনিতে পায়—যদি কেহ এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে জানিবে, তাহার স্বামী তাহাকে অনাদর করিয়া—অশ্রুচ্যুত করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে—মারিয়াছে ।

ইহা দেখিয়া অসিদ্ধবাবুর বিগড়ান মন মজিল—গলিল—চমক ভাঙ্গিল,—তিনি প্রাণে অসহ্য যাতনা অনুভব করিলেন । অসিদ্ধবাবু তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া ননীবালাকে বক্ষোপরি তুলিয়া পুনঃ শয্যায় আশীন হইলেন ;—অতিক্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন, “ননীবালা তোমায় বড় লাগিয়াছে—স্বাজ আমি তোমায় উৎপীড়ন করিলাম ; কিন্তু অগ্রাহ্য করি নাই, হঠাৎ এইরূপ হইয়া গেল । একে আমার মেজাজ খারাপ হইয়া রহিয়াছে—তাহাতে তোমার কাঁদ কাঁদ মুখখানি দেখে আমি বড়ই বিরক্ত বোধ করেছিলাম, তাহাতে অসাবধানে এরূপ ঘটিয়াছে । তুমি আমার ক্ষমা কর ।”

ଏହିକ୍ଷଣ ମୋହାଗ ନନୀବାବା ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିଯା ଗେବା, ଶକ୍ତିମାନିଓ ହହଲ—ମାନେ କବିତା, ଆମ ଉତ୍ତର ମାତ୍ର କଥା କହିବ ନା । କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ା ଯେ ମାନା ମାନିଲ ନା—କଥା କହିତେ ହହଲ, ଗଦ ଗଦ ଭାଷେ କହିଲା ।—“ଆମା ବପାଙ୍କ ପୁଅମାନେ—ଭାଉଁଶମାନେ, —ତାହି ଭୂମି, —ଆମି କେନ କାନ୍ଦିଲାମ, ଜିଜ୍ଞାସା ନା କାବିଲା, ନା ଧୁଆଁଲା, ଆମା ଉପର ଦିଗ୍ଘ ହେଲେ, —ଆମି ଶତଭାଗିନୀ—ତାହି ଭୂମି ଆମାଙ୍କ ଆମା ହେଲା, ଆମାଙ୍କ ହେଲେଦେବତା ହେଲା ଭୂମି ଆମାଙ୍କ କନ୍ଦନେବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବାସିଲେ ନା—ଆମାଙ୍କ କନ୍ଦନେବ ବେଦନା ଭୂମି ବାସିଲେ ଅନୁଭବ କାବି । ନା ।”

ଆମିକାବାବୁ ହହଲେ ଯାଏ ଯାଏ ନାହିଁ ଯାଜ୍ଞିତ, ଅପେକ୍ଷିତ ହେଲେନ, ବାଲିଲେନ,—ନନୀବାବା ବାସ୍ତବିକ ଆମି ତୋମାଙ୍କ ନିକଟ ଅପବାଧି—ବାସ୍ତବିକ ଆମି ତୋମାଙ୍କ କନ୍ଦନେବ କେବଳ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନା ହେଲା ତୋମାଙ୍କ ଉପର ବିରକ୍ତ ହେଲାହିଲାମ—ତୋମାଙ୍କ କଥା ଦିଶାହିଲାମ ।—ଭୂମି ଆମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି କର, ବଳ ଆମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି କାରିଲେ ?” —

ନନୀବାବା ଆମିକାବାବୁଙ୍କ ଏହି ଅନୁରୋଧ ବିନୟେ ଏକେବାବେ ଗଲିଯା ଗେଲେ ନାଜ୍ଞା ବାବେ ଗଲିଯା ସୁନ୍ଦର କପୋତଭାଗ ବକ୍ତିମାତା ସାବଣ କବିତା । ମୁହଁ ସ୍ବେଦ ବାଲିଲେ, ‘ଓ କି କଥା । ଅମଳ କଥା କି ବାଳାତ ଆଛି ?’—

ଆମିକାବାବୁ ନନୀବାବା ଏହି ସ୍ବାଭାବିକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା ବଡ଼ିତ ମୋହିତ ହେଲେନ, ଯେନେ ଉତ୍ତାମ ତାହା । ନବନୀତ ସମାନ ସୁକୋମ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବସେ ଶ୍ରାବଣ ଭାବିଲା ଏକଟି ଚୁଷ୍ମ କାରିଲେନ । ଆମି କେମିତି ପିପାସି ସବଳା ନନୀବାବା ମୋହାଗେ ଆମିକାବାବୁଙ୍କ କୋଳେ ଚାଲିଯା ପାଡ଼ିଲା । ସବଳ ଆମିକାବାବୁଙ୍କ ଘୋର ହେଲା, ଅଗସ୍ଥ କି ଏହି :—

ଏହିକ୍ଷଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେନେ ସମୟ ଆତିବାହିତ ହେବାପର ଯାବ ଆମିକାବାବୁ ତାହାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କାରିଲେନ, “ଆଜ୍ଞା ନନୀବାବା ଭୂମି କାନ୍ଦିତେଲେ କେନ ?” —

ନନୀବାବା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନେ ଆମି ମୋହାଗ ସେହି ଚୁଷ୍ମେ କଥା କାରିଲାହିଲା, ଯେଉଁ ଆମାଙ୍କ ଆମିକାବାବୁ ଜିଜ୍ଞାସା ସେହି କ୍ଷଣିକାବଳି ସ୍ବେଦ ଭାବେ ଚିତ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଯେ—ସେହି ପୁନଃମିତ୍ତ ହେଲା ତାହାକେ ବିବର କାରିଲା, ସେ ତାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତେ ବାଲିଲେ, “ଏକଟି ଚୁଷ୍ମ ଦେଖିଲା ଆମାଙ୍କ ବଡ଼ ଆତ୍ମା ହେଲାହିଲା—ଯେତେବେଳେ ଏକଟା ଯାବ ଅମଳ ସାନ୍ତାପିତ ହେଲା ଆମାଙ୍କ କାନ୍ଦା ଆମିକାବାବୁ ।”

ଶିକ୍ଷିତ ଆମିକାବାବୁ ହାସିଲେନ, ବାଲିଲେନ, ‘ବାସ୍ତବିକ ବାସ୍ତବିକ ହିଲେ, ତାହା ଯାହା ।’

ভাব পর ননীবালা মুস্কোক্ত অগ্নগত বিষয় অসিদ্ধবাবুকে অনাঠিতে বাগিল।

বিশবিদ্যালয়েব ছাত্র অসিদ্ধবাবু স্বল্পকথা প্রথম প্রথম অনাহুলায় শুনিত-
ছিলেন, কিন্তু চঠাৎ তাঁহাব চিত্ত গবিবর্তিত হইল, তিনি সাশ্চর্যা সবিজ্ঞয়ে
নিম্পন্দ মনযোগেব মচিত্ত অগ্নগত বিষয়গুলি শুনিত বাগিলেন,—শেষ পর্য্যন্ত
শুনিলেন ।

ননীবালাব স্মৃতিশক্তি বদনকমল পানে কি এক অভিনব যিস্ময়াপূত
পেশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বহিলেন—দাঁখলেন, সেই—সেই বমণী মূর্তি ;—
অসিদ্ধবাবু ইতিপূর্বে নিজিতাসহায় অগ্নগতেব এক ভগ্নানক অঙ্ক ইহাতে যে
একটি বিপন্ন বমণীব বক্ষাসাধন কবিতাছিলেন, এ—সেই বমণী—তাঁহাবই
ননীবালা ।—

কি আশ্চর্য্য অগ্নেব এতদূব ঐকান্ত্য ? অগ্ন কি মতা ? কি জানি, ইহাব
ভিত্তব কি গুঢ় বহুস্ত আছে ! মনে মনে অসিদ্ধবাবু এইকণ তর্ক কবিতেন ।

ননীবালা তাঁহাব এই ভাব দেখিয়া বলিল, “ওকি ! তুমি আমার মুখ-
পানে ও রকম কবিতা চাহিয়া কি ভাবিতেছ ?”

অসিদ্ধবাবুব চমক ভাঙ্গিল, তিনি বলিলেন, “ও কিছু নয়, আমি
ভাবিতেছিলাম যে, মানুষে সাগাথ অগ্ন দেখিয়া এতদূব ভয় পায় । আমি এ
জানিতাম না ।”

অসিদ্ধবাবু তাবপব এই কথা ছাড়িয়া দিয়া অল্প কথা পাড়িলেন । বলিলেন,
—“তুমি আমার আগাবেব উদ্যোগ কব গিয়া, আমি স্নান করিয়া যাইতেছি ।”

ননীবালা অসিদ্ধবাবুব আহাৰেব উদ্যোগ কবিতেন গেল । অসিদ্ধবাবু
চৌবাচ্চায় স্নান কবিতেন গেলেন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।



—“কি খবর ননীবালা ?”

ইহাব কএকদিন পরে একদা অসিদ্ধবাবু আহাবাদিব পব, একাকীর্ণনাদ
কক্ষে শয্যাপবি উপবিষ্ট, বিগত ঘটনাব বিষয় ভাবনায় নিবত,—এ ভাবনা ভাবিবে
না,—‘গতশ্রু-শোচনা নাস্তি’—তবু কেমন আপনা আপনি ভাবনা আসে ।—

অসিদ্ধবাবু ভাবিতেছে, এ অপমান তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছে,— তাঁহাকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়াছে, এইবার তিনি ঐ কদর্য্য সংসর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিবেন। এইরূপ না হইলে তাঁহাকে আরো কত দুষ্কর্ম্মে বত হইতে হইত। কি আশ্চর্য্য সংসর্গ দোষ হেতু আমি ভ্রমে পড়িয়া মদিরা-পান করিলাম। অকাবণ লাঞ্ছিত হইয়া স্নানাম হাবাইয়া, লোক নিকট বেণ্টা-মজ্জ বালিয়া পরিগণিত হইলাম;—আমার দোষেই আমি মজিলাম। আমি স্বেচ্ছায় স্নানাম ছাড়িয়া ছব্ণাম ক্রয় করিলাম।

আচ্ছা সরম কি আমার অধঃপতনের মূল!—না না তাঁহা কেমন করিয়া বলিতে পারি। আমার এই অধঃপতনের মূল—ইন্দু! সরমকে আমি মিথ্যা দোষে দোষী করিতেছি, সবম ভাদ মন্দ কিছুই জানে না, কিছুই বুঝে না,— সবম সরলতার আদর্শ।—সেই সরম কি—আমার অবনতির কারণ হইতে পারে? কখনই না। আচ্ছা সরম আমার কে,—তার জন্ত আমার এত চিন্ত চঞ্চল হয় কেন?—ইহার কারণ সরম কপসী বলিয়া কি? আমার ননী-বালা অপেক্ষা কি সরম রূপসী? না না।—স্বীকার করি সবম সুন্দরী। কিন্তু আমার ননীবালা অপেক্ষা নয়। তবে তার জন্ত আমার মন ব্যাকুল কেন?—তার জন্ত আমার প্রাণ কাঁদে কেন?—তবে তার সেই সরল সুন্দরী ছবি আমার হৃদয়ে অহোরহো জাগে কেন? সরম অসহায় বলিয়া কি?—সরম নিজের অজ্ঞাতে পাপপথে আনিত বলিয়া কি? নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! বুঝি-য়াছি তাই—সরমের জন্ত আমার প্রাণ এতদূর কাতর। তাই তার জন্ত আমি সদাই অন্তমনস্ক। আচ্ছা সরম যথার্থ কি—সেই পানীয়সী রান্ধসীর ছহিতা—রক্তমন্তুতা ইত্যাদি কত চিন্তায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন।

এই সময় ননীবালা গৃহস্থালির দৈনিক সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়া, সেই কক্ষে হাত্মমুখে প্রবেশ করিল। বলিল,—“আজিকার একটি নূতন খবর আছে; এতক্ষণ এই খবর তোমায় বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।”

অসিদ্ধবাবু ননীবালাকে দেখিয়া, চিন্তভাব গোপন করিয়া, এই কথাগুলি শুনিলেন; হাসিয়া বলিলেন,—“কি খবর ননীবালা?”—

ননীবালা বলিল; “খুব ভাল খবর, সম্প্রতি জগতেব শুভ বিবাহ;—আজ সকালু বেলা সেই খবর আসিয়াছে, আমাদেরকে শীঘ্র বাড়ী যাঠিতে হইবে।”

এই বলিয়া গৃহস্থিত দেয়াজের উপর হইতে একটি পত্র লইয়া অসিদ্ধ-বাবুর হস্তে প্রদান করিল। অসিদ্ধবাবু পত্রখানি লইয়া ননীবালার হস্ত ধরিয়া

তাহাকে নিজ পার্শ্বে বসাইলেন। প্রিয় পাঠক মহাশয়! ননীবালা কথিত-
জগতবাবু আপনার নিকট পরিচিত নহেন। ইনি অসিন্ধুবাবুর মাতৃস্বাভাতা
হন, ইহাদিগের সহিত অসিন্ধুবাবুর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভাব হস্ত আছে।
তদনিবন্ধন অসিন্ধুবাবুর মাতৃস্বশ্রুপতি মহাশয় অসিন্ধুবাবুকে ও তাঁহার মাতা-
ঠাকুরাণীকে তাঁহার পুত্রের শুভ-বিবাহ উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত অবশ্য
অবশ্য আসিতে পত্র লিখিয়াছেন।

ইনি অসিন্ধুবাবুর বাস ভবনের নিকটবর্তী স্থানে নিজ পৈতৃক ভ্রামনে
বাস করেন। ইনি একজন বৈদেহীক গণ্য মাছু বাজকশ্রমচারী। পুত্রের শুভ
বিবাহ সংঘটন উপলক্ষে, তাহার উদ্যোগ আয়োজনে ছুটি লইয়া বাটা
আসিয়াছেন।

অসিন্ধুবাবু পত্র পাঠ করিয়া তানিগেন, এখনও উক্ত বিবাহের অনেক
বিলম্ব আছে। পবে বলিগেন, “বিবাহেব ত এখনও অনেক বিলম্ব।”

বুলা বাহলা ননীবালা উক্ত পত্র পাঠ করিয়া বাটীব সকলকে জানাইয়া-
ছিল; ইহাতে বাটীর সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

বিশেষতঃ অবরোধবাগিনী ননীবালা বিহগী ননীবালা; কারণ এই অছিলায়
অনেক দিনের পরে স্বদেশে গিয়া আত্মীয় স্বজন, মতি ও সঙ্গিনীগণের মুখ
দেখিয়া সুখী হইবে। তহা ছাড়া স্থান পরিবর্তন জানত তাহার স্বামী অসিন্ধু-
বাবুর অশান্তিপূর্ণ হৃদয়ে শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। তাই ননীবালা
তাঁহাকে এই সংবাদ আনন্দিত মনে দিয়াছিল ও তিনি এই সংবাদ পাঠে কি
অভিমত প্রকাশ করেন, শুনিবার জন্য উদগ্রীব ছিল। বখন ননীবালা অসিন্ধু-
বাবুর উক্ত পত্র শু নন। তখন ননীবালা কোমলতাপূর্ণ জেদভরে বলিল,
“তা বিলম্ব হ’ক; এখন কবে তথায় গমনের দিন স্থির হইবে বল?”

অসিন্ধুবাবু বলিগেন, “তার অল্প আর ব্যস্ত কি? বরাহ নগরের গোল-
যোগের নিয়ামসা কবিতা যাহা।”

ননীবালা মন ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। অসিন্ধুবাবু তাহাকে সন্তুষ্ট করি-
বার চেষ্টা বলিগেন, “তবে সন্তোহ থানেকের মধ্যে যাইব।”

এইরূপ কথা ব্যস্তাব পর কথা প্রমথ্যে অল্প কথা আসিয়া পড়িল; এই
কথা ব্যস্তা অল্প কিছু নয়,—অসিন্ধুবাবুর পরিবর্তন কাহিনী।

ননীবালা চুখিত অন্তঃকরণে বলিল, “তোমার এই পরিবর্তন অবশ্য
আশ্চর্যজনক, তোমার এই পরিবর্তন আমাদিগের প্রাণে কতদূর বিষম

আঘাত দিয়াছে, তাহা অন্তর্যামি পরমেশ্বর জানেন। তুমি যেমন ছিলে, তেমন না থাকিয়া এমন হইলে কেন? তোমার দেবচরিত্র সহসা কলঙ্ক কালিমায় কেন এমন মলিন হইল? কেন তোমার এই বিসদৃশ ভাবান্তর ঘটিল?”

এই কথাগুলি বলিয়া ননীবালা আবেগভরে ছল ছল দৃষ্টি পাতিয়া অসিদ্ধ-বাবু মুখপানে চাহিল, অসিদ্ধবাবু ননীবালার মুখনিহত এই কথাগুলি শুনিয়া কিছু বিরক্ত অথচ হুঃখিত হইয়া গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন, বলিলেন, “ননীবালা কেন তুমি এই অসাময়িক কথা তুলিয়া আমাকে বৃথা লজ্জিত করিতেছ, যাহা হইবার হইয়াছে, তাহা লইয়া বৃথা আলোচনায় ফল কি?”

ইহা শুনিয়া ননীবালা সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইয়া মস্তক আনত করিল।

অসিদ্ধবাবু কিঞ্চিৎ রুদ্ধ অথচ উদাসভাবে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “যদি তোমার অন্তঃদৃষ্টি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিত, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিতে এখন আমি কি! কেন এমন হইয়াছি; কেন আমার পদাশ্রয় হইয়াছে। ননীবালা! তুমি জান না আমার অজ্ঞাতে আমি কতদূর আমার বিশাল অন্ধতম ভবিষ্যৎ দূর্লক্ষণ কি সূক্ষ্ম জ্ঞানি না, সেই অভিনয়ের আয়োজনে কেমন ধীরে ধীরে আনিত হইয়াছি। আচ্ছা ননীবালা তুমি কি স্বপ্নেও কখন এইরূপ ভাবিয়াছিলে যে, তোমার অসিদ্ধ এমন হইবে? না—বোধ হয় কখন ভাব নাই। ননীবালা তুমি মনে করিও না যে, আমি একদিনে দুইদিনে এমন হইয়াছি, অনেকদিন ধরিয়া রহিয়া রহিয়া মবমে পুড়িয়া মরিয়া—শেষে ঘোর দগ্ধ অবসর হইয়া কালের কুটিল কক্ষে নীত,—মোহে আচ্ছন্ন; তাই আমার এই পরিবর্তন, তাই তুমি তোমার অসিদ্ধকে এইরূপ দেখিলে,—তাই তোমার মনে হইল, এমন ছিল, এমন হইল কেন? আমি বিশ্বাসঘাতক কদাচারী আমি তোমার উপযুক্ত নহি।”

অসিদ্ধবাবু এই সকল পদ উক্তি করিতে করিতে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

পতিপ্রাণা সাক্ষি ননীবালা স্বামীর আত্মগোপন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “অমন কথা বলোনা, তুমি স্বামী গুরু; আমি তোমার দাসী, তুমি যেমন কেন হও না, তবু তুমি আমার দেবতা—

তুমি আমার পূজা—তুমিই আমার একমাত্র লক্ষ্যস্থানীয় ; তুমি আর আমাকে গুরুপ বলে অপরাধিনী করো না ।” সরলা ননীবালা আব বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠরোধ হইল—সে কাঁদিয়া ফেলিল ।

অসিন্ধবাবু ইহাতে বিরক্ত হইলেন, কি বলিতে যাইবেন ;—এমন সময় চিনিবাস আসিয়া সংবাদ দিল, “ছইটি ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় সদরে অপেক্ষা করিতেছেন ।”

“এত রাত্রিতে ছইটি ভদ্রলোক আমার সাক্ষাৎ আশায় সদরে অপেক্ষা করিতেছেন ? ছইটি ভদ্রলোককে চিনিতে পারিয়াছ ?”

চিনিবাস কহিল,—“না, অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই ।”

“আচ্ছা তুমি লণ্ঠন লইয়া আইস ।”

চিনিবাসকে এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়া অসিন্ধবাবু আগন্তুক ভদ্রলোক ছইটি কাহারো এবং এত রাত্রিতে আমার নিকট কি প্রয়োজন বশতঃ আসিয়াছেন, জানিবার নিমিত্ত সদরে আসিয়া দেখিলেন, অন্ধকারাবৃত অস্পষ্ট দৃশ্যমান ছইটি ভদ্রলোক তাঁহারই দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন ; “আমাকে কি মহাশয়দিগের প্রয়োজন ?”

মৃদুস্বরে উত্তর পাইলেন,—“আজ্ঞে হ্যাঁ ।”

এই স্বর অসিন্ধবাবুর পরিচিত বোধ হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ; আমি কি মহাশয়দিগের নিকট পরিচিত ?”

পূর্ববৎ কৌতুক বিজড়িত ঈষৎ মৃদুস্বরে উত্তর পাইলেন,—“অবশ্য ।”

অসিন্ধবাবু স্বর চিনিতে পারিয়াও, পারিলেন না । পরে চিনিবাস লণ্ঠন লইয়া আসিলে, চিনিতে পারিলেন । তাঁহারো অপর কেহ নহেন, ইন্দুবাবু ও শান্তবাবু ; এত রাত্রিতে ইহারো আবার কি মনে করিয়া আসিয়াছে, আর কেনইবা আসিয়াছে, মনে করিয়া বিরক্ত হইলেন । কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের সম্মান রাখিলেন, নিজ স্থানে অভ্যাগত ব্যক্তি শত্রু হউন, আর মিত্র হউন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনই ভদ্রতা ; এই ভদ্রতার অনুরোধে অসিন্ধবাবু তাঁহাদিগের আগমনে বিরক্ত হইলেও তিনি তাঁহাদিগের প্রতি অভিজ্ঞোচিত অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলেন না । তিনি যথোচিত শিষ্টাচার ব্যবহারে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া তাঁহার বাটী সংলগ্ন বেদিকোপরি বসাইলেন এবং চিনিবাসকে তাম্রকূট আনিতে কহিয়া, আপনি তাঁহাদিগের পাশ্বে উপবেশন করিলেন ।

তৎপরে সামান্য সামান্য কথা বার্তার পৰ পরস্পর নিকট আছেন, এমন সময় চিনিবাস ভাড়াদিগকে তাকুট দিয়া প্রস্থান করিল।

ইন্দুবাবু তাকুট সেবন করিবার পূর্বে অসিদ্ধবাবুর নিকট অতি বিনয় নম্র কাকুতি মিনতি বচনে সেট বিয়ের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, “দেখ তোমাতে আমাতে আজিকার আদাপ নহে—বহুদিনের, তুমি আমার বাল্য সখ্যদ। নেণার বোঁকে কি হইতে কি হইয়া গিয়াছে, সে বিষয় মনো-মধ্যে আর স্থান না দিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমাদেব পূর্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তুমি সেই রাজ্যের অপমান বিস্মৃত হও, আমাকে ক্ষমা কর।” ইত্যাদি বহু বিনতি বচনে ইন্দুবাবু নিজ পূর্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা চাছিলেন।

শান্তবাবু ইন্দুবাবুর কথার উপর দুই একটি কথা কহিয়া, উকিলের স্থান পুৰাতন নথি বাহির করিয়া অসিদ্ধবাবুকে বুঝাইয়া বলিলেন, ও রকম হয়ে থাকে।

অসিদ্ধবাবু এতক্ষণ একটিও কথা কহেন নাই, তিনি স্থির গম্ভীর হইয়া, ইন্দুবাবুর অপবাদকৃত ক্ষমা প্রার্থনা শুনিতেছিলেন। তৎপরে ইন্দুবাবু শান্তবাবুর বিমল বাছন্যে তিনি ক্ষম্য লজ্জিত হইয়া কহিলেন, “দেখ ইন্দু তোমার একটি বিনীত কথায় আমার হৃদয়ের সমস্ত বিদ্বেষ মলিনতা অন্তর্হিত হইয়াছে, আর কেন ভাউ অধিক কহিয়া আমাকে লজ্জিত করিতেছে।”

ইন্দুবাবু অসিদ্ধবাবুর ক্ষম্য অমায়িকতায় পবন পরিতুষ্ট হইলেন এবং এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু না কহিয়া ইন্দুবাবু বলিলেন, “আর একটি সংবাদে বোধ হয় তুমি নিশ্চয় আনন্দিত হইবে।”

অসিদ্ধবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সংবাদ?”

ইন্দুবাবু কহিলেন, “সরমের দিদিমা মরিয়াছে।”

অসিদ্ধবাবু ব্যগ্রতাপ্তিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ্যা—বল কি! সরমের দিদিমা মরিয়াছে—কবে—কিসে কি কহিয়া?”—

ইন্দুবাবু বলিলেন, “সেইদিন, তুমি চণিয়া আসিলে, তার কিছুক্ষণ পরে সোপান হইতে পড়িয়া গিয়া মারা গিয়াছে।”

ইহা শুনিয়া মুহূর্ত্তে অসিদ্ধবাবুর মস্তকে কি এক প্রকার চিন্তাপ্রোত বহিল—তিনি ব্যস্ততা সহকারে ইন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সরম ভাল আছে ত?”

ইন্দুবাবু কহিলেন, “হ্যাঁ সবম ভাল আছে, সে তোমাকে একবার যাইতে বলিয়াছে ।”—

এইটি ইন্দুবাবুর সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ।

অসিদ্ধবাবু সরম ভাল আছে শুনিয়া, কতক আশ্বস্ত হইলেন এবং সরম তাঁহাকে যাইতে বলিয়াছে শুনিয়া যেন, তিনি বিদ্যাৎ তাড়নে শিহরিয়া উঠিলেন । তৎপরে তিনি প্রকাণ্ডে বলিলেন, “আচ্ছা চেষ্টা করিব ।”

ইহার অর্থ ;—এখন আমাব তথায় যাওয়া বিবেচনা সাপেক্ষ । কিন্তু আমরা জানি অসিদ্ধবাবু বিবেচনা সাপেক্ষ রাখিতে পারেন নাই ।

সে যাহা হউক, ইন্দুবাবু ও শাস্ত্রবাবু তথায় আর অধিকক্ষণ থাকিতে না পারিয়া বিদায় লইলেন । অসিদ্ধবাবু সরল মনে তাঁহাদিগকে যথোচিত “আদর আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন । বিদায় দিবার কালীন ভিজ্জাসা করিলেন, “এখন কোথায় ? বাড়িতে না ওখানে ?”

ইন্দুবাবু বলিলেন,—“না ।—এখন একবার মণিলাল বাবুর নিকট যাইব, বিশেষ প্রয়োজন আছে ।”

তৎপরে উভয়ে নিজ গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন । আর অসিদ্ধবাবু একটি নব চিন্তা অর্জন করিয়া নিজ কক্ষাভিমুখে গমন করিলেন । এই চিন্তাই অসিদ্ধবাবুর কাল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।



“তুমি বড়ই অস্থির চিত্ত” ।

যুগ্ম রজনী । এই রজনীতে মণিলাল বাবু একটি রমনীয় দ্বিতল কক্ষে পালঙ্কোপরি শ্রামাদি রূপসী রমণী সোহাগীর পার্শ্বে মদিরাপূর্ণ পাত্র হস্তে উপবিষ্ট । উভয়ের উভয় নয়নযুগল উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট । কিন্তু তাহাদিগের পরস্পরের কটাক্ষ যুগলে বিভিন্নতা ভাব নিহিত । একজনের হাস্যময়ী বিলোল কটাক্ষ কোণে বিরক্তি আভা । অপরের ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ কপট লোহিত লোচনে জেদাজেদি অমুনোন্মেষের ধারা ।

মণিলাল বাবু কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া বলিলেন, “এইটুকু চুমুকে চুমুকে মেরে দাও, তা হলেই বাস—খালাস ।”

এই বলিয়া বাম হস্তে সোহাগীর পৃষ্ঠদেশ বেঁধেন করিয়া দক্ষিণ হস্তে মদিরা-পূর্ণ পাত্র লইয়া, তাহার মুখের নিকট ধরিলেন । সোহাগী ঈষৎ হাঁসিয়া মণিলাল বাবুর প্রতি বিলোম কটাক্ষ হানিয়া ঈষৎ বিরজি সহকারে মদিরা-পূর্ণ পাত্র সহিত মণিলাল বাবুর হস্ত তফাতে সরাইয়া বলিল, “পোড়ার মুখ, তুমি আমায় জ্বালাতন করিতেছ কেন ?”

মণিলাল বাবু বলিলেন, “তুমি এইটুকু চোকবুজে এক নিশ্বাসে মেরে দাও, তা’হলে কি অন্ধকার ঘরের চাঁদ তোমায় জ্বালাতন করি ?”

তৎপরে আবার সেই অমৃত পাত্র তাহার মুখের নিকট পূর্ববৎ ধরিয়া বলিলেন, “নাও আর কোন আপত্তি ক’রোনা ।”

সোহাগী একটু হাঁসিল, আর কোন দ্বিধাক্তি করিল না । নিজ ইচ্ছামত মদিরা পান করিবে, এই হিসাবে তাহার হস্ত হইতে অমৃতপূর্ণ পাত্র নিজ হস্তে লইল ।

ইহাতে মণিলাল বাবু বড় খুসি, আমোদভরে বলিয়া উঠিলেন, “সাবাস—এইত চাই ।”

তৎপরে ক্রমাগত বাহির করিবার নিমিত্ত নিজ ‘পকেটে’ হস্তার্পণ করিলেন; ইহার মানে সোহাগী এক নিঃশ্বাসে সেই পাত্র খালি করিবে, অমনি আদর করিয়া মুখ মুচাইয়া দিয়া কোমল স্পর্শস্বথ অনুভব করিবেন, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না । সোহাগী তাহার সে সাধে বাদ সাধিয়া সুরাপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিল । সুরাপাত্র সশব্দে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পাত্রস্থিত সখের তরল বস্তু ইতঃতত বিক্ষিপ্ত হইয়া কক্ষময় আপন পরিচয় বিতরণে কুপণতা করিল না ।

সোহাগীর ঈদৃশ ব্যবহারে মণিলাল বাবুর বিরজিকর হইলেও তাহার এই ব্যহার তাহার ভাগ্যে প্রায় নিত্য ঘটিত বলিয়া উহা তাহার এক রকম সহ্য হইয়া গিয়াছিল, তাই সোহাগীর এই অপরাধের দণ্ডস্বরূপ তাহাকে একটি ছোট খাট রকম তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুমি বড় বদ মেয়ে মানুষ ।”

সোহাগী অমনি মুখ বাঁকাইয়া ইহার সাক্ষ জবাব দিল, “তা বেশ ।”

উভয়ের এইরূপ অনৈক্য আরও কিছুক্ষণ চলিয়া শেষে আপোশে এই রংয়ের বিসম্বাদ মিটিয়া গেল । পরে জেদবাজ নাছোড়বান্দা মণিলাল বাবুরই জয় হইল—অর্থাৎ সোহাগী মদিরাপূর্ণ পাত্র, নিশ্বাসে নিশ্বাসে নিঃশেষ করিতে

লাগিল এবং মণিলাল বাবু সময় বুঝিয়া পাত্রে পর পাত্র চালাইয়া শেষে পানাবশিষ্ট পাত্রস্থ মদিরা মহাপ্রসাদ অপেক্ষা দুর্লভ বস্তু মানিয়া সযত্নে উদরে ধারণ করিয়া ভাল রকম রং জমাইয়া লইলেন ।

তৎপরে যখন মোহাগী নেশায় অবশ্য বিভোরা, তখন মণিলাল বাবু তাহার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন, “আমার দশা কি করিলে হীরাকশ ?”

“সর সর,—এ রকম করিয়া আমায় জালাও কেন ?—আঃ ! ছাড় না ! মোহাগী বিরক্তি বিজড়িত স্বরে এই কথাগুলি বলিয়া তাঁহার কবল হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিল ।

যেমন চেষ্টা করিল ; অমনি মণিলাল বাবু তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল—বলিল, “আমার প্রতি এ-কদিন হইতে বাম হইলে কেন ? তোমার নিকট একটা বিষয় দোষি বলিয়া কি ? তোমার সাহায্যে আমার প্রাণের দারুণ পিপাসা মিটাইব বলিয়া কি ? তাই তুমি আমার প্রতি বাম ?”

“না না আমি তোমার প্রতি বাম হইব কেন । তা যদি হইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত আমার দিন কিনিয়া ফেলিতাম । সে জন্ত তোমায় এ কথা বলি নাই ! আমি বলিতেছি কি যে, যে কদিন আমরা দুজন এখানে আছি, সে কদিন সরে সামলে থাকা ভাল । কেন না ; আমার অবর্তমানে তুমি কষ্ট পাইবে না—তোমার অবর্তমানে আমি কষ্ট পাইব—বুঝিলে ? আর যে কথা তুমি বলিতেছ—তোমার প্রাণের দারুণ পিপাসা,—তাহা মিটাইব, তুমি ব্যস্ত হইও না । এখন আমায় ছেড়ে দাও, আমায় বিরক্ত করিও না ; আমার মাথা ঘুরিতেছে, এখন আমি একটু ঘুগাইব, আমায় ছাড়ো ।” মোহাগী এই বলিয়া তাঁহার বাহুপাশ ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ।

মণিলাল বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “আর একটা—মোহাগী আর একটা কথা, তুমি এ বিষয়ে কবে রত হইবে” ।

দেখ মণি তুমি বড়ই অস্থির চিত্ত, কেন বৃথা ব্যস্ততার মন নাচাইতেছ ? আমি বলিতেছি স্থির হও, যাহা ভাল হয় করিব, তুমি পরে জানিতে পারিবে ; এখন আমি শয়ন করি ! আমার মস্তক ঘুরিতেছে, তুমি সর ।”

মোহাগী তেজস্বীতার সহিত ঈদৃশ ভাবের কথা কহিয়া শয়ন করিল ।

মণিলাল বাবু তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন মনে আর একটা কি বিষয় চিন্তা করিবে—এমত সময় লক্ষ্মী নামি একটি পরি-

চারিকা মণিলাল বাবুর সম্মুখীন হইয়া বলিল, “বাবু দ্বারবানজি আমাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, দুইটী বাজালি বাবু আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাছেন ।”

মণিলাল বাবু বলিলেন, “আচ্ছা বাবুদিগকে বৈঠকখানায় বসাইয়া তামাক দিতে বলগে ।”

পরিচারিকা এই অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিল ।

মণিলাল বাবু অনুমানে ধারণা করিলেন ; ইহারা আর কেহ নয়, শাস্ত্র-বাবু ও ইন্দুবাবু । আচ্ছা ! এত রাত্রিতে ইহারা কি মনে করিয়া আসি-
য়াছে ?—দেখা যাক ।

এই মনে করিয়া পালঙ্ক হইতে উঠিলেন ।—একবার শায়িতা মোহাঙ্গীর নিজাবেশে বন্ধিম ঠাম দেহ-লতার ভঙ্গিয়া মাধুর্য্য দেখিলেন । মণিলাল বাবুর চিত্তবেগ এখন যেরূপ হউক না কেন ? তিনি ইহা দেখিয়া মোহিত হইলেন । সহসা তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হইল, আমার ঘরে এমন চিত্ত বিমুক্ত-কারী মোহিনী ছবি থাকিতে, আমার আসক্তি অন্য একটি ছবির উপর ? দিক আমাকে—দিক আমার—কদাচারী আশক্তিতে !—না—না, পিপাসা—
পিপাসা, প্রাণের দারুণ পিপাসার শাস্তি না হইলে, আমার প্রাণের ঐ কদাচারি আশক্তির অবসান হইবে না । মণিলাল বাবু উন্মাদ চিন্তায় আপনার এইরূপ আত্মপ্রাণি করিয়াও মনকে অদ্ভুত প্রবোধে প্রবোধিত করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তির দর্শন লাগমায় বৈঠকখানায় গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহাই ঠিক ।

তৎপরে তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া, অভ্যাগত উভয় মূর্তির উদ্দেশে বলি-
লেন, “কি খবর লইয়া মহাশয়দিগের এই রজনীযোগে আগমন ; অনুগ্রহ করিয়া বলুন ।” যতটা পারিলেন ততটা চিত্তের প্রক্লভতা সাধন করিয়া মুখ-
পাতে হাসি রাখিয়া এই কথাগুলি বলিলেন ।

শাস্ত্রবাবু ইন্দুবাবুর হইয়া বলিলেন, “খবর আর কিছু নয়, তবে অকুণ্ডলের কাণ্ডারির নিকট যে খবর লইয়া আসা,—তাহা মহাশয়ের নিকট অবিসদিত নাই, তাহা আর মহাশয়ের সন্নিধানে নূতন করিয়া কি বলিব ?”

মণিলাল বাবু একটু হাসিলেন,—হাসিয়া ইন্দুবাবুর দিকে নজর ফিরাইয়া বলিলেন, “আবার কার ডিলি ?”—

শান্তবাবু, মণিলাল বাবুর ঐ কথাটি যেন, তাঁহার নিজের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে, মনিয়া লইয়া উত্তর করিলেন, “আমাদের কাহারও নয়, তবে (হিন্দুবাবুকে দেখাইয়া) ইনিই উনি—সেই সরমের ডিঙ্গি ডুবু ডুবু—তাই তাহাকে উদ্ধার করিতে আপনার নিকট আগমন।”

মণিলাল বাবু বলিলেন, “কেন তাহার ত ছুইটি কর্ণধার এখন মজুত, আর তৃতীয় কর্ণধারের আবশ্যক কি?”

শান্তবাবু হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া বলিলেন, “একটি কর্ণধার সম্প্রতি শিঙ্গা ফুঁকিয়াছে, আর একটি কর্ণধার (হিন্দুবাবুকে দেখাইয়া) যিনি বর্তমান আছেন, তিনি অপারক,—তাহাতেই কাজ চলিতে পারে, যদি আপনার সুনজর পড়ে।”

মণিলাল বাবু এই কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিলে? কর্ণধার শিঙ্গা ফুঁকিয়াছে। কি—ভাল বুঝিলাম না।”

শান্তবাবু তখন সরমের দিদিমার মৃত্যুঘটিকা তাবৎ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিয়া মণিলালকে শিঙ্গাফুঁকা কথা বুঝাইয়া দিলেন।

ইহা শুনিয়া মণিলাল বাবু মনে মনে বলিলেন, হইয়াছে ভাল,—মন্দ নয়।

তৎপরে হিন্দুবাবু বলিলেন, “এখন ইচ্ছা করিতেছি, এই সময়ে সরমের হস্তে কিছু নগদ টাকা দিয়া তাহার ভরসা অক্ষুণ্ণ রাখি; ইহাতে আমার কোন মূল্যবান দ্রব্য বন্ধক রাখিতে বা হ্যাণ্ডনোট কাটিতে প্রস্তুত।”

মণিলাল বাবু নিবিষ্ট মনে ইহা শুনিগেন, মনে মনে বলিলেন, বেশত। পরে প্রকাশ্যে বলিলেন, “আচ্ছা তার জন্ত আর চিন্তা কি।”

এই বলিয়া শান্তবাবুর দিকে চাহিলেন।

শান্তবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, “কবে?”

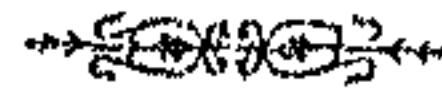
মণিলাল বাবু বলিলেন, আমি একদিন পারিবারিক মানসিক অসুস্থতানিবন্ধন কিছু কাতর আছি; একটু সুস্থ হইলেই দিন কতক পরে,—বুঝিলে?

শান্তবাবু ইহার উপর আর কিছু না বলিয়া, ভাড়াভাড়ি বলিয়া উঠিলেন।

“ওঃ। তাই আপনাকে কিছু মলিন দেখিতেছি, তাহা হইলে আজ আপনাকে মিথ্যা কষ্ট দিয়া ভাল করি নাই, মাপ করিবেন।”

যখন প্রকৃত কথা জানিয়া লওয়া হইয়াছে, তখন আর মিথ্যা বিলম্ব প্রয়োজন কি। সুতরাং উভয়ে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে নিষ্কান্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।



“তুমি কে গা ?”

সেই দিগ্ৰহে । এমনতর সময়ে যতিবাগানেব একটি অপ্রশস্ত গলিব ভিতর একটি দীলোক প্রবেশ করিল । হস্তে এক ফুট আনাজ একটি কৃষ্ণ রঞ্জিত টিনের ‘বাক্স’ । জীলোকটির বয়সে যুবতী, বর্ণে শুভাঙ্গীন্দরী, অঙ্গসৌষ্ঠবে মধুর লালিত্য ভঙ্গি, বদনকমণে চিত্রবিমোহনকারী ছাপ্রাপ্য নীলোৎপল শোভা, তাম্বল রাগবঞ্জিত মধুর লোহিত অধর প্রান্তে গলার কাসি হাঁসি, নিষ্কবিত বিলোণ চঞ্চল কটাক্ষে মদনেব আকর্ষণ পুৰিত সন্মোহন ফুলবানে ফুলশর সং-যোজিত, মণ্ডকে স্কন্ধে দমরকুঞ্জিত কেশপাশ বহুনাথ্য পারিপাট্য কবচী অব-জ্ঞানে দৈবদায়িত, বক্ষ পীনোরত গিঁচুড়া লজ্জিত, স্নানর ক্ষীণ কটিতট স্নগঠিত নিপুণ নিভস্বোপরি স্নশোভিত । পরিধানে একখানি লোহিত পাড়বিশিষ্ট মূল্য-বান দেশী বস্ত্র, গতি বিপুল নিভস্বভাবে মধুর যেন—একখানি চিপ্‌চিপে পান্সি তবঙ্গ ভঙ্গে হেলিয়া ছলিয়া নাচিয়া আসিয়া চাঁদয়াছে ।

জীলোকটি গলির ঠিক প্রান্তে সীমাম বাক্সদিকে অবস্থিত একটি বিতল বাটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল । একবার উত্থিতঃ দৃষ্টি সন্ধানন করিয়া বাটীব সদর প্রাতি অগমর হইয়া, দবজা সংবদ্ধ লোহ বসর মশকে ক্রমাবয়ে নীড়িতে লাগিল ।

পরক্ষণেই মশকে ছাব উদবাতিত করিয়া একটি গৌব বরণা প্রফুল্ল হাস্যাননা স্নন্দরী যুবতী নবাগতার সম্মুখীন হইল । তাহার দ্বারস্থিতা একটি অপবিচিত্তা ভঙ্গ মহিলাকে দেখিয়া আনন্দ বিষয় নিষ্কবিত মেত্রে বীণাবাদিনী বীণায় বন্ধাব মাঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেগা ?”

—অবীনাভ্যাগতা মধুর হাসিনী তাহার প্রাতি ক্ষণেক মাত্ৰ একাগ্রতা সহকাৰে চাহিল, পবে দৈবদহাশ্রে বলিল, “আমি পশমী ফুলওয়ারি, তোমাদেব নিকট কতকগুলি পশমেব জব্য সার্গগ্র আনিয়াছি ।”

“পশমের জিনিস ! বিক্রী ! আচ্ছা, ভিতরে এস দেখিব ।” সেই গৌর-বরণা যুবতী ঈদৃশ ব্যস্তভাবে ইহা বলিল ।

নবাগতা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল । উক্ত যুবতী অগনি দ্বারার্গল বন্ধ করিয়া, তাহাকে উপবে লইয়া গেল, “তুমি ভাই ঘবে এসে বস” এই বলিয়া তাহাকে নিজ কক্ষে বসাইল এবং আপনি তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল ; তাব পর জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাব নাম কি ভাই ?”

“আমার নাম মোহিনী ।”

“মোহিনী ? বেশ নামটি ।”

মোহিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাব নামটি কি ভাই ?

“আমাব নাম । আমার নাম ভাই নবীনাবালা দাসি ।”

বাস্তবিক এ বালা নবীনাবালা , কিন্তু মোহিনীর ঢক্ষে এষ্ট যুবতী নবীনাবালা বলিয়া গ্রহণীয়া হইল না । পবস্ত সে মনে মনে উপহাসেব হাসি হাসিয়া বলিল, “তুমি নবীনাবালাই বটে” । ইহার পর প্রকাশে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমাব বুঝি এইটি খণ্ডর বাড়ী ?”

নবীনাবালা বলিল, “না বাপের বাড়ী ।”

মোহিনী এই কথা শুনিতে শুনিতে, সেই বাস্তু খুদিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আর সব কোথায় ? সব গুলে আছেন বুঝি ?”

নবীনাবালা বলিল, “না ঐ পার্শ্বের বাটিতে মা বেড়াইতে গিয়াছেন, আমাদের উনি (স্বামী) অফিস গিয়াছেন, বাবা দোকানে গিয়াছেন, ভায়েরা ইস্কুল গিয়াছে ।”

এক দমে কে কোথায় গিয়াছেন সব বলিয়া ফেলিল, যেন কতদিনের আলাপিকে পাইয়া মনের কথা খুদিয়া বলিল ।

মোহিনী কি ভাবিয়া একটু মুচ্কিয়া হাঁসিল, মনে মনে বলিল, বেশ বেশ কার্য্য উদ্ধারের জন্য অধিক ক্রেশ পাইতে হইবে না । তৎপরে উক্ত বাস্তু হইতে একটি কারুকার্য্য বিনির্মিত উলের জুতার পাঠ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল, “তাহা হইলে ভাই, তুমি কি করিয়া লইতে পার ?”

“কেন, আমার পছন্দ হইলেই লইব । আব মা বোধ হয় এগুলি আমিবেন ।”

নবীনাবালা মোহিনীর হস্ত হইতে সেই জুতা যোড়াটি লইয়া দ্বিগুণ হাসিতে হাসিতে এই কথাগুলি বলিল । নবীনাবালার ইচ্ছা এই জুতা যোড়াটি পছন্দ

মত মূল্যে স্থবিধা হইলে লইবে, এবং উহা তাহার আমীকে উপহার দলে দিয়া তাহার কোন আকাঙ্ক্ষিত প্রাপ্য মথের বস্ত্রটির উপর দাবি দিয়া, তাহা আদায় করিতে পারিবে । নবীনাবালা ঐ জুতা জোড়াটি উদ্ভবরূপ যুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া পছন্দ করিল, পরে উহার মূল্য কত পড়িবে জিজ্ঞাসা করিল ।

মোহিনী আনন্ডে একটা মূল্য নিরূপণ করিয়া বলিল, “মূল্য অতি সুলভ, এই আড়াই টাকা ।”

নবীনাবালা ঈষৎ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, “আ—ড়া—ই টাকা ? না ভাই অত মূল্যে আমি ক্রয় করিতে পারিব না, কম সম হয়ত দাও ।”

মোহিনী বলিল, “তুমি কত হইলে পার ?”

নবীনাবালা বলিল, “আমি পাঁচ সিকা হইলে পারি ।”

মোহিনী হাসিয়া বলিল, “দেখ ভাই, ইহা আমাদের ক্রয় করা জিনিস নয়, আমাদের হাতের তৈয়ারি, ইহাতে আমাদের লাভ লোকসান নাই, তবে পারিশ্রমিক বৎকিঞ্চিৎ থাকিলেই হইল ; তা তুমি উহাতে আরও কিছু ধরিয়া দিও, তাহা হইলে আমার পক্ষে যথেষ্ট । আর তোমার সহিত আমার এই প্রথম আলাপ, তোমাকে ঈদৃশ সুলভ মূল্যে ইহা বিক্রয় করা আমার পক্ষে স্থবিধার সম্ভব । কারণ তুমি কথা প্রসঙ্গে আমার এই জিনিষের কথা তোমার সখি সাথিদিগের নিকট পাড়িলে আমার প্রসারের সম্ভব ।”

মোহিনী এইরূপ দোকানদারী চাতুরী বিস্তার করিয়া তাহার পানে চাহিল ।

নবীনাবালা ইহার ঈদৃশ বাক্যে যার পর নাই আপ্যায়িত হইল, মনে মনে উহার ভদ্রতার যথেষ্ট প্রসংসা করিল । পরে একান্তে তাহার কথামত কিঞ্চিৎ-দধিক মূল্য দানে স্বীকৃত হইয়া তাহা গ্রহণ করিল ও বলিল, “দেখ ভাই, কাল তুমি এইরূপ সময়ে আসিলে, আমি ইহার মূল্য দিব ।”

মোহিনী হাসিয়া বলিল, “তার জন্ত আর কি ! কাল না হইলে দুইদিন পরেই হইল । ইহার জন্ত বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না, এখন তোমার সহিত আগাপে আমার পরম লাভ ।” ইত্যাদি আর কত কি বলিল ।

নবীনাবালা মনে মনে খুশির হাসি হাসিল, আহা কি চমৎকার অমায়িক, ইহার সহিত দুটো আলাপেও সুখ । পরে একান্তে ফরমান করিয়া বলিল, “দেখ ভাই, তোমার নিকট যদি ছোট জুতো তৈয়ারি থাকে লইয়া আসিও, আমি আমার ভায়েদের জন্ত লইব ।”

মোহিনী বলিল, “আচ্ছা নইয়া আসিব।”

মোহিনী এই কথার পর অল্প কথা পাড়িয়া বাক্যের শ্রোত অল্প দিকে ফিরাইল,—জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁ ভাই এক কথা, তোমার শ্বশুর বাড়ী নিকটে না দূর অঞ্চলে? জানিলে সময়াস্তরে সেখানেও গিয়া, তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আরও দশ জনের নিকট পরিচিত হইতে পারিলে, আমার অনেক উপকারের সম্ভাবনা।”

নবীনবালা বলিল, আমার শ্বশুরবাড়ী নাই। এখন আমার বাপের বাড়িই শ্বশুর বাড়ি। আমার শ্বশুর বাড়ির এক উনি এবং একটি ননদিনী ভিন্ন আর কেহ নাই।”

নবীনবালা এই কথা বলিয়া হুঃখিত হইয়া নীরব হইল।

মোহিনী যেন ইহার হুঃখে হুঃখিত হইয়া ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তিনি এখন কোথায় আছেন?”

নবীনবালা বলিল, “কি—আমার ননদিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি শ্বশুরবাড়ি—বারাসতে।”

উভয়ে পরস্পর আর কত কথা কহিয়া, শেষে সেদিনকার মত মোহিনী নবীনবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

এইরূপ মোহিনী আশাতীত সুলভ মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কারুকার্য্য বিনির্মিত পশমী দ্রব্য সকল বিক্রয় ও মধুর মিষ্ট বাক্চাতুর্য্যে তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিয়া এবং আবশ্যক থাকুক আর নাই থাকুক আলাপ বশতঃ দেখা সাক্ষাৎ করিয়া উহাদিগের সহিত দিব্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া গিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।



“বেশ যা হোক ভাই!”

একদিন মধ্যাহ্নকালে নবীনবালা ও তাহার জননী উভয়ে নিম্নতলে বসিয়া নানাবিধ গল্প ফাঁদিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেছে। অন্য ইহাদিগের

কোন কর্ম অমুখোবে আচাবেব প্রকৃত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়া ভোজনে বিনয় ঘটয়াছিল। আন একপা বিলম্ব গৃহস্থের কুলবালাগণের ভাগ্যে প্রায় ঘটয়া থাকে, তাহাব কাবণ কর্তাবর্গ ব্যক্তিদিগকে ও বালকগণকে আহারাদি কনাইয়া সকলকে নিজ নিজ কক্ষস্থানে গমনের উদ্যোগ করিয়া দিয়া এবং স্বহস্তে তাত্‌কালিক ক্ষুদ্র বৃহৎ গৃহকর্মসমূহ সমাধা করিতে হয়, তাহা না করিলে উপায় নাই। সুতরাং গৃহস্থের কুলবালাগণের ভোজনে—একপা বিলম্ব স্বাভাবিক।

যাহা হউক, মা ও মেয়ে ঐক্যে আহার সমাপন করিল, এবং অন্ত্যান্ত দিবসের ছায় আদ্যও বিশ্রামেব পর একটু বেলা পড়িলে, রক্ষনশালা পরিষ্কার ও অন্ত্যান্ত অবশিষ্ট গৃহকর্ম সকল সম্পন্ন করিব, এইরূপ আশায় উক্ত কর্ম সকল ফেলিয়া রাখিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া, উভয়ে দ্বিতলোপরি গমন করিল।

আহারান্তে মুখশুদ্ধি কবা আশাদেব দেশেব চিব প্রচলিত প্রথানুসারে নবীনা-জননী কত্‌তা সজ্জিত নিজ কক্ষে মুখশুদ্ধি-উপকরণাধাব সমীপে তাম্বুল সজ্জিত করণোদ্দেশে বসিল। ছুই একটি গৃহ-কথা কহিতে কহিতে মা ও মেয়ে তাম্বুল সজ্জিত করিল, সূচিকণ দস্তপুংক্তিদ্বয়ে তাম্বুলাপ্রভাগ কর্তন করিয়া, মূর্ত্তে মধুব অপরপ্রাপ্ত লোহিত বাগে বজ্রিত করিল। ইতিকর্তব্য সমাধানস্তর কথা প্রসঙ্গ মৈত্রে মোহিনীর কথা আগিয়া পড়িল।

নবীনাবালা কহিল, “দেখ মা! মোহিনী আমাকে শিল্প রচনা শিখাইব বলিয়া তদোপযোগী জিনিস পাই সকল ক্রয় করাইল। কিন্তু এখন তাহার দেখা সাক্ষাৎ নাই।”

প্রবীনা নবীনা জননী বলিল, “হাঁ! সে মেয়েটিকে কদিন হইল দেখি নাই, বোধ হয় তাহার কোন অসুখ বিস্মৃত হইয়া থাকিবে, তাই আসিতে পারে নাই। আহা! সে মেয়েটি বেশ, তাহাকে দেখিতেও যেমন সুন্দর তাহার কথা বাস্তবও তেমন মধুর। আচ্ছা নবীন! তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, সম্বন্ধ—ভদ্র ঘরের মেয়ে; তবে ছয়ারে ছয়াবে সে অমন করিয়া বেড়ায় কেন?”

নবীনা বলিল, “হাঁ মা! আগারও মনে ঐ কথা উদয় হয়; আমি তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়া কথাপ্রসঙ্গে ভুলিয়া যাই, আর জিজ্ঞাসা কবা হয় না। এইবার আসিলে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইব।”

ইহাদিগের এইরূপ কথাবাত্তায় সময়ান্ধিত হইতেছে, এমনত সময় সদর দরজা সংবিদ্ধ লৌহ বলয় সঞ্চালিত শব্দ তাহাদিগের কর্ণ পটাহে আসিয়া

বাজিল । এই শব্দ শুনিয়া উভয়ে পদস্পর্শ মুখাবলোকন করিয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া উৎকর্ণ রহিল—আবার সেই শব্দ ।

নবীনবালা ঈষৎ প্রিবাদেশ বক্র করিয়া বলিল, “মা ! বোধ হয় সেই, দেখিয়া আসি ।”

এই বলিয়া সে ভবিত পদ বিক্ষেপে নিম্নে অবতরণ করিয়া সমুদ্র দরজার পার্শ্বে আসিয়া দাড়াইল । দরজার মধ্যগত একটি ছিদ্ৰপথ সাধ্যায় কতক দূরত্বে, কতক অনুরাগে বুঝিল, একটি জ্বীলোক । অনুরাগে সিদ্ধান্ত করিল আর কেহ নয়, সেই হইবে ।

অগ্নি মানন্দে দরজার অর্গল মোচন করিয়া দেখিল,—সেই । যাহা মনে করিয়াছিল,—তাহাই । মুহূর্তে উভয়ের নজর উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল, অগ্নি উভয়ের মধুর অধর কোলে বিজলি হাঁসিল, সঙ্গে সঙ্গে নবীনা বীণায় তান মাণিয়া স্বাক্ষর দিল, “বেশ যা’হক ভাই ! তুমি আমায় আচ্ছা নাকালে ফেলিয়াছিলে; আমি তোমার কথা অনুরাগী পশম ও অস্ত্রাভ্র জিনিষ পত্র কিনিয়া তোমার আশা-পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছি, কিন্তু ভাই তোমার দেখা নাই ?”

মোহিনী ইহার উত্তরে বলিল, “আমার কি ভাই অসাধ যে, তোমাদিগকে না দেখিয়া জ্বালা থাকি ? পোড়া কপাল সে সাথে বাদ সাধিয়াছে; কি করিব ভাই ! কর্মের ফেরে পড়িয়া আসিতে পারি নাই ।”

ইহারা দ্বারদেশে এইরূপ কথোপকথনে নিযুক্ত । এমন সময়ে গলিব প্রান্তভাগে আগমনশীল একটি যুবক সহসা নবীনবালার নয়ন-পথে আসিয়া জুটিল । অগ্নি হস্তমুখী নবীনার অনিন্দিত সুন্দর মুখমণ্ডল সমস্ত সৌন্দর্য্যে বক্রিমাজা ধারণ করিল । নবীনা নিজ স্বভাবজাত মাদুর্য্যময় সরস-বিনয়বনত ঈষৎ চাপল্য ভাব সহকারে মোহিনীর অঞ্চল ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া বলিল, “ও ভাই ! আমাদের উনি আসিতেছেন ।”

ইহা শুনিয়া মোহিনী নয়ন ফিরাইয়া তাকাইল,—দেখিল, একটি পুরুষ । মুহূর্তেই অস্ত্র হস্তমুখী মোহিনীর হস্তমুখ শোণিতশূন্য হইল, তাহার বিশাল কটাক্ষে আতঙ্ক প্রমত্তবিনী বিভীষিকাপূর্ণ স্থব দৃষ্টিতে কি এক প্রকার নিরাশময় ভাব প্রকটিত হইল, তাহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাণিয়া উঠিল । কিন্তু পরক্ষণে আবার তাহার মানস পটে কি এক তাড়িত চিন্তা মুহূর্তে উঠিয়া মুহূর্ত মধ্যে উপস্থিত কর্তব্যতা নির্দ্ভাবণ করিয়া তাহার হৃদয় হইতে উক্ত বিরুদ্ধ ভাব অপসারিত করিল । কিন্তু কি জানি কেন—পুনরায় ঐ বিকৃত হৃদয়াঙ্গ

ফিরিয়া আসিয়া অতি প্রাচুর্য্যভাবে তাহার হৃদয় কমরের অতি মিষ্টত প্রদেশে গিয়া পুকাইল। বলা বাহুল্য নবীনাবালা মোহিনীর এই ভাবান্তর উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

সে যাহা হউক, মোহিনী তৎপরে আশ্বে ব্যাশ্বে নিজ অবজ্ঞান অপেক্ষাকৃত টানিয়া নবীনাবালার সঙ্কেত অনুযায়ী সত্বর তাহার অনুসরণ করিয়া উপরতলে উঠিল।

নবীনা-জননী তাহাদিগকে ঈদৃশ শশব্যস্ত দেখিয়া, তিনি কোতূহল উদ্বেগ বশতঃ মোহিনীর আগমনে আনন্দ প্রকাশে সময় না পাইয়া, পরন্তু ব্যস্তভাবে উভয়কে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে? তোমরা অত তাড়াতাড়ি আসিলে কেন?”

নবীনাবালা সরম-বিনয়াবনত নীরব হাশ্ব সহকারে বলিল, “উনি আমিতেছেন।”

নবীনা-জননী বলিল, “আজ আবার সকাল সকাল আসিল যে?”

নবীনাবালা বলিল, “বোধ হয় কিছু দরকার আছে।”

ইহার পর তাহার মাতা তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া মোহিনীর প্রতি চাহিল, তাহাকে সম্মুখে আদর করিয়া ডাকিল, “এস মা—ঘরে এসে এস, দাঁড়াইয়া কেন?”

মোহিনী তাহার গৃহে প্রবেশ করিল—বলিল।

নবীনাবালা “আমিতেছি” বলিয়া নিজ কক্ষে গমন করিল।

প্রিয় পাঠক মহাশয়। মোহিনী নায়ী এ জীবনোকটি কে! আপনি বোধ হয় আত্মাষে বুকিতে পারিয়াও পারিতেছেন না। ক্ষমা করিবেন, বিরক্ত হইবেন না, যৎসামান্য অপেক্ষা করুন, ক্রমে জানিতে পারিবেন, ইনি আপনার পূর্ব পঙ্গিচিত। যদি এ জীবনোকটি কে আপনার বোধগম্য হইতে, বাকি না থাকে, তাহা হইলে, অনুগ্রহ করিয়া এই অথবা লিপি বাহুল্যে যে অপরাধটুকু হইয়াছে, তাহা সরল অন্তঃকরণে ক্ষমা করিবেন।—কিন্তু!—আমার এই ক্ষীণ “রহস্য প্রদীপ” নানা অশ্লুবিধা, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহু বিলম্বে আপনার নিকটে পৌঁছিলেও—নিজগুণে হৃদয়ের ধৈর্য্য সংরক্ষণ করিয়া অবহেলায় মন হইতে বিরক্তভাব তুলিয়া ফেলিয়া আবার আমাকে যেক্রপ কৃতার্থ করেন ;—সেইরূপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।



“কি সুন্দর জিনিষ ।”

এতক্ষণে নবীনাবালাব স্বামী তাঁহার শত্রু ঠাকুরবাণীব । কক্ষদ্বার অতিক্রম করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন ।

নবীনা জননী তাহাব জামাতাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “হাঁ শান্ত ! আজ আবার সকাল সকাল আগিলে যে ? কিছু অশুখ হইয়াছে বুঝি ?”

শান্তবাবু উত্তর দিলেন, “না মা অস্থখ করে নাই। বিশেষ দরকার বশতঃ ছুটি লইয়া আসিতে হইল, আবার এখনি বাহিরে যাউতে হইবে।”

নবীমা-জননী শান্তবাবুকে আব কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া মোহিনীর
সহিত কথাবার্ত্তায় মনযোগ দিল।

শান্তবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই নগীনাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
 “ঐ উনি—যিনি মায়ের ঘরে বসিয়া আছেন, তিনি কে?”

নবীনাবালা অগ্নি তাকে সহজে বুঝাইয়া দিল, “ইনিই সেই পশমী
জবা বিজয়কারিণী।”

তৎপরে শান্তবায়ু বেশ পরিবর্তন কবিতা, কিছু জলযোগ কবিলেন।
ইত্যাদি কর্মে আনুজ ২০ মিনিট অতিবাহিত করিয়া পুনরায় বহির্গত হইলেন।

নবীনার স্বামী পাঠক মহাশয়ের পূৰ্ব পরিচিত—ইন্দু বাবু সহচর শাস্ত্র-
বাবু। ইনি বালাকাল হইতে আত্মীন; সংসারে কেবলমাত্র পিতার যত্নে
বর্জিত হন। ইনি যৌবনে পদার্পণ করিলে, ইহার পিতা কলিকাতাস্থ উক্ত
ভিষকের কলার সহিত নিজ পুত্রের গুণ পরিণয় ক্রিয়া সমাপন করিয়া নিশ্চিত
হন। ইহার অব্যবহিত পবেই তিনি ইহসংসার ত্যক্তে অর্পিত হন। ইহাতে
শাস্ত্রবাবু প্রধান সহায়হীন হন। ইহাদেব দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন থাকি-
লেও, তৎকালে স্বর্গ ও স্বর্গাঠাকুরাণীর পদামর্শ ও সংযুক্তির প্রভাবে এবং স্ত্রী
নবীনার একান্ত অনুবোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অগত্যা কলিকাতাস্থ

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পৈতৃক ভট্টাসন বিক্রয় করিয়া সেই অবধি খণ্ডরাজ্যে আসিয়া স্থখে সচ্ছন্দে বসবাস করিতেছেন ।

* * * * *
শান্তবাবু বাহিরে যাইলে পর, নবীনা পুনরায় জননী গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার জননী অনাবৃত মেজোপরি একটি ক্ষুদ্র উপদানে মস্তক রাখিয়া মোহিনীর সহিত কথা কহিতেছে ; কিন্তু তজ্জবানে তাহার জড়িত রসনা নিশ্চয় মৃদু অক্ষুট বাক্যাবলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়া মোহিনী “এঁ—উ—হঁ” ইত্যাদি মায় দিতেছে ।

মোহিনীর অবস্থিতি অবস্থা দেখিয়া, নবীনার বড় হাঁসি পাইয়াছিল ; কারণ নবীনা মনে করিয়াছিল, মোহিনী বড় ফাঁপরে পাড়িয়াছে । তাই হাঁসিতে হাঁসিতে নবীনা বলিল, “উনি একটু বিশ্রাম করুন । তুমি আমার ঘরে এস ; তিনি গিয়াছেন ।”

মোহিনী ইহাইত চাহে । সে বলিল, “হাঁ—হ্যাঁ কোন ইনি বিশ্রাম করুন । তোমার ঘরেই চল ।”

এই বলিয়া সে নবীনার পশ্চাৎবর্তিনী হইল ; তৎপরে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, উভয়ে একত্রে একটি বিস্তারিত মাছরের উপর উপবেশন করিল—যে মাছরটি ইতিপূর্বে শান্তবাবুকে বিশ্রাম করবার জন্ত পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল ।

নবীনা এখন সময় পাইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে বলিল, “তুমি ভাই আমাকে বড় জকা করিয়াছ, আমি তোমার প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছি—আর তবু তোমার দেখা নাই ।

মোহিনী যেন কিছু গিয়মান হইয়া বলিল, “আমার কি ভাই সেই অদৃষ্ট যে, আমার ইচ্ছামত তোমাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিব । আমি যতক্ষণ পাঁচ জায়গার হঠতে শুড়াইয়া বাগাটয়া তাগাদা করিয়া ছু-পয়সা আনিব, ততক্ষণ আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইবে—বুঝিলে কেন ? আমার কি অসাদ যে, তোমাদিগকে না দেখিয়া থাকি ? কি করিব নোন ; অদৃষ্ট—অদৃষ্ট ।”

নবীনা মোহিনীর এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সে ছঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার স্বামী থাকিতে তোমার সংসারের ভাবনা কি ভাই ?

মোহিনী বলিল, “আমার উনি কি ভাই তেমন, তাহা হইলে আমার ভাবনা কি ! আর আমাকেই বা অমন করিয়া এর তাঁর দ্বারা পয়সার চেষ্টায় বাইতে হইবে কেন ?

নবীনাবালা বলিল, “তিনি কি ভাই চাকরি করেন না ?”

মোহিনী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “না ভাই, তিনি কাহার চাকরি করেন না । তিনি সর্বদা বেকার এবং সকল সময়ে তাঁহার বন্ধুগণের সহিত মদিরা নেশা ভাঙ্গ খাইয়া বেড়াইয়া থাকেন । তাঁহার ইজ্জতের দিকে এখন একেবারে লক্ষ নাই । তিনি ভাই আমার এমন হইবে, তাহা ভাই আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই ।” এই কথাগুলি বলিতে বলিতে মোহিনীর চক্ষে জল আসিল । মোহিনীর ঈদৃশ ছঃখ কাহিনী শুনিয়া নবীনার কোমল প্রাণ বড়ই ব্যথিত হইল । মোহিনীর ছঃখ কাহিনী আদ্যপান্ত শুনিবার ইচ্ছা থাকিলেও, নবীনা মোহিনীকে এবিধ বিহ্বলা দেখিয়া, তাহাকে তাহার ছঃখ কাহিনী বিবৃত করিতে নিষেধ করিল । পরে মোহিনী প্রকৃতিস্থ হইলে, নবীনা অল্প কথা সাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আজ ভাই তুমি কি জিনিস আনিয়াছ ?”

মোহিনী বলিল, “আজ আর তোমার জন্য কিছু আনি নাই । যাহা আনিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত শীলদের বাড়িতে দিয়া আসিলাম । কেবল তাঁহাদিগের ফরমাসি একজোড়া রুমাল আছে, যাহা তাঁহারা ফেরত দিয়াছেন ।”

নবীনাবালা তাহা দেখিতে চাহিল ।

মোহিনী বাস্ত খুলিয়া নবীনাকে উক্ত রুমাল দেখাইল ।

নবীনা সাগ্রহে দেখিল, তাহার ভিতর অতি সুন্দর দুইটি রুমাল—যাহা শিল্পীগণের শিল্প চাতুর্য্যের তুলনায় অতুল । তাহা সেই বাক্স অভ্যন্তরে পৃথক পৃথক পাসাপাসি সজ্জিত রহিয়াছে ।

মোহিনী নবীনার আগ্রহাতিশয়া দেখিয়া তন্মধ্যস্থ একটি রুমাল বাহির করিয়া নবীনার হস্তে দিল । রুমালের উদয় সন্ধির মধ্যবর্ত্তি জমিকার উপর ঘেঁষা পুষ্পের স্তবকটি সূচিত হইয়াছে, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া মোহিনী নবীনাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই স্তবকটি কেমন বল দেখি ?”

নবীনা রুমালখানি হস্তে পাইয়া বিস্মিত এবং আশ্চর্য্যায়িত হইয়াছিল । কারণ একটি সদ্যজাত সরস মৌগন্ধযুক্ত পুষ্প স্তবক যেক্রপ নিজ মনোমগ্ন সৌরভ বায়ুভরে উড়াইয়া জনসাধারণের প্রাণে কেমন এক অনির্বচনীয় বিমল

আনন্দ সঞ্চার করিয়া দশদিক আমোদিত করে, তেমনি ঐ রুমাল মধ্যগত প্রকৃতজাত সাদৃশ্য স্ফুটিত কৃত্রিম পুষ্পস্তবকটি তাহার কৃত্রিম সৌরভ উড়াইয়া নবীনাকে মোহিত করিয়া গৃহপ্রাঙ্গন পরিপূরিত করিয়াছিল। তাই নবীনাবালা আনন্দিত বিস্মিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল—তাই ঐ কৃত্রিম পুষ্প স্তবকটির সৌরভ অন্বেষণার্থে রুমালখানি পুনঃ পুনঃ নিজ সুন্দর নাসিকাপ্রান্তে নাড়িতে-ছিল—তাই এ স্তবকটি কেমন ? মোহিনীর এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নবীনা ভুলিয়া গিয়াছিল। মোহিনী নবীনাব ঈদৃশ চিত্তভাব দেখিয়া তাহার প্রশ্নের স্মৃতিজনক উত্তরেব প্রতিফল না করিয়া অনতিবিলম্বে বাস্তবস্থিত অল্প রুমাল-খানি চকিতে বাহির করিল—কি জানি কেন এই রুমালখানি বাহির করিবার কালে মোহিনীর সর্বশরীর কাঁপিল।

এই সময় নবীনাবালা বলিল, “আহা ! কি সুন্দর জিনিস ?”

মোহিনী ইহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “স্মৃতি তিরিও পশ্চাৎ, এখন এই রুমালখানি দেখদেখি।” বলিয়া প্রথম রুমালখানি নবীনার হস্ত হইতে লইয়া দ্বিতীয় রুমালখানি দিল।

এই রুমালখানির কাজ অল্প প্রকার ; পুষ্প শোভিত লতা পাতা বিশিষ্ট। ইহার সৌন্দর্য্য কি মনোহর, ইহার সৌগন্ধও না জানি কত মনমুগ্ধকর ; ইহা ভাবিয়া নবীনাবালা সুবাস আশ্রয় আশায় সেই রুমালখানি নাসিকাপ্রান্তে ধরিল—যেই ধরিল ; অমনি কি ভয়ানক অভাবনীয় ঘটনাই না ঘটিল ! নবীনাবালা দারুণ যন্ত্রণাদায়ক বিকৃত হর্ষ উঃ—স্বর মিলিত একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সংজ্ঞা হারাইল, তাহার তাৎকালিক মুখাবয়ব দেখিয়া বোধ হইল যেন, কামিনী কোন নৃশংসের দারুণ লণ্ডড়াঘাতে আহত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

সহৃদয় পাঠক মহাশয় ব্যাপার কি বুঝিলেন ? উক্ত রুমালখানিতে সদ-গন্ধের পরিবর্তে এক প্রকার ভয়ানক চেতনা বিলোপকারী উগ্রগন্ধ দ্রব্য সং-গোপনে লুকাইত ছিল। তাই নবীনা উহা আশ্রয় মাത്രেই যন্ত্রণায় সজ্ঞা শূন্য হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।



“তুমি কি অধীর—ছিঃ !”—

নবীনাবালা চেতনা হারাইলে, মোহিনী আর কালবিলম্ব না করিয়া, উক্ত ক্রমানুসারে বাস্তবজাত করিয়া ত্বরিত কম্পায়িত পদে ও অবসাদিত হৃদয়ে নবীনাব কক্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইল । নবীনা-জননী কক্ষপ্রান্তে আসিয়া সহসা থামিল ; অন্তর্ভুক্ত হইতে একবার অতি সত্তর্পণে তদীয় দরজার ঈষৎ উন্মুক্ত পথ-সাহায্যে কক্ষ মধ্যে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিল, নবীনা-জননী নিজায় কাতর । অমনি অতি সাবধানে সেই দ্বারসংবিদ্ধ পিতল বলয়দ্বয় আকর্ষণ করিয়া ঈষদোন্মুক্ত দ্বারপথ রুদ্ধ করিল । শব্দহীন দ্রুতপদ বিক্ষেপে একেবারে নিম্নতলে সদর দরজা অভিমুখে আসিয়া থামিল—অতি ধীরতায় অর্গল উন্মুক্ত করিয়া মৃদু পদসঞ্চারে বাটের বহির্ভাগে আসিল—সচমকে দেখিল ? একটি ভঙ্গলোক সেই নির্জল গলির মধ্যবর্ত্তি স্থানে পদচারণা করিতেছেন—যেন তিনি কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । মোহিনীর আপাদ মস্তক কম্পিত হইল, পরক্ষণে তাহার ভয়ানক মুখমণ্ডলে বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত হইল ; মোহিনী সেই ব্যক্তির নিকটবর্ত্তী হইয়া বিরক্তি বিজড়িত অল্পক্ষণে বলিল, “তুমি কি অধীর—ছিঃ !”—

অমনি সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ ফিরিয়া মোহিনীর প্রতি তাকাইল ; মোহিনীর এই কথার কোন উত্তর না দিয়া কি একটা গুপ্ত সঙ্কেত করিল ।

মোহিনীও সাধারণের ছুরতিগম্য একটি সঙ্কেত করিয়া, সেই ব্যক্তিকৃত সংকেতের উত্তর দিল ।

অমনি তাহার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইল—অতি ক্ষুণ্ণসহকারে সেই ব্যক্তি মোহিনীর বিপরীত পথ অবলম্বন করিল । ইহার উৎসাহশীল গমন ভঙ্গিমায় বোধ হইল, ইনি কিছু গোলাপি মদিরী রসাদে রঞ্জিত হইয়াছেন ।

যাহা হউক মোহিনী গলিব প্রান্তভাগে আসিয়া সেই ব্যক্তির উদ্দেশে এক-
বার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল ; কিন্তু তাকে আর দেখিতে পাইল না । তখন
সে রাজপথে উপনীত হইয়া একটি নিভৃত স্থানান্তরিত অশ্রয়ানে আরোহণ
করিল । অশ্রয়ান আশ্রয়কে লইয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিল না, পরন্তু
সেইখানেই পূর্ণবৎ অপেক্ষা করিতে লাগিল । বলা বাহুল্য মোহিনী গাড়িতে
উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

—তোমার—

—“তোমার এই কাজ !”—

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে কি জানি কেন শাস্ত্রাবু আবার বাটী ফিরিয়া
আসিলেন—দেখিলেন বাটীর সদর দরজা খোলা । মনে করিলেন, নবীনীর
ভায়েয়া সকাল নকাল সুলেব ছুটি কবিয়া আসিয়া থাকিবে ; তাই বা কেমন
কবিয়া হইতে পারে, তাহা হইলে ত তাহাদিগের কলরব শুনিতে পাওয়া
যাইত । এ যে বাটী নোদব নিস্তর । তবে কি কাজ (যদি মহাশয়) আসিয়া-
ছেন । তাই বা কেমন কবিয়া হইতে পারে । এ—ত তাঁহার আসিবাব সময়
নয় । তবে কি মা (যদি ঠাকুরানী) পার্শ্ববর্তি প্রান্তবিনীদিগের বাড়িতে গিয়া
থাকিবে ? তাহা হইলে ত নবীনা দরজা বন্ধ করিত ।

মুহুর্ত্তে তাঁহার মনমনধ্যে একফালান এতগুলি প্রশ্নোত্তর ঘোঁসাইয়া
সহসা তাঁহার মনে এটি কথা উদয় হইল, এ—কিঞ্চ হইল ! অমনি তাঁহার
অন্তরে কেমন এক অমঙ্গল আশঙ্কা স্ফুট হইল—কি এক অজানিত সর্বনাশী
প্রাণঘাতী আশঙ্কায় তাঁহার মস্তিস্ক পৰ্য্যন্ত কাণিয়া উঠিল ; অবসাদ বিজড়িত
কল্পিত পদে অচ্যুতনন্দে দাবার্গল আচিয়া উপানে উঠিলেন—দেখিলেন, উপরেও
নিম্ন তলের ছায় নিভর্জন নোনা । ছোট এক পদ আগমা হইয়া, তাঁহার শ্রো-
ঠাকুরানীকে ডাকিলেন, “মা—মা—মা ॥” কিন্তু কাণেও উত্তর পাইলেন না ;
তখন শ্রোঠাকুরানীও কহিল । ঠেরিলেন—অনুপস্থিত কক্ষদ্বার সম্মুখে উদ্ঘাটিত
হইয়া গেল—দেখিলেন, তাঁহার শ্রোঠাকুরানী বানানুত মেঝেপরি নিশ্চিন্তে
নিদ্রা ঘাইতেছে । আবার শাস্ত্রাবু ডাকিলেন, “মা—মা ॥”

নবীনা জননী সচকিতে একেবারে উপাধান ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। সম্মুখে শাস্তবাবুকে দেখিয়া আগে এগাহত অবষ্ঠান সামান্যইয়া পনে বসিল, “কে বাবা শাস্ত।”

নবীনা-জননী মনে করিয়াছিল, শাস্তবাবু বুঝি বাহিরে যাইতেছেন। তাই আবার বলিল, “বাবা আজ আর বেশী বাজি কানও না।”

শাস্তবাবু ইহার উত্তরেব পবিতর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, “সদয় দরজা খোলা কেন?”

নবীনা-জননী বলিল, “তবে সেই মেয়েটি বুঝি এই বাড়ী গেল।”

ইহা শুনিয়া শাস্তবাবু নবীনাব কণ্ঠদ্বারে উপস্থিত হইয়া কক্ষ দ্বার ঠেলিয়া জানিতে পারিল, ভিতর দিক হইতে অর্গল নক। শাস্তবাবুব তখন মনে হইল, সে স্ত্রীলোকটিব যাওয়া তবে কিরূপে সম্ভবে। আশা যদি থাকে, তাহা হইলে দ্বার কক্ষ করিবার আবশ্যক। তৎপরে নবীনাব উদ্দেশে ডাকিয়া বলিলেন, “দরজা খুলিয়া দাও—শুনিতোছ—ওগো দরজাটা খুলিয়া দাও।” এইরূপ পুনঃ পুনঃ ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না বা কেহ দরজা খুলিয়া দিল না।

শাস্তবাবুব ডাকাডাকি নিষ্ফল হইল, দেখিয়া নবীনা জননী বলিল, “তবে বুঝি ঘুমাহুয়া পড়িয়াছে।” এত বলিয়া নিজ কক্ষ দ্বারদেশে আসিয়া দড়াইল।

শাস্তবাবু আশে দুই একজন নবীনাকে ডাকিলেন—তবু এখন শাড়া নক পাইলেন না। তখন তিনি উৎকট অধৈর্য্যবেগে সজোবে ঘাবে পদাঘাত করলেন, অমনি বাবু বান্ পদে বাড়ী প্রাধবন করিয়া দান ভগ্ন হইয়া কক্ষ মধ্যে পতিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে শাস্তবাবু কক্ষ মধ্যে একটি ভীষণ লোমহর্ষণ বাণ দোখিয়া তাঁহার অন্তরাখা যেন উড়িয়া গেল, গৃহভ্যন্তরে তাঁহার রমণী আনু খালু বিবশা সংজ্ঞাহীনা, সম্মুখে তাঁহার পুণাতন বন্ধু দুর্কৃত্ত তসব-প্রকৃতি মণিলাল একখানি উলঙ্গ শাণিত ছুরিকা হস্তে তাঁহার দিকে ফিবিয়া চলিতেছে, তাহার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণোজ্জ্বল লোহিত কটাক্ষে তাঁহার প্রতি নিগন্ত হইয়া তাঁহাকে প্রাণ শীহরণ আতঙ্ক প্রদান করিতেছে।

এই ঘটনা দেখিয়া শাস্তবাবুর মুহূর্ত্তেব জন্ত অব্যক্ত চিত্ত-বিভ্রাট ঘটয়া। তাঁহার বাক্যক্ষুরণ হইল না। পনে বাব্যক্ষুরণ হইলে বলিল, মণিলালবাবু তুমি—তোমার এত কাজ!—মুখেব কথা মুখেব বহিয়া গেল। কারণ ছঃসাহসিক নরপিশাচ মণিলালবাবু ক্ষুধিত ব্যাঘের তায় তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল

এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রহস্তে হতভাগ্য শাস্ত্রাবুর পৃষ্ঠদেশে উপযুক্তপরি সেই ধুরধার শাণিত ছুরিকা বসাইয়া মক্ষজবেগে পলায়ন করিল।

দশম পরিচ্ছেদ ।



“টোমার কোন ভয় নেই ।”

স্বীনা জননীৰ সমক্ষে মহমা উক্ত দৃশ্য বিভীষিকা আভনীত হইলে; তাহার রসনা ঝালীয় শৃঙ্গপ্রযুক্ত আতঙ্ক-উৎপাদিত মর্গস্পর্শি আর্তনাদ প্রচারে নিশ্চেষ্ট হইল; তাহার শরীরে প্রাণময়ী ধমনীর অভ্যন্তরস্থিত উষ্ণ শোণিত প্রবাহ শিহরীত—ক্রিয়াহীন বশতঃ তাহাকে তাত্‌কালিক চকিত, বিস্মিত আতঙ্কিত ভাব সন্নিবেশিত দৃশ্য চমৎকার চিত্রপটের স্থায় কক্ষ দ্বারে স্থাপিত বোধ হইল। যখন ছুরাঙ্গা নর-কুল কলঙ্ক মণিলালবাবু নিজ সমূহ বিপদ দেখিয়া আত্মরক্ষা নিবন্ধন মুহূর্ত্তে সেই হতভাগ্য স্ত্রীলোকটির নয়ন সমক্ষে ভয়ানক শোকাবহ লোমহর্ষণ কাণ্ডের চূড়ান্ত অভিনয় প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তখন তাহার চৈতন্য সম্পাদন হইল, তাহার রক্ত শোণিতবেগে তাহার শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহে ছুটিয়া তাহাকে উন্মাদিনীর প্রায় করিল; সে দারুণ মর্গস্পর্শি শোক শব্দে সেই বাণী প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। আহা রমণী প্রাণে কত সহ হয়।

অচিরে তাহার প্রতিবেশীমণ্ডলী এই আকস্মিক ভয়ানক শোক শব্দে জামিত চমৎকৃত হইয়া, যিনি যেখানে যে ভাবে ছিলেন, তিনি সেইখান হইতে সেই ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ভয়ানক বিশদূশ লোমহর্ষণ কাণ্ডে বিস্মিত আশ্চর্য্য স্তম্ভ অন্ধিত বিকৃত মুখ ভঙ্গিমায় দেখিলেন, দেখিয়া তাহার সকলে কি এক প্রকার অব্যক্ত দূরবোধ ভয়বিজড়িত মুহূর্ত্তীকার শব্দে তথাকার বায়ু প্রবাহ আলোড়িত করিল এবং সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সেই শোকমগ্নিতা বিহ্বলা গৃহিণীকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কাহার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিল। কিন্তু কেহই ইহার কোন উত্তর পাইল না। কেবল

আহার পরিষর্তে গুনিতে লাগিল,—পাষণ্ড প্রবকারী—তাহার উন্মাদ হৃদয়ের অর্থ শূন্য শোক শব্দ অহরী।

ঐ সকল বৃথা গোলযোগকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে, জনৈক কর্তব্যপরাধ যুবক, উহাদিগের ন্যায় বৃথা ব্যস্ততায় অধীর না হইয়া তাৎকালোচিত বীরতা সহকারে, তিনি সেই হতভাগ্য শোণিতাক্ত লুপ্ত সংজ্ঞা শাস্ত্রবাবুর গুত্রাশয় নিযুক্ত হইলেন এবং অল্প একটি ব্যক্তিকে সহোদন করিয়া তৎপল্লিহ পরিচিত চিকিৎসক মহাশয়কে শীঘ্র আনয়ন করিতে কহিলেন। যুবকের আদেশ অনুযায়ী সেই ব্যক্তি কালবিলম্ব না করিয়া ডাক্তার মহাশয়ের উদ্দেশে গমন করিল।

তৎপরে তিনি এই বিপদ বার্তা আর একটি লোক-মারফত উক্ত বাটির কর্ত্তা সন্নিধানে—দোকানে পাঠাইয়া দিলেন।

ঐহার অনতিবিলম্বে ডাক্তার মহাশয় আসিয়া পড়িলেন, তিনি সাধারণ বেশেই আসিয়াছিলেন। কারণ তিনি আহারাদির পর সুখ-শয্যায় বিশ্রাম লাভিতে ছিলেন, এমন সময়ে সেই লোকটির দ্বারা তাঁহার প্রতিবাসীর ভীষণ লোমহর্ষণ বিপদ বার্তা পাইয়া, অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সহকারিকে তাৎকালোচিত ব্যবহারীয় ঔষধ পত্র অস্ত্র সজ্জাদির সহিত তাঁহার অনুগামী হইতে কহিয়া, তিনি উক্ত লোকটির অগ্রগামি হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল, তিনি তদাবস্থায় রোগীর চিকিৎসায় নিযুক্ত হইতে যেন, একটু ইচ্ছা ততঃ করিলেন, পুনরায় কি ভাবিয়া স্থিরিতে পরীক্ষা কার্যে মননিবেশ করিলেন। শাস্ত্রবাবুকে দেখিয়া তিনি যে রূপ ভয়ের কারণ মনে করিয়াছিলেন, সেরূপ নহে; পরন্তু পরীক্ষান্তে তিনি তাহার বিষয়ে নির্ভয় হইলেন। কিন্তু নবীনাবাগার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তিনি ভীত হইলেন, আর একটু বিলম্বে আসিলে, তাঁহাকে নিশ্চিত নবীনার জীবনাশায় হতভাগ হইতে হইত।

মতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সহকারী মহাশয় না আসেন, ততক্ষণ তিনি স্থিতি সম্বন্ধে নষ্ট না করিয়া নবীনার ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া নিজ ঔষধাগারে পাঠাইয়া দিলেন ও অল্প একটি পত্রে এত ঘটনার বিষয় লিখিয়া স্থানীয় পুলিশে পাঠাইয়া দিলেন; চিকিৎসক-সহকারী মহাশয়ের আসিতে একটু বিলম্ব হইল। কারণ নবীনার ঔষধের ব্যবস্থা পত্র অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আসিতে হইয়া ছিল। যাহা হউক, তিনি আসিবামাত্রই উভয়ের চিকিৎসা-কার্য আদ্য হইল।

যখন চিকিৎসক মহাশয় তদীয় কর্মে ব্যস্ত আছেন, তখন বাটির অভি-
ভাবক মহাশয় আসিয়া পড়িলেন ; তিনি উপস্থিত কাণ্ডকারখানা দেখিয়া
শুনিয়া মতিভ্রান্ত হইলেন ; কিন্তু প্রতিবেশীর এইরূপ সহানুভূতি দেখিয়া তিনি
কতক পরিমাণে আশ্বস্ত লাভ করিলেন ।

এদিকে চিকিৎসকের সূচিকিৎসায় শাস্ত্রবাবুর ধীরে ধীরে চেতনাসঞ্চার
হইতে লাগিল । সকলে তাহার আতঙ্কিত মলিন মুখের প্রতি চাহিল,—
সব্বশয়ে শুনিল, “মণিলাল—ভদ্রবেশী ঘৃণিত সয়তান—তোমার এই কাজ” ।

সকলের তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না, তাহার উক্ত নরঘাতকের
ব্যক্তিগত বিবরণ জানিবার জন্ত উৎকর্ণ হইয়া রহিল ।

এমন সময় পুলিশ দলবলসহ ঘটনাস্থলে আগমন করিলেন । সাহেব ইন্-
স্পেক্টর ধীরতা সহকারে যথাযথ তদন্ত করিতে লাগিলেন । তৎপরে শাস্ত্রবাবুর
মুখ-নিস্থত গুটিকতক কথা—বাহা তিনি তখন শুনিতে পাইলেন, তাহাতেই
তাহার তদন্তের কার্য শেষ করিলেন ; পরে তিনি রোগীদ্বয়কে হাসপাতালে
পাঠাইয়া দিবার কথা পাড়িলেন । ডাক্তার মহাশয় বাটির কর্তার মতামত
জানিয়া সাহেবের উক্ত কথায় আপত্তি প্রকাশ করিয়া, তিনি এই বিষয়ের
দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, এইরূপ বলিয়া সাহেবকে তাহাদের দুইখানি ‘সার্টি-
ফিকেট’ লিখিয়া দিলেন । সাহেব ইহাতে আর উচ্চ বাচ্য না করিয়া, ‘নোট
বুকে’ কতকগুলি কি লিখিয়া লইতেছেন, এমন সময় তথাকার জনতার মধ্য-
স্থিত কোন এক ব্যক্তির মুখ নিস্থত কি একটি কথা শুনিয়া সাহেব লেখায় ক্ষান্ত
দিলেন, তাহার পিঙ্গল চক্ষু তাহার প্রতি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি
কি বলিটেছ ?”

সেই ব্যক্তি কিছু ইতঃস্তত করিতে লাগিল ।

সাহেব পুনশ্চ বলিলেন, “তুমি পুনরায় ঐ কটা বল—তোমার কোন ভয়
নেই ।”

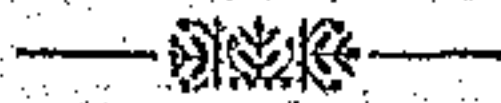
তখন সেই ব্যক্তি বলিল, “এই গলির শেষে—রাস্তার অপর পাশে,
যখন আমি আমার একটি বন্ধুর সহিত কথা বার্তা কহিতেছিলাম,—
তখন গোলেন্দাল রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিহিত একটি ভদ্রলোক এই গলি
হইতে দৌড়াইয়া অদূরস্থিত একটি গাড়িতে গিয়া উঠিল এবং পরক্ষণে
সেই গাড়ি দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল । এখন আমার বোধ হইতেছে
সেই লোকের এই কাজ ।”

সাহেব এই কথা শুনিয়া অতি উৎকুল হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসী করিলেন,
“বোড হয় টোমর বনটু সেই লোকটাকে দেখিয়া ঠাকিবে ?

“হ্যাঁ। আমার বন্ধুও সেই লোকটিকে দেখিয়াছিল।”

সাহেব বড় খুসি, মনে করিলেন এত বড় বকোদমার শীঘ্র একটা কিনারা
করিয়া আদালতে উঠাইতে পারিব। সাহেব তাহার ও তাহার বন্ধুর নাম ধাম
লিখিয়া লইয়া আনন্দিত মনে দলবলসহ প্রস্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।



“তুমি আসিয়াছ ?”

যিনি বিদ্যা বুদ্ধি বিবেচনায় সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সর্বগুণালঙ্কৃত, যিনি
দেব তুল্য ; তিনি যদি অসংযমী হন, তিনি যদি নিজ গুরুত্ব বুদ্ধিতে না পারিয়া
কোন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যান, তাহা হইলে তিনি অকৃতি হইয়া
জন সাধারণের নিকট নিন্দনীয় হন ও তাঁহার অবসম্ভাবি পতন ঘটে।

ইহার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আমরা নিম্নলিখিত রহস্য-বুড়ুংসু—যুবক অসিন্দ্র-
বাবুর কার্য্য কলাপে দেখিতে পাইব। অসিন্দ্রবাবু সভ্য ভব্য উন্নত উদর
পরচ্ছঃ কাতর—সংসারে নব্য যাত্রি ; তিনি তাঁহার স্বাভাবিক রহস্য-বুড়ুংসায়
শ্রুতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সকল সম্প্রদায়ে গতিবিধি করিতেন ; ইহার ফলে বালিকা
বেশী সরসের সহিত আলাপ ; পাঠক মহাশয় ! ইহা আপনি অবগত আছেন।

আমাদের দেশে—সমাজের কোণে—সাধারণের তন্দ্রাবিষ্ট নয়ন সমক্ষে, যে
একটা অস্তব বহমান মহাপাপ শ্রোতে আনীত। একটি কুসুম কলিকা সদৃশ
যাপিকা সরসের ভবিষ্য পরিণাম, ঘোর অন্ধকারময় ভারিয়া পরচ্ছঃ কাতর
অসিন্দ্রবাবু নিত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মহাহুভূতি প্রকাশ করিতে যাইত ও সৎ কথন
শুনাইয়া তাহার চিত্তশুদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইত, কিন্তু ভ্রান্ত যুবক তাঁহার
অজ্ঞাতমারে সুন্দর সেফালিকা—সরসের রূপ মোহে আবৃষ্ট হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট
হইলেন ও তাহার ফলে অসিন্দ্রবাবু অসংসহবাণে চরিত্র হারাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে

অপদস্থ ও লাক্ষিত হইলেন । অসিজবাবু প্রাণে আঘাত পাইয়া নিজ ভ্রম
বুদ্ধিতে পাবিয়া অমৃতপ্ত হইলেন—মনে করিলেন, একুপ কাজ আর করিব না ।
কিন্তু যখন ইন্দুবাবু কর্তৃক তিনি শুনিলেন, সরমের দিদিমা মারিয়াছে, সবম
তাহাকে একবার যাইতে বলিয়াছে ; তখন অসিজবাবু ঘোর চিত্ত-দ্বন্দ্ব
পতিত হইলেন । অসংযমী পুরুষেব মনে হইল, সরম এখন নিঃসহায়, তাহার
কি হইবে । আহা সে বাণিকা—জগতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । এইরূপ কত কথা
তাহার মন মধ্যে আসিয়া তাহার হৃদয় বন্ধন শিথিল হইতে লাগিল । আবার
ইহার বিরুদ্ধ ভাব সেই অপদস্থর কথা মনে পড়িয়া তাহার হৃদয় বন্ধন পুন-
রায় দৃঢ় হইতে লাগিল । এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘোর দ্বন্দ্ব অসিজবাবু অবসন্ন
হইলেন । এই অবসন্নকালে ইন্দুবাবুর সেই মিথ্যা চাতুরি—সেই শেষ কথা ।
“সরম তোমাকে একবার যাইতে বলিয়াছে” । এই কথা বারংবার তাহার
মাগস পটে নাচিয়া তাহার মোহাবেশ আনাগন করিল । অসিজবাবু যেন,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন সরম—সেই জ্যোৎসনা বিধৌত সদ্যক্ষুটনোমুখ
কুসুম কলিকা রূপ সবম, তাহার মধুমাখা কম্পিত বিশ্ব-অধর ওষ্ঠে মধুর আধ
কথা ক্ষুরিত করিয়া, তাহার প্রতি ছল ছল পঙ্কজ আঁখি মেলিয়া তৃষিতা
চাতকীব মত, সক্রমণ কটাক্ষে তাহাব আগমন প্রার্থনা করিতেছে ।

এ দৃশ্য দেখিয়া কাহার প্রাণে ধৈর্য্য সংশ্লিত হইতে পারে ?—ছার অসিজ-
বাবু—তিনি অবসন্ন প্রাণে স্থির করিলেন, কাল একবার যাইব—একবার মাত্র
তাহাকে চোখের দেখা দেখিয়া আসিব ; ইহাতে আর কি দোষ হইতে পারে ?

অসিজবাবু ইহা স্থির করিয়া, পরদিন প্রত্যুষে সরমের বাড়িতে গিয়া, তাহার
কথা আর একবার রাখিলেন ।

সরম তাহাকে অকস্মাৎ তাহার বাটিতে উপস্থিত দেখিয়া অদীর আনন্দ-
বেগে দ্রুত অগ্রসর হইয়া “অসিজবাবু তুমি আসিয়াছ ?” বলিয়া সরল
তাহার হস্ত ধারণ করিল ।

অসিজবাবু তাহাব কোমল স্তূথপর্শে—সরল ব্যবহারে ভ্রান্ত হইলেন ।
তাহাব মনে যে বলটুকু ছিল, তাহা এইখানে—এই পরিক্ষায় অপসারিত
হইল । অসিজবাবু যুগলে ঘবে গিয়া বসিলেন । তাহাব সহিত সরমের অনেক
কথা হইল । অসিজবাবু সরমের সেই অল্প বিস্তারিত গুপ্ত কথাও শুনিলেন ;
নিজের অনুমান তাহার প্রতি সত্য বলিয়াছে । ইহা জানিয়া সরমের উপস্থিত
আবস্থার বিষয় জাবিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত হইলেন ; মনে মনে ভাবিলেন

সরমের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করিলে তাহার পক্ষে হিত সম্ভব । কিন্তু উপস্থিত তিনি ইহাব কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না । ইহার পব তিনি সে দিন কার মত সরমের কক্ষ হইতে উঠিলেন । সবম তাঁহাকে আবার আসিবাব জ্ঞাত মিষ্টে অনুরোধ করিল । অসিদ্ধবাবু এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই ।

এইরূপ ছই একদিন যাওয়া আসা হইতেছে ; এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে অসিদ্ধবাবুর বাটির আকর্ষণ শিথিল হইয়া পড়িল ।

এই ঘটনা আর কিছুই নহে, অসিদ্ধবাবুর মাতৃস্বপতি মহাশয় তাঁহাদিগের উক্ত শুভ বিবাহ সম্মিলনীতে আগমন বিলম্ব দেখিয়া—পুত্র জগতবাবুকে তাঁহাদিগকে আনয়নার্থে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । অসিদ্ধবাবুর উপস্থিত, তাহার সহিত যাইবার পথে একটি প্রতিবন্ধক ছিল, সে প্রতিবন্ধক ববাহনগরের জমিজারত সংক্রান্ত গোলযোগ । এই গোলযোগ না মিটাইয়া কেমন করিয়া যাইবেন । কিন্তু তিনি তাঁহার জননী ও জ্যেষ্ঠ আশ্রয়ান্তি-শয্যা দেখিয়া তাঁহাদিগকে অগ্রে জগতবাবুর সহিত পাঠাইয়া দিয়া পশ্চাৎ তিনি ছই চারি দিনের মধ্যে গোলযোগের উপসংহার করিয়া যাইবেন । এই অভিপ্রায় অনুসারে সমস্ত বন্দোবস্ত হইল । এমন সময়ে অসিদ্ধ-জননী মতান্তর ঘটিল । তিনি পুত্রবধূকে সঙ্গে লইবেন না, কেবল তাহার প্রিয়তম দৌহিত্র ও বৃদ্ধাবিকে সঙ্গে লইবেন । ইহার কারণ অসিদ্ধবাবুর সেই পরিবর্তন ; পুত্রবধূকে সঙ্গে লইলে কি জানি ! পুত্র যদি আবার বিগড়াইয়া যায় । থাক—পুত্রবধূ অসিদ্ধের সহিত একত্রে পশ্চাৎ আসিবে । এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে অসিদ্ধ-জননী জগৎবাবুর সহিত রওনা হইলেন ।

বাটিতে রহিলেন কেবল অসিদ্ধবাবু তাঁহার সহধর্মিণী, ভূতা চিনিবাস ও আর একটি পাচিকা ব্রাহ্মণী, সেটিকে নূতন দেশ হইতে আনয়ন করিয়া বাহাল করা হইয়াছে ।

অসিদ্ধ-জননী পুত্রের চরিত্র বজায় রাখিবাব নিমিত্ত যে পছন্দ করিয়া গেলেন, তাহাতে অসিদ্ধবাবুর চরিত্র বজায় থাকিল না, যাহা ছিল তাহাও গেল । পৃষ্ঠোপরি ব্যক্তির অন্তরালে কোন গন্দ কর্ম করিলে, কেহ বলিবার কহিবার নাই । স্মরণ্য তাহাতে ভয় বা চক্ষু লজ্জাও নাই । অসিদ্ধবাবুর পক্ষে তাহাই ঘটিল ; জননীর অন্তর্ধানে তিনি অগ্রে পশ্চাৎ কিছুমাত্র না

ভাবিয়া সময় অসময় নাই সরসের বাটিতে গভীরত, তার পর আবার রাজি-
বাস, তার পর চালও পান্সি বালিয়া মজায় গা ঢালিয়া দিলেন ।

অসিদ্ধবাবুর এই নির্ভুর ব্যবহারে ননীবালার কোমল প্রাণে বিষম আঘাত
লাগিল । তাহার ফলে যাহা ঘটিল তাহা অতি ভয়ানক ।

প্রিয় পাঠক ইহা দেখিবেন কি ? দেখিবেন বই কি ? না দেখিলে জগতে
শিক্ষা কোথায় ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

“একি !”

আজ কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ দ্বি-প্রহর মধ্যাহ্নে গভীর রজনী । জীব
জগতের আশঙ্কার নিদানস্বরূপ । প্রকৃতি সতী আজ ঘোর বিষাদ কালিমাময়ি ।
কোথায় কোনরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছে না ; কেবল মধ্য মধ্য পবন দেবের
গর্জিত আশ্রয়িত গতি শব্দ শ্রুত হইতেছে ।

এই দুর্যোগ নিশাকালে ননীবালা নিজ শয়ন কক্ষে শয্যাপরি এখনও
একাকী আসীন । তাঁহার রদনমণ্ডল বিষাদিত চিস্তানীত । কারণ আজ কম
দিন হইল, অসিদ্ধবাবু বাড়ি আসেন না । তাই সরলা যুবতী কামিনী ননী-
বালা, তাঁহার আদর্শনে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া চিস্তানীত । তাই কর-কপোল বিহ্বল
বিরহ-বিধূরা-বালা শয্যাপরি বসিয়া অতুল চিন্তা-সাগরে ডুবিয়াছে ;—ভাবি-
তেছে ; কেন আমি ঠাকুরপোর সহিত যাইবাম না—কেন আমি তাঁহাদের
কথায় ভুলিয়া এই অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছি । এখন আর এখানে থাকিয়া
কল কি । আমার আমি আমার ছাড়িয়া—আমার মুখের দিকে না চাহিয়া, যখন
ঘৃণিত বারাননার কলুষিত প্রেমাকাজী, যখন আমি তাঁহার ভোগ্যবস্তু হইয়া

বিনা কারণে উপেক্ষিত—দূরে নিষ্কিণ্ণ হইয়া অনন্ত দূরত্বেরে ডুবিলাম । তখন আর আমার এখানে থাকিয়া ফল কি ? বাচিয়াই বা সুখ কি ? মুহূর্ত্তে স্নেহা-ধার সন্তানের মুখখানি মনে পড়িল—মুহূর্ত্তে মরণ কামনা দূরে পালাইল—ভাবিল, আহা বাচ্চার চাঁদপানা মুখখানি আজ ক-দিন হইল দেখি নাই । এইরূপ নানা চিন্তায় ননীবালা যখন অধীরা । তখন চিনিবাস নিঃশব্দে তদীয় কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল । ভাব বিষয় মর্ম্মপীড়ায় অধবদন—অভি-মানে নির্ঝাক । চিনিবাস এইরূপ ভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ।

ননীবালার চিন্তামিত প্রভাহীন মলিন দৃষ্টি দীনভাবাপন্ন চিনিবাসের উপর সহসা পড়িল । অমনি সস্নেহে বলিল, “কেও চিনিবাস তুমি ! ওখানে ওরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া কেন ?—ভিতরে এস ।”

চিনিবাস আন্তে আন্তে ধীরপদে কক্ষে প্রবেশ করিল ।

“একি ! তোমার মুখ ভার ভার কেন ? বুঝিয়াছি, তোমায় কেহ কিছু বলিয়াছে । আমি প্রথমেই তোমায় বারণ করিয়াছিলাম, তুমি ঐ কদর্যা স্থানে যাইও না ; তুমি শুনিলে না,—বলিলে একবার যাই—তাহাকে নিশ্চয়ই ফিরাইয়া আনিব । কোই তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে কি ? তিনি কি তাহাতে আছেন যে, তোমার কথা শুনিবে ;—দেখিলে ?—আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই হইল ?—এখন তোমার মত কি ? আমার বাড়ি রাখিয়া আসিবে কি না ? আর আমার একদণ্ড এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই ।”

অভিমানী অভিমানভরে এই কথাগুলি বলিয়া চিনিবাসের প্রতি আয়াত লোচনে চাহিয়া রহিল ; ইহার অর্থ—চিনিবাস তাহার মতে কি উত্তর দেয় । কিন্তু চিনিবাস কোন উত্তর দিল না । পূর্ব্ববৎ নীরব ও মৌনী হইয়া রহিল । তাহার উত্তর দিবার বা বলিবার কিছুই নাই—যাহা ছিল, তাহা বলিয়াছে, এখন সে হার মানিয়াছে, চিনিবাস তাই নীরব, তাই মৌনী ।

ননীবালা তাহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া পুনশ্চ বলিল, “দেখ আমি সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছি । তোমায় আর কিছুই যোগাড় যত্ন করিতে হইবে না । রাজি অধিক হইয়াছে, এখন তুমি শোও গিয়া, কাল আবার ভোরে উঠিতে হইবে ।”

চিনিবাস কোন উত্তর করিল না, সে মোনে সম্মতি প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃমনে নিজ গৃহে গমন করিল ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

—❦—

“কে—মা ?”

ননীবালা আবার চিন্তাশ্রোতে সম্ভবণ দিতে লাগিল । কিন্তু কুল পাঠল না, ক্রমে ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িল ;—তবুও চিন্তাব বিবাগ নাই, এই অবিশ্রান্ত চিন্তাব মধ্যে ক্ষণস্থায়ি তন্দ্রাও মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিল । এইরূপে রাত্রি প্রায় অন্তমান হইতে চলিল ।

ননীবালা একবার বাহিরে আসিল—দেখিল নৈশ অন্ধকার চতুর্দিকে গম্ভীর ভাবে অবস্থান করিতেছে, ঘন নীল নৈশ আকাশ পানে চাহিল—দেখিল, তাছাতে তাঁদের হাসি নাই, কেবল অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলী মিট মিট করিয়া তাহার পানে চাহিয়াছে । ঠিক এই সময়ে সহর প্রান্তে অবস্থিত কোন যন্ত্রের সময় জ্ঞাপক বংশীধ্বনি মুহূর্ত্ত মাত্র দিগ দিগান্তে ছুটিয়া নীরব রজনীর নীরবতায় মিশিয়া গেল । অমনি ননীবালার মুখ হইতে আশ্বে আশ্বে উচ্চারিত হইল,—“এখন আর রাত্রি অধিক নাই । যাই চিনিবাসকে জাগ্রত করি, আর বিলম্ব করা উচিত নয়”—বলিয়া ননীবালা চিনিবাসকে জাগ্রত করিতে গেল । উঠান পাব হইয়া চিনিবাসের শয়ন গৃহের দরজায় নিকট আসিল, “চিনিবাস—চিনিবাস” বলিয়া ডাকিল, তার পর আশ্বে আশ্বে দরজা ঠেলিল । তথাপি চিনিবাস জাগিল না । এই সময় দূরে একটি পেচকেব বিকট নৈরাশ্য বাজক কঠিন কর্কশ ধ্বনি নৈশ নভ-মণ্ডলে বারংবার প্রতিধ্বনি হইল । নিশাচরের এই আকস্মিক উদ্ভট শব্দ শুনিয়া—কি জানি কেন ননীবালার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল । ননীবালা ইহার পূর্বে আর কতবাব নিশাচর পক্ষি বিকট ভৈরব রব শুনিয়াছে—কৈ কখন ত একপ হয় নাই ।—আজ কেন এমন হইল । ননীবালা ইহা ভাবিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না । ননীবালা অনামনকে আবার চিনিবাসের দরজা ঠেলিল, চিনিবাস এঁবার জাগিল ;—ভিতর হইতে উত্তর দিল, “কে—মা ?” ননীবালা বলিল, হ্যাঁ—আমি, উঠ—দরজা খোল ; আর রাজ্য নাই ?”

চিনিবাস দবজা খুলিল—দেখিল, নৈশ অন্ধকাবাবতা প্রভু-বণিতা তাহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান। চিনিবাস সমস্ত্রমে কাঁহল, “মা এখন রাত্রি রহিয়াছে, এত ভাড়াভাড়ি বাস্ত হইবার কোন দবকার নাই; এখনও অনেক সময় আছে।”

ননীবালা বলিল, “না চিনিবাস তুমি বুঝ না, বিলম্ব করিলে সময় বহিয়া যাইবে; এখন হইতে প্রস্তুত হওয়া খুব দরকার। তুমি এক কাজ কর, বামুন গিন্নিকে (পাচিকাকে) তুলিয়া তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, আর তুমি হাত মুখ ধুইয়া শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আইস; আমি ততক্ষণ জিনিস পত্র গুছাই গিয়া।”

এই বলিয়া ননীবালা নিজ কক্ষে আসিয়া যাত্রাব সাজ সজ্জা গুছাইতে লাগিল। খানিক পবে বামুনগিনি চক্ষু রগড়াইতে বগড়াইতে ননীবালার কক্ষে প্রবেশ করিল।

ননীবালা বামুন-গিন্নিকে বসিতে দ্বিধিত করিয়া বলিল, “দেখ আমিত চলিলাম, তিনি যদি আসেন, তাহাকে বলিও—আমি মরিয়াছি।”

এই শেষোক্ত কথায় ননীবালার চক্ষে জল আসিল, আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না।

বামুনগিনি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “ছিঃ—বোঁমা, অমন কথা মুখে আনিতে নাই; তুমি যদি অমন করিবে, তাহা হইলে সংসার কেমন কবিতা চলিবে; সময়গুণে পুরুষ মানুষ অমন হয়,—তা ছ—দিনেব জন্ম; দেখিবে আবার তোমার জিনিস তোমারই হইবে। মিথ্যা ইহার জন্ম ভাবিয়া শরীব নষ্ট কর কেন মা? তা—মন খারাপ হইয়াছে, বাড়ি যাইবে—যাও; দেখিবে কালাটাদকে তোমার নিকট আবার ছুটিতে হইবে।

বামুন-গিনি তাহার কর্ণকে এইরূপ প্রবোধ দিতেছে। এমন সময়ে চিনিবাস তথাব প্রস্তুত হইয়া আসিল। এদিকে বাহিরেও বায়স উষা প্রচার করিল।

ননীবালা চিনিবাসকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার সব ঠিক?”

চিনিবাস উত্তর করিল, “হ্যাঁ—আমি সব সারিয়া আসিয়াছি।”

ননীবালা বলিল, “তবে আর কেন,—সব জিনিস পত্র বাহির কর।”

বলা বাহুল্য সব জিনিস পত্রের মধ্যে কেবল একটি আবশ্যকীয় বোচকা। এই বলিয়া কি জানি কি ভাবিয়া দেওয়ালের উপরিস্থিত একটি বাজ হইতে কি

বাহির করিল, অতি গোপনে তাহা কটিতটে বস্ত্রাভ্যন্তরে যত্নে লুকাইয়া রাখিল। কেহ ইহার কিছুই জানিতে পারিল না। পরে একটি কুঞ্চিকাওচ্ছ বাহির করিয়া বাগুন-গিল্লির হস্তে দিয়া বলিল, “দেখ এই চাবি রাখ, তোমার যা কিছু দরকার, সব ভাঁড়ার হইতে পাইবে, তুমি খুব সাবধানে থাকিবে, আর চিনিবাস আমায় সেখানে রাখিয়াই আসিবে।”

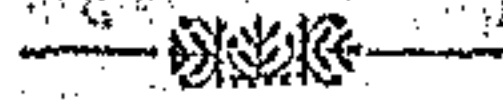
ননীবালা বাগুন-গিল্লিকে এইরূপ উপদেশ দিতেছে। ইত্যবসরে চিনিবাস তাহার অনুমতি অনুযায়ী কার্য সমাপন করিয়া বলিল, “এইবার এক-থানা গাড়ি ডাকিয়া আনি।

ননীবালা বলিল, “না—না। আর গাড়ি কাজ নাই।”

ইহা বলিবার উদ্দেশ্যে, পাছে বিলম্ব হয়, পাছে সকল দিক নষ্ট হয়; তাহা হইলে আজ আর যাওয়া হইবে না। অগত্যা চিনিবাস গাড়ি আনিতে বিরত হইল। ইহার কিছুক্ষণ পরে, যাত্রা করিয়া, চিনিবাস সহ ননীবালা বাড়ির বাহির হইল। গলি পার হইয়া যখন সদর পথে পড়িল। তখন ‘গ্যাস’ নিবাইতেছে। এইরূপ অন্ধকারে অন্ধকারে নিঃশব্দে উত্তরে কয়লাঘাটাভিমুখে গমন করিল। তথায় তাহারা যখন পৌঁছছিল; তখন চতুর্দিকের অন্ধকার অপসারিত হইয়া দিগ্ভ্রুণ সকল উষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চিনিবাস তথাকার অপেক্ষাকৃত একটি নির্জন স্থান বাছিয়া ননীবালাকে তথায় বসাইয়া আপনি টিকিট ক্রয় করিতে ছুটিল।

এত ভোরে তথায় বিস্তর যাত্রির সমাগম হইয়াছিল; তাহাদিগের কল-ধ্বনিতে সেই স্থান পরিপূর্ণিত হইয়াছিল। ওদিকে জেটির ধারে গঙ্গারক্ষে প্রকাণ্ড বাষ্প-তরলী অনর্গল রাশি রাশি কুণ্ডলীকৃত ধূম উদগীরণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ননীবালা মনে করিল; শীঘ্র চিনিবাসকে প্রস্তুত হইতে কহিয়াছিলাম—তবেই রক্ষা ইত্যাদি ভাবিতেছে। এমনত সময়ে কার্য-তৎপর চিনিবাস একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর ও নিজের একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিয়া আনিল। তৎপরে উভয়ে সুবিধাক্রমে উক্ত বাষ্প-তরলীতে আরোহণ করিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে তরলী ভৈরব রবে বশীধ্বনি করিয়া যাত্রীগণের গন্তব্য পথে ধাবিত হইল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।



“বন্দুকধারি কি জন্তু ?”—

অপরূহ কাল । প্রকৃতির অবস্থা কেমন একপ্রকার অস্বাভাবিক
গাতিধো স্থির নীরবতাময় । আকাশের ঘন মেঘ-ছায়ায় অংশুমানির বার্কিকা
লোহিত কিরণ ছটা ডুবিয়া গিয়াছে । দূরে আকাশের প্রান্তে ভীষণ জলধর
অঙ্কে দামিনী চমকিতেছে । বিমান-বিহারী পক্ষীগণ কি একটা দৈব ছুঁটনা
ঘটিবে ভাবিয়া সভয় মনে স্তম্ভিত বায়ু ভেদ করিয়া স্ব স্ব কুলয়াতিমুখে ধাবিত
হইতেছে ।

এইরূপ ছুঃসময়ে থিরোদপুরের দক্ষিণে—একটি পলি চিত্রের প্রায় অর্ধ
ক্রোশ দূরে—প্রান্তর মধ্যবর্ত্তি স্থানে অবস্থিত একটি রাজবস্ত্র বহিয়া দুইটি
বন্দুকধারী যুবক পরস্পর বৈদেশীক ভাষায় কি কথা কহিতে কহিতে পূর্ব-
পশ্চিমাতিমুখে চলিয়াছে । উহাদিগের বেশভূষা বৈদেশীক শিকারীর মত ।
উহারা পরস্পর যে সকল কথাবার্তা কহিতেছে, তাহার প্রতি মনযোগ
করিলে, উহাদিগের চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি সম্পন্ন যুবক ব্যতীত আর
কিছুই মনে হয় নাই ।

সম্ভবতঃ প্রিয় প্রাকৃতিক মহাশয় ! আপনি কি উক্ত যুবকদ্বয়ের কথাবার্তা
শুনিবেন ? উহা কুরুচি সম্পন্ন, উহা না শুনাই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু না
শুনিলেও উহাদিগের চরিত্র বিকাশ আপনার নিকট কতক পরিমাণে ছুঁট
হইয়া পড়িবে । সুতরাং এরূপ প্রবণ—বোধ করি, দোষাবহ নাও হইতে
পারে ।

প্রথম যুবক বলিতেছে, “হ্যাঁ ! স্বীকার করি । কিন্তু এ—ও অসঙ্গত
বলিতে হইবে যে, তুমি যুবক, তোমার সহিত একজন বর্ধিয়সী জীলোকের
প্রেম তোমার পক্ষে—তোমার মত অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবকের পক্ষে, অতি অস্বাভা-
বিক ঘটনা, হ্যাঁ স্বীকার করি ! সে রূপসী,—তাহার রূপলাবণ্য অতুল ;
ইদানীং যুবতীগণের মধ্যে সে রূপ অঙ্গসৌষ্ঠব প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না ।
তাই বলিয়া কি আমাদের পছন্দ করিতে হইবে, তোমার সহিত তাহার এই

যুবক বন্দুক উঠাইল, নিবীহ পক্ষীটিকে লক্ষ করিল, ক্ষণমাত্র বিগ্ৰহে সব শেষ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হইল না। চঞ্চল পক্ষী শাখান্তর গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় যুবক ইহা দেখিল, দেখিয়া ঐ ধুষ্ট পলাতক শিকারকে মুহূর্তে শমনসদনে নিপাতিত করিবার জন্ত বাক্যশ্রোত ক্ষান্ত দিয়া পক্ষী হমনে মননিবেশ করিল, বন্দুক উঠাইল—লক্ষ করিল—দিগবিদিগ দৃঢ়স্ববে প্রতিধ্বনি করিয়া গুলি ছুটিল,—লক্ষ ব্যর্থ হইল—পক্ষি সভয়ে বিমানে উড়িয়া পলাইল।

প্রথম যুবক হো—হো—হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। পলাইত পক্ষীর প্রতি চাহিয়া তাহাকে বিজ্ঞপচ্ছলে বলিল, “ভাই আমার বোধ হইতেছে, ঐ পক্ষী উহার বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে। তৎপবে বলিল, লক্ষ করিবার সময় নিশ্চয়ই সেই প্রেমিকা রূপসী অলক্ষ প্রেমরজ্জু তোমার গলায় দিয়া টানিয়াছিল।”

দ্বিতীয় যুবক তাহার বন্ধুর কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই প্রাণভয়ে পলায়মান বিহগের গতি সত্য নথনে লক্ষ করিতে লাগিল। ইহার অর্থ, ঐ পক্ষি পুনরায় কোন বৃক্ষে আশ্রয় লইলে, নিমিষে তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটাইয়া তাহার পক্ষী জীবনের ক্লেশ অপনোদন করিবে। কিন্তু অবোধ পক্ষী তাহার হিতাকাজক্ষীর সৎ উদ্দেশ্য অবগত না হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল।

দ্বিতীয় যুবক তাহার মনোবথ সম্পূর্ণ বিফল হইল দেখিয়া, অম্মশোচন করিয়া বলিল, “বড় ফম্কাইয়াছে।”

এই সময়ে আর একটি দূর দর্শন সহসা তাহাদের পক্ষী-নিবিষ্ট-চিত্ত আকর্ষণ করিল,—তাহারা দেখিল, দূরগত দুইটি লোক তাহাদিগের দিকে আসিতেছে।

দ্বিতীয় যুবকের মুখ হইতে মুহূর্তে ক্ষুব্ধিত হইল, “কে দুইজন আসিতেছে না? উহাদিগের ভিতর একটি স্ত্রীলোক—অপরটি পুরুষ না?”

প্রথম যুবক বলিল, এইরূপ ত বোধ হইতেছে।

দ্বিতীয় যুবক একটু হাফিয়া বলিল, “এ কেমন সময় বল দেখি? একটা শিকার পলাইল, আবার একটি কেমন আসিয়া জুটিল? এ অবসর ছাড়া হইতেছে না।”

এই বলিয়া সে প্রথম যুবকের প্রতি চাহিয়া পুনরায় বলিল, “কেমন?”

প্রথম যুবক একটু মুচকিয়া হাসিল—বলিল, “প্রতিধ্বক আছে।”

দ্বিতীয় যুবক দৃঢ় মুষ্টিতে বন্দুক ধরিয়া অমনি বলিয়া উঠিল, “কোথা প্রতিবন্ধক ! আমবা কি উহাকে প্রতিবন্ধক মনে করি ! তবে বন্দুক ধরি কি প্রয়োজন ?”

ইহান উত্তরে প্রথম যুবক কিছুই বলিল না । পরন্তু উভয়ে কি পবামর্শ করিয়া আদুববর্তী একটি বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া লুকাইল ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।



“টুম্ কোন হায় ?”

তাহাদের বিকক্ষে পাপিষ্ঠেরা কি যড়যন্ত্র করিয়া বৃক্ষ অন্তরালে লুকাইল । তাহারা বহু দূর হইতে চািয়া আসিতেছে । তাহাদের মধ্যে একজন—যিনি জিলোক—অবগুঠনবতী,—তিনি পথশ্রান্তে অত্যন্ত ক্লান্ত । অপরটি—যেটি পুরুষ, তাহার পথশ্রমে কিছু ক্লান্তি বোধ হয় নাই । কিন্তু সে তাহার সহযাত্রী জিলোকটি পথশ্রান্তে না জানি কত কাতর হইতেছেন ভাবিয়া দারুণ মর্ম্ম গীড়াব শত বৃষ্টিক দংশনে অবিশ্রান্ত যত্নগা পাইতেছে । উভয়ে নিস্তক—নির্দাক কনের পুতলি মত চলিতেছে ; গুরু শ্বাস প্রদ্বাসে উভয়ের লঘু স্বাস্তি-শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে । কতক্ষণ পরে জিলোকটি, উভয়ের নিস্তকতা ভঙ্গ করিয়া কম্পিত কাতর কণ্ঠে বলিল, “চিনিবাস আর চলিতে পারি না পায়ে ফোঁকা পড়িয়াছে ।”

চিনিবাস মরমের যত্নগা মরমে বাঁধিয়া, কেবল মাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “মা আর একটু কষ্ট কবে এস । ঐ যে একটা গ্রাম দেখা যাইতেছে, ঐ খানে গিয়া আজিকার মত বিশ্রাম লইব ।” তাহাকে এইরূপ শাস্তনা প্রদানে আশ্বাসিত কবিতোছে, এমন সময় উক্ত যুবকদ্বয় বৃক্ষ অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদিগেব সম্মুখীন হইল । দ্বিতীয় যুবক চিনিবাসের গতি বোধ করিয়া বলিল, “টোম কোন হায় ? কিডার যাটা হায় ।”

চিনিবাস সহসা ঐ ছুটে সাহেবী চালবাজগণ কর্তৃক গমনে বাধা পাইয়া ও উক্তরূপ বাক্য ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসিত হইয়া গতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।—
কি উত্তর দিবে কিছুই স্থির কবিতো পাবিল না। পুনরায় দ্বিতীয় যুবক অব-
গুণ্ঠনবতী—ভয়ে জড়মড় লজ্জাবনত ক্রীলোকটির প্রতি অঞ্জলি নিবেদন
করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ইএ টুমার কোন হ্যায় ?”

সংক্ষুব্ধ চিনিবাস উত্তর কবিল, “জাজে—জাজে ইনি আমার মনিব—
মা হন।”

দ্বিতীয় যুবক বাগত স্বরে ধমকাইয়া বলিল, “ড্যাম লায়ার টুম্ ব্লট কয়টা
হ্যায়; হাম টুমকো পুলিসমে ডেগা।”

চিনিবাস বুঝিতে পারিল না—কি জহ—কেন, তাহাকে পুলিসে দিবে—
সে কি দোষ কবিয়াছে। আরও থতমত খাইল, “আমি—আমি—সাহেব।”

“চোপরাও বডমাস! টুম্ জানটা নেই, ডুম্বাকা ওরাট লেকে ভাগা
যাটা হ্যায়। পুলিসমে টুমকো জবাব ডেগা।”

ছুর্ত এই কথা বলিয়া সেই কম্পানিত কলেবরা অবগুণ্ঠনবতীর বস্ত
ধরিবার উদ্যোগ করিল।

চিনিবাস ছুর্তার পাপ মুখ নিম্নত এই অভাবনীয় নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া
এবং উহার বিশদৃশ্য অসহনীয় ছর্ব্যবহার দেখিয়া, চিনিবাস স্তম্ভ উৎথিত
সিংহের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া শৈশ্যচূতা হইল; স্বকোমর বোঝা দ্বরে নিষ্ফল
করিয়া রোষ কষাইত চক্ষে—দশনে দশন নিম্পেসিত করিয়া লক্ষ লোদানে
দ্বিতীয় যুবকেব উপর পতিত হইল—সবলে তাহাকে ধরিয়া ভূপাতিত করিল—
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য চিনিবাস বাহু দ্বারা তাহাব শ্বাস বোধ কবিবার উপক্রম
করিল।

সহসা ঈদৃশ্য কাণ্ড বিপর্যয় দেখিয়া প্রথম যুবক, কিছুমাত্র চিন্তায় কাণ-
ক্ষেপ না করিয়া চিনিবাসকে গুলি কবিল;—মহাশব্দে চতুর্দিক মণ্ডিত হইল,
পক্ষি সকল প্রাণতয়ে বৃক্ষ ছাড়িয়া কলরব করিতে করিতে আকাশে উড়ায়মান
হইল, দিশাহারা অবগুণ্ঠনবতী দারুণ আতঙ্কে সংজ্ঞা হারাইয়া ভূমি চূর্ণন
করিল। বিষম আঘাতে চিনিবাস উলটিয়া পড়িল,—মুহুর্তে এই সকল ঘটিল।
প্রতিহিংসায় উত্তেজিত বশতঃ চিনিবাস ছুইবার উঠিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু
পাবিল না। দারুণ আঘাতে—রোষে ক্ষোভে, মুহুর্তে অনগল রক্তস্রাবে,
চিনিবাস—অনাধিনী প্রভুবনিতাকে বিপদ সাগরে নির্মজ্জিত করিয়া চেষ্টনা

হারাছিল। তারপর কি হইল। তারপর ভবিষ্যতের দুর্লভ্য বিধানের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে চলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

—❦—

“রামু ওটা কি !”

সেই বিজন রাজবাঘে রক্তাক্ত কলেবরে ধূলায় ধূসরিত হতভাগ্য চিনিবাস এখনও সংজ্ঞাহীন। অনবরত প্রাকৃতিক প্রাণধ্বংস ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে চিনিবাসের চৈতন্য সঞ্চারিত হইল। উদ্দেশ্যের গুরু আঘাত জনিত যন্ত্রণা অনুভব করিল। মুহূর্ত্তে বিগত বিপর্যয় দুর্ঘটনার কথা স্মৃতিপথে আকৃষ্ট হইল, অতিরিক্ত রক্তশ্রাবে দুর্ব্বল চিনিবাস মুহূর্ত্তে বিছাত্তাড়নে উঠিয়া বসিল, চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিল ঘোর অন্ধকার কেহ কোথায় নাই। অগ্নি আকাশ ভেদী চীৎকার শব্দে ডাকিল—মা—ওমা !! প্রতিধ্বনি বিজ্ঞপচ্ছলে ডাকিল, মা—ওমা !! চিনিবাস অর্ধৈর্ষ্য বেগে উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল কিন্তু পারিল না, বিষম যন্ত্রণায় উদ্বেগ আকুলিত দাক্ষিণ মর্ম্ম পীড়ায় পাশাণে অশ্রু বাহির করিয়া, ভূমে পড়িয়া চিনিবাস আবার সংজ্ঞা শূন্য হইল।

ইহার কতক্ষণ পরে দুইজন পথিক লণ্ঠন হস্তে নিম্নতর রাজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই দিকে আসিতেছিল। তাহাদের হস্তাশ্রিত দোহল্যমান লণ্ঠন নিম্নতর ক্রীড়ামীল চঞ্চল আলোক হতভাগ্য চিনিবাসের রুধির কর্দমাক্ত অসাড় অচেতন দেহে প্রতিফলিত হইল। পথিকদ্বয় সম্মুখে চমকিয়া দেখিল, “রাম ওটা কি একটা মড়া নয় ?”

রাম একটু হেট হইয়া অপেক্ষাকৃত লণ্ঠন উজ্জ্বল করিয়া স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে সম্মুখে বিকৃত স্বরে বলিল “হ্যাঁ কতটা মশাই। একটা মড়া, এখুনি

কে খুন করিয়া গিয়াছে ! এখানে আর আমাদের থাকিবার দরকার নাই, শীঘ্র চলুন, শীঘ্র চলুন !”

“না না, কিছু ভয় নাই ; তুমি আঘোটা আর একটু জুগিয়া পর দেখ ?”

এই বলিয়া কর্তা মশাই, আর একটু নিকটে গিয়া দীর্ঘ অননত হইয়া দেখিলেন, শরীরের প্রধান প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আঘাতের কোন চিহ্ন নাই । তবে হাঁটুর নিকটে একটা আঘাতের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে । কিন্তু উহা সাংঘাতিক নয় ;—অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ধমনী ক্ষীণ হওয়াতে অচেতন হইয়াছে, বুঝিলেন । নামিকায় হস্তার্পণ করিয়া জানিলেন, দীর্ঘ ধাম বহিতেছে,—হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে গাত্রে হস্ত দিয়া তাপ অনুভব করিলেন ।

বুদ্ধ কর্তা মহাশয়, আনন্দে উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “রামু এ লোকটি এখনও বাঁচিয়া আছে । তুমি এক কাজ কর, আমার এই লাঠিটি ধর ; একে বাড়িতে লইয়া যাইতে হইবে । রামু বিনা বাক্যব্যয়ে বুদ্ধের হস্ত হইতে লাঠি লইল, মনে মনে একটু বিরক্ত হইল ;—বাবু আমাদের চিরকালটা এমন, মিছামিছি পরের ছাপা সামলান কেন ?

বুদ্ধ কর্তা মহাশয়, সামর্থ্যে নবীন যুবা ; অবলীলাক্রমে চিনিধানের কথিরা-প্লুত সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভুমি হইতে উঠাইয়া ক্ষকোপরি স্থাপন করিলেন । তৎপরে রামুকে আগে যাইতে কহিয়া আপনি তাহার পশ্চাৎবর্তী হইলেন । উভয়ে ছ এক পদ অগ্রসর হইয়াছে ; এমন সময়ে রামু লঠন আলোকে দেখিতে পাইল, একটি বোঁচকা পথের ধারে পড়িয়া আছে । রামু বলিল, “কর্তা বাবু একটা বোঁচকা, বোধ হয় এই লোকটির হইবে” ।

কর্তা মহাশয় বলিলেন, “তুমি ওটা যাড়ে কর ।”

রামু বোঁচকাটি ক্ষক্কে করিল । তৎপরে উভয়ে নিঃশব্দে নিজ স্থানাভিমুখে গমন করিল ।

—

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।



“তোমার ভাবনা কি ?”

এক সময়ে সে সরমের গণ্ডাদেশে বিরানিসিকা ওজনের চপেটাঘাত করিলে, অন্তরে অন্তরে অধীর হইত,—তবু মুখ হইতে টুশকটি বাহির হইত না । এখন সেই সরমের দিদিমার অন্তে, ঘটনা-বৈচিত্রে তাহার মুখ ফুটিয়াছে ; স্পষ্ট হউক বা অস্পষ্ট হউক, সময়ে ছ কথা বলিতে পাইলে, ছাড়িয়া কথা কয় না । ইহা সাময়িক অবস্থাওণে ও সঙ্গত মন্দ অভ্যাসের অবসম্ভাবি ফল ।

আজ কি কারণে সরম, তাহার আশৈশবের ভালবাসা ইন্দুবাবুকে মিষ্ট মিষ্ট স্পষ্ট অস্পষ্ট ছই কথা শুনাইয়া দেয় । ইন্দুবাবু একটু,—একটু কেন ? বিলক্ষণ রংচঙ্গে ছিলেন । এই ছ কথা তাহার প্রাণে অসহ্য বোধ হইল ; তিনি সরমকে কেবল উত্তম মধ্যম দিতে থাকি রাগিয়া—(কএকজন ভজলোক ছিলেন বলিয়া সামলাইয়া)—“তোমার এখানে মূত্র পরিত্যাগ করিতেও আর আসিব না—যদি আসি তাহা হইলে আমি”—একটা ভয়ানক উৎকট প্রতিজ্ঞা করিয়া ইন্দুবাবু চলিয়া গেলেন ।

এই ব্যাপারে ধ্যানভঙ্গ হইয়া অপর ঘরের একটি কামিনী, তথায় আসিয়া সরমকে তাহার উপরওয়ালার গিয়ার মত বেশ মিষ্টি মিষ্টি বুকুন দিয়া বুকাইতে লাগিল,—“সমন করিয়া কি মানুষের সহিত কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে ত মানুষের মন বিগড়াইবে, এ ধরা কথা । যা করিতে হইবে, আগে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিও—পরামর্শ লইও ;—তোমার পৃষ্ঠপোষক দিদিমা আছে যে, ‘মেও’ সামলাইবে ? সে কাল গিয়াছে, এখন তোমার ভার আমাদের ঘাড়ে পড়িয়াছে ।”

অসম্ভববাবু ঐ বুকুনীওয়ালির মধুর বুকুনী পশ্চাতে রাখিয়া সরমকে বলিলেন, “সরম ইন্দুবাবুকে তুমি ও কথা না বলিলেই ভাল করিতে ।”

সরম ধীরে ধীরে ঈষৎ কম্পিত মিহি নরম স্বরে বলিল, “আমি এমন কি অমন্দ কথা বলিয়াছি ;—তোমাকে আমার সেই রকম গাধা গাভাজ

করায়—আমি তাহাকে নিষেধ করিয়াছি বহুত নয়। ইহাতে তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ?—গেলেন ।”

সরমের এই কথার উপর কথা চড়াইয়া সেই দুকনীওয়াশি স্ত্রীলোকটি কহিল, “ও কথা বলিলে কি বোন, এখনকার বাজারে কাজ চলে। হাজার হ'ক তুমি ছেলে-মানুষ, তাই ও কথা বলিতেছ ।”

“না দিদি তুমি জান না, আজ কয়দিন হইতে ও বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। দিন ‘চারেক’ হইল, অসিদ্ধবাবুর বাড়ি হইতে একটি লোক আসিয়াছিল, তাহাকে অনর্থক কতকগুলো কথা বলিয়া তাহার মনে কষ্ট দিয়া তাহাকে বিদায় করে; সে কথা যাক। আজ আবার অসিদ্ধবাবুর সাহিত মিছামিছ ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টায় ছিল,—অসিদ্ধবাবু বড় ভদ্রলোক; তাই তাহার কথায় কান না দিয়া উহা হাসিয়া গায়ে মাখিল। সে দিন ঝগড়া বাধাইয়া কি কাণ্ডটা না ঘটাইল। তবু আবার সেই ?—এইরূপ দিন দিন হইলে কত সহ্য করা যায় দিদি ? আর আমি যখন ‘বেশা’ !—তখন যাহাকে আমার ইচ্ছা—যিনি আমার মনমত, তিনিই আমার কাছে থাকিবেন; তাহাতে উহার চক্ষু ‘টাটায়’ কেন ?—ও ঠাট্টার ছলে একে (অসিদ্ধবাবুকে দেখাইয়া) আমাকে যখন তখন ছ—কথা শুনাইয়া বিরক্ত করিলে কেন ?”

ইহার উত্তরে সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, “ও বোন পুরুষের সমস্যা,—তা ও যে রকম খুসি, ঠাট্টা করুক না কেন। তুমি ওর কথায় কান না দিলেই পারিতে। আর ও যখন বরাবর ছ—পয়সা দিয়া আসিয়াছে, তখন ছ—কথা বলিতে পারে। ইহাতে বোন, তুমি কোন কথা না কহিয়া, সহিয়া থাকিলেই বড় ভাল হইত ।”

সরম ইহার উত্তরে কোন কথা যোগাইতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অসিদ্ধবাবু ইহাদের উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন কি না বলিতে পারি না; তবে তিনি সরমের কাচ ফুটকুটে মুখখানির প্রতি অনিমেয় নয়নে চাহিয়াছিলেন; আর দেখিতেছিলেন, তাহার কথোপকথন কালিন সূচিকণ মধুর লালিত্য পরিপূর্ণ মুখ-ভালমায় ক্ষণে ক্ষণে যে মাধু্যাময় কুণ্ডিত রেখা সকল ভাসিয়া উঠিয়া পুনঃ লয় পাইতেছিল—যাহা অসিদ্ধবাবু দেখিতে বড় ভালবাসিতেন,—বড় পছন্দ করিতেন, যাহা দেখিয়া তিনি মজিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া তিনি সরমের দৃংথ অপসারণে তৎপর হইতে গিয়াছিলেন, যাহা

দেখিয়া তিনি প্রাণে প্রাণে কি এক পকার সুখ উপলব্ধি করিয়া আপনাব অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতেন, তাহাষ্ট দেখিতেছিলেন। আর বোধ হয় ভাবিতে-ছিলেন,—বিধি এ ছেন স্নানব কুসুম সনে স্ত্রীহীনকারী ছরসু কীট মঙ্গ মিলাইল কেন? সবম যখন অসিদ্ধবাবুর অতৃপ্ত দর্শন-লালসায় বাধ্যত জন্মাইয়া নীবব হইল। তখন বোধ হয় অসিদ্ধবাবু আবার তাহার গেঠি ভাব পুন উদ্বীপিত করিবাব জন্ত বলিলেন, “সবম আমি যতক্ষণ আছি তোমার ভাবনা কি!”

কিন্তু অসিদ্ধবাবুর আশা পূর্ণ হইল না, সরম নীববই রহিল, কেবল তাহার বিলোল কটাক্ষপূর্ণ আয়াত লোচন—যাচা অসিদ্ধবাবুর পক্ষে সাংঘাতিক তাহা। তাহার প্রতি একবার উঠিয়া আবার অবনত হইল।

ঐ বুক্‌নিওয়ালি জীলোকটি অসিদ্ধবাবুর ঐরূপ কথা শুনিয়া তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, “তাত বাস্তবিক কথা, আপনাবা যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ সরমের আবার কিসেব ভাবনা? ভদ্রলোকের কথাই তাই। আর এক জনেব কাছে যে চিরকাল থাকিতে হইবে,—এমন কিছু কথা নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। * * * * *

প্রিয় পাঠকমহাশয়! এষ্ট মসেলাদার বুক্‌নিওয়ালি সবমকে বিনামূল্যে বুক্‌নী কেন যোগাইত জানেন?—ফাঁকের ঘবে—এই ফুরসোতে ছুইটা মিষ্টি কথায় প্রাণের ভাব দেখাইয়া, যদি এহ বেওয়ারিস্ মান তাহার পাট্টা-ভুক্ত কবিত্তে পারে, তাহা হইলে শেষ কালের আখির যোগাড় থাকবে। কিন্তু নিদারুণ বিধি টহাব প্রতি বাম;—বিনামূল্যে মসেলাদাব বুক্‌নি বেচিয়াও কিছু কাবতে পারে না। কেন না, এই বেওয়ারিস বদমায়ে বিস্তর গোল-যোগ ছিল। তবু বুক্‌নিওয়ালি আশায় জগাজগি দিতে না পাবিয়া, সবুরে মেওয়া ফলে এহ আশায় আশ্বাসিত হইয়া নিত্য বুক্‌নি বোঁচত।

যাই হ’ক উহাব ঐরূপ ‘বেথাগা’ সওদাগিরি চালে, সরমের ঘরের ভদ্রলোক-গুলি বড় বিবস্ত্র হইত, আজও হইল, আর আমোদের ব্যায় ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। স্মরণ্য এই পাঁচ কারণে তাহাবা যে কয়জন ছিলেন; সকলে একে একে প্রস্থান করিলেন। বহিলেন কেবল অসিদ্ধবাবু। ঠিক এই সময়ে একটি কৃষ্ণকার মনবেশী বর্ণাক্ত কলেবর ভ্রাক্ষণ, কতিপয় জনের উপযুক্ত অন্ন বাজনাদি উপাদেয় ভোজ্যবস্তু লইয়া সবমের কক্ষে প্রবেশ করিল ও বিনা বাক্যব্যয়ে তদ্রসামগ্রী বণাস্থানে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। সরমের দিদিমার মৃত্যু

পব হঠতে ঠেন্দুবাবু বন্দোবস্ত অনুযায়ী সরমেব আহারীয় সামগ্রী নিত্য যথা-সময়ে হোটেল হঠতে আগিত ; অন্যও আসিল । তবে উহার যে পরিমাণ প্রচুর্য দেখা যাইতেছে, তাহা চূড়ান্ত আমোদের কয়দিনের উপরি বন্ধুবান্ধব-গণের শুদ্ধ ।

যাই হ'ক ; আহাবের সময় আগত দেখিয়া, সবম অসিদ্ধবাবুকে বলিয়া, “আব কেন, বেলা হইয়াছে, চল স্নান করি গিয়া ।”

অসিদ্ধবাবু বলিলেন, “চল” ।

তৎপরে উভয়ে প্রস্তুত হইয়া নিম্নতলে—কলে স্নান করিতে গেল । অসিদ্ধবাবু আমোদভরে সবমকে বক্ষে তুলিয়া ভবা চৌকাছায় লক্ষ্য প্রদান করিলেন ; সবম মুখভরা হাসি মুখে মৃণামভূজে অসিদ্ধবাবু কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল ; জল চতুর্দিকে উচ্চিয়া পড়িল । এইরূপ রঙ্গ-রসে স্নান করিতে করিতে অসিদ্ধবাবু মহা ভাবান্তর ঘটিল । সবম সেই ভাবান্তর সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি মহা বিসন্ন হইলে যে ?”

অসিদ্ধবাবু একটু ক্ষুণ্ণ মনে টানা টানা কথায় বলিলেন, “দেখ সবম আজ কয়দিন হঠতে আমি বাড়ি ছাড়া, হঠাৎ এ কথাটি মনে পড়িয়া মনটা কেমন চমকিয়া উঠিল ।”

“ওঃ তাই ! আচ্ছা তাহার জন্ত কি, আহাঙ্গানি করিয়া একটু বিজ্ঞামেব পর যাইও ।”

তৎপরে এই পরিচ্ছেদে যাহা ঘটয়াছিল, তাহা সবিশেষ বর্ণন অনাবশ্যক ; ইহা বিবৃত থাকিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অসিদ্ধবাবু সরমের কথা অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছিল ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

— ❦ —

“বড় অলৌকিক স্বপ্ন !”

অসিজবাবু বাড়ি আসিয়া বামুনগিন্নির মুখে শুনিলেন যে, সে তাঁহার আশাপথ চাহিয়া শেষে নিরাশায় অধীর হইয়া অভিমানভরে ব্যথিত প্রাণে চানবাসের সহিত তাঁহার মায়ের নিকট চলিয়া গিয়াছে । অসিজবাবু ইহা শুনিয়া যার পর নাই বিস্মিত আশ্চর্যান্বিত হইলেন, তাঁহার বিনামূল্যে— তাঁহাকে ঘুনাকবে না জানাটয়া শুনাইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া এঠরূপ ভাবে যাইবে বা যাইতে সাহস করিবে ; অসিজবাবু পূর্বে ইহা কদাচিত মনে করেন নাই । এখন ইহা মনে করিয়া অসিজবাবু লগাটপ্রান্তে কেমন এক অজানিত ছশ্চিন্তা বেথা অঙ্কিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে সেই চ্চিন্তায় তাঁহার বদনমণ্ডল বিষাদ কালিমায় ঘোর আঁধার হইয়া আসিল । হৃদয়খানি কি এক হতাশপূর্ণ শিথিলতায় তাঁহাকে অবসর প্রায় করিল ; তাঁহার সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহখানি শয্যাতে এলোমেলি পড়িল । শাস্তিত অবস্থায় চিন্তাঘোরে তজ্রাবিষ্ট হইয়া অসিজবাবু ঘুমাইয়া পড়িলেন ।

বামুনগিন্নি অসিজবাবুকে নিজাগত দেখিয়া কক্ষ বহির্ভাগে প্রস্থান করিল ।

অসিজবাবু এই সময়ে একটি অলৌকিক স্বপ্ন দেখিলেন ; স্বপ্নটি বড়ই আশ্চর্য্য । তিনি একটি মহাসমুদ্রের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র দ্বীপে দণ্ডায়মান হইয়া আগ্রহভবে মহাসমুদ্রের শান্তিময় গভীর বিরাট দৃশ্য দেখিতেছেন, যে দিকে নয়ন ফিরান, সেইদিকে দেখিতে পান, লোমাঞ্চকারী মর্ম্মস্পর্শি গাঙ্গুীরাময় মহান্ দৃশ্য । অসিজবাবু স্তম্ভিত হইলেন, পুলকে তাঁহার প্রাণ ভরিয়া গেল, কি এক অপ্রতীক্ষিত অপূর্ব প্রাতিমধুর শব্দ তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল, ক্ষুদ্র অসিজবাবু নিজ আস্তিত্ব ভুলিয়া গেলেন, অসিজবাবুর দিবা চক্ষু ফুটিল, এই-বাব তাঁহার নয়নপথে আর একটি অপূর্ব দৃশ্য পতিত হইল—পুরুষ-প্রকৃতিরূপ ছুই প্রেম মুহূর্ত্তমান যুগল মূর্ত্তি সামান্য তৃণশূন্য অবলম্বন করিয়া খর স্রোতে এক টানে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে । কি প্রীতিপূর্ণ সুন্দর যুগল দর্শন ?

যেন ছুজনা ছুজনা'র ভাবে প্রেমাগোষে বিভোব ; যেন দুই জনাষ্ট এক--একট ছুই মূর্তি । কি শাস্তিময় সুন্দর শ্রীতিদর্শন যুগলমূর্তি । অসিদ্ধবাবু তন্ময় চিন্তা ঠীত দর্শনে নিবিষ্ট,—একাগ্রচিত্তে বিমোহিত । তিনি সহসা একটা দম্কা বাতাসে একাগ্র হারাইয়া সচমকে দেখিলেন, দূবে—মাল্লগর্ভে—আকাশ পাদপ্রান্তে—যেখানে বিশাল অন্তলম্পর্শি জলধীর ঘন নীলিমার স'তত, বিরাট অনন্ত আকাশের সুনির্মল নীলিমার একত্র সংযোগ—সেইখানে একটা প্রকাণ্ড পর্বতাকার ঘন কালাস্তক মেঘ-ছবি—যাহার কোলে চপলা বিজলী চিক্—চিক্ হাসিতেছিল । ক্রমশঃ দেখিতে দেখিতে সেই ভীম দৃশ্য প্রকাণ্ড মেঘখানা ; দৃশ্য মনোহর নীল নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, দেখিতে দেখিতে তাহার বিরাট প্রতিবিম্ব, সুনীল জলধীর নীলিমা হরণ করিল ; ক্ষণেকে সেই শাস্তিপ্ৰদ শ্রীতি পারপূর্ণ দৃশ্য মহান তমসাক্ষর ভীষণ দৃশ্য বিভিষিকায় পরিণত হইল । ক্ষুদ্র অসিদ্ধবাবু এই প্রাকৃতিক প্রলয় দৃশ্য দেখিয়া মুর্ছিত হইলেন ।

অসিদ্ধবাবু মুর্ছা ভঙ্গে ভীত, চকিত হইয়া দেখিলেন, ভীষণ প্রলয় ঝটিকা মহা শব্দে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া মহা সমুদ্র মস্থন করিতেছে । কি ভয়াল স্মৃতিবল্লমকারী বর্ণনাতীত প্রলয় দৃশ্য । ঐ্যা ! ঐকি ! সেই প্রেম-মুহমান পুরুষ-প্রকৃতাকপ যুগল মূর্তি পরস্পর বিচ্ছিন্ন । গগনস্পর্শি উত্তাল প্রলয় তরঙ্গাঘাতে তাহাদিগেব অবলম্বিত তৃণগুচ্ছ ছিন্ন হইয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন । তাহারা মহা ঝটিকাঘাতে কড় উত্তাল উচ্ছৃঙ্খল তরঙ্গশিখরে, কড় উদঙ্গ-তলে, কড় গভীর জলতলে, আবার কড় বা তরঙ্গের উচ্চ শিখরে উঠিতে নামিতেছিল ।

এখন তাহাদের আর সে সামান্যমূর্তি নাই, তাহা কেমন এক প্রকার উদ্ভ্রান্ত ব্যাকুলতাময় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের ভিতর একটি আশ্চর্য ভাব দেখা যাইতেছে ; তাহা পরস্পরের মিলনেচ্ছা । তাহারা উভয়ে বিপুল আশায় বুক বাঁদিয়া প্রাকৃতিক প্রলয় বিদ্রাটের সহিত তুমল যুদ্ধ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে ধরিতে যাইতেছে । এখন ইহাদ্বয়ের কোন অবলম্বন নাই, কেবল তাহারা পুরুষাকার অবলম্বনে অবলম্বিত । আচ্চা ! ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র প্রাণে কত জুঝিবে ? তাহারা ক্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত, তাহাদের তত্ত পদ শিথিল, স্বাস-রুদ্ধ প্রায় । কিন্তু তবুও আশায় বুক বাঁদিয়া জুঝিতে প্রয়াস । ধল পুরুষাকার, ধল একাগ্রতা । উভয়ের মধ্যে আর অল্প মাত্র ব্যবধান আছে । এমন সময়ে প্রাকৃতিক্রূপা রমণী একেবারে বিকল হইয়া পড়িল ; সে একবার

হত্যাশ মমানে হত্যাশ প্রাণে পুরুষের প্রতি চাহিল। পুরুষরূপী মনুষ্য ক্রান্তহৃদয়ে বিপুল বল পাইল, বিপুল বলে বাহু দ্বারা মহাসমুদ্রের বিপদায় উত্তাল তরঙ্গ উপেক্ষা করিয়া, তাহার আঘাত অমান বদনে সহ্য করিয়া প্রকৃতিরূপা রমণীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে ছুটিল, ধরে—ধরে এমন সময়ে সব ফুটাইল।

“আ—মা—মা—ম—”। হত্যাশ রমণীর গুহ্র জড়িত কর্ণে, এই কএকটি কথা বিনির্গত হইতে না হইতে সব ফুটাইল—সে ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও তাহাকে ধরিতে ডুবিল, এককালে সব ফুটাইল। অসিদ্ধবাবুরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। অসিদ্ধবাবু দারুণ চীৎকার করিয়া শয্যাভুলে উঠিয়া বসিলেন।

বামুনগির্গি বিবলে আপন মনে আকাশকুসুম রচনা করিয়া স্মৃৎসাগরে ভাসিতেছিল, অসিদ্ধবাবু ঐ দিকট চীৎকারে সে চমকিয়া উঠিয়া, ভরিত পদে তাঁহার কক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার মনিব শয্যাভুলে বসিয়া হীনজ্যোতিসম্পন্ন ব্যাকুলিত নয়নে কক্ষের চতুর্দিকে কি যেন অন্বেষণ করিতেছেন।

বামুনগির্গি ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “দাদাবাবু, অমন করিতেছেন কেন?” কি হইয়াছে! চীৎকার করিয়া উঠিলেন কেন? কিছু স্বপন দেখিয়াছেন বুঝি।”

“হাঁ। বামুনগির্গি, স্বপ্ন—স্বপ্ন!! বড় অলৌকিক স্বপ্ন; এ স্বপ্ন বোধ হয়, কেহ কখন দেখে নাই। এষ্ট স্বপ্ন দেখে আমার প্রাণে কেমন একটা আতঙ্ক হইতেছে, যেন এই স্বপ্ন আমার কোন ভাবী বিপদের পূর্ব লক্ষণ যেন”—আরও কি বলিতে মাইতেছিলেন। এমন সময়ে বাহির হইতে উপযুপবি কাহাব ডাক শুনিয়া থামিলেন। তৎপরে জানিলেন ডাক-হরকরা পত্র আনিয়া এইরূপ ডাকাডাকি করিতেছে।

অসিদ্ধবাবুর অনুমাত্র আগে বামুনগির্গি ডাক-হরকরার নিকট হঠতে একখানি পত্র আনিয়া অসিদ্ধবাবুর হস্তে অর্পণ করিল।

পত্রখানি কোথা হঠতে আসিয়াছে জানিবার নিমিত্ত লেফাপাব উপবি অঙ্কিত মোহর দেখিলেন; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, সবই অস্পষ্ট। বিরক্তি সহকারে লেফাপার কিসদংশ চিন্ন করিয়া স্তরবদ্ধ পত্রিকাখানির স্তরোন্মুক্ত করিয়া নয়ন সমক্ষে স্থাপন করিয়া দেখিলেন, পত্রখানি বিরোধপুর হইতে আসিয়াছে।

জানি পাবিছনি । — জীবনচক্র দত্ত কতক প্রণীত ও প্রকাশিত । ১৭৩১ নং কর্ণওয়ালিস্ ট্রীট, ভারত-দর্পণ প্রেসে মুদ্রিত ।

অপরিচিত স্থান হইতে—পত্র কে লিখিয়া ? অসিদ্ধাবু কোন্স্থান হইতে হইয়া বিস্ময় উদ্বেগ বিক্ষোভে নয়নে আগ্রহভবে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন ; যতই পাঠে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বদনমণ্ডলে ও নয়ন-পলকে অশ্রুত সমাচানের পূর্ণাভাব স্পষ্টই প্রকটিত হইতে লাগিল । অসিদ্ধাবু দাকণ চিত্তবিপাট-বাটিকা দমিত কবিতা কোন বকমে পত্র পাঠ সমাপ্ত করিলেন । অসিদ্ধাবু পাঠিত সংবাদেব মস্ত সমস্ত বুঝিলেন—সমস্ত অবগত হইলেন । মনে করিলেন, ইহা কি যথার্থ—এত শোচ—এইখানেই কি আমাব আশা, ভরসা ও স্নেহের পাবিসমাপ্ত হইল ?—না !—না ! আমার বুদ্ধিবাব ভয় । বোধ হয়, আমাব মানসিক অসুস্থতা নিবন্ধন চক্ষুর দোষ প্রযুক্ত পত্রোন্নিখিত সংবাদ এইরূপ পড়িয়া থাকিব । এইরূপ মনে কবিতা উভয় হস্ত তালুকায় নয়নযুগল বেশ কাবয়া মুচিয়া পত্রখানি আবার পড়িলেন, কিন্তু সেই একইরূপ পড়িলেন । তবু কেমন যে মনেব দুঃখলতা পত্রোক্ত সংবাদ তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য হইল না । মনে করিলেন কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি শত্রুতা সাধনোদ্দেশ্যে বোধ হয় এইরূপ মিথ্যা সংবাদ লিখিয়া থাকিবে । মুহূর্ত্তকালে এইরূপ নানা মন্দিহান চিন্তায় তাঁহাকে অত্মমনস্ত করিল । তিনি আর একবার চিন্তাখন অত্মমনস্ত পত্রখানি পাঠ করিলেন । এইবার পত্র দুর্ব্বোধ হইল এবং কি এক অসুখবদাহি বিষম যজ্ঞায় যুবক অসিদ্ধাবু একেবারে অস্থির হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয়্যাকোণে ঢলিয়া পড়িলেন ।

এতক্ষণ বামুনগিন্নি নোবে দাঁড়াইয়া অসিদ্ধাবুর পত্র পাঠ বঙ্গলীন তাঁহার ভাব বৈকল্য দেখিয়া, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আসিয়াছে, এইরূপ স্থির কবিতা তাঁহার মানসেব বৃত্তান্ত জানিবাব জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু উৎকণ্ঠা দূর কবিতো না গাবিতা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া কষ্ট ভোগ কবিতোছিল ; এখন অসিদ্ধাবুকে জেদূষ ভাবে শয়ন কাবিতো দেখিয়া উৎস্রুকাচিতে মহমা জিজ্ঞাসা করিল, “দিদিবাবু কি কোন অমঙ্গলোব কথা লিখিয়াছেন” ?

“না না—এ গত্র তিনি লেখেন নাই । এ পত্রোব বিষয় পরে—তোমাকে বলিব । তুমি এখন একটু বাহিরে গিয়া বস ।”

কি করিলে, বামুন গিন্নি অসিদ্ধাবুর হৃদয় গল্গল্যায় আনন্দা সঙ্গে বাহিরে বাহিতে বাধ্য হইল । ইহাতে বামুন গিন্নি বড় কষ্ট বোধ হইতে লাগিল—ব্যাপাবটা কি জানিতে পাবিল না । কিন্তু বামুনগিন্নির অদৃষ্ট স্নেহসম বলিতে

হটবে; কারণ এইরূপ করে তাকে অধিককাল ভোগ করিতে হয় নাই ।
অসিদ্ধবাবু পুনরায় তাকে ডাকিলেন, — বলিলেন, “একটু জল আনিয়া
আমার মাথায় দাও ।”

বামুনগিন্নি তাহাই করিল । পরে আর থাকিতে না পারিয়া, স্ত্রীবিধা
বুঝিয়া পত্রোক্ত বিবরণ পুনরায় জানিতে চাহিল ।

অসিদ্ধবাবু চিত্তের অস্থিরতা নিবন্ধন বলিতে অনিচ্ছুক ; কিন্তু বামুনগিন্নির
আগত্যাভিযা দেখিয়া উক্ত বিবরণ সংক্ষেপে বলিলেন, “আমার সর্বনাশ
হইয়াছে, পথিমধ্যে চিনিবাস দস্যুর হস্তে পড়িয়া ভয়ানকরূপে আহত হইয়া
কোন ভদ্রলোকের আশ্রয়ে আছে ; আর—আর—”

আর বলিতে অসিদ্ধবাবুর রমনা জড়াইয়া আসিল, বামুনগিন্নি অমনি
তাঁহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আর কি !—দিদি-
বাবুর কি কোন ?”—

“তাঁহার কোন খোঁজ নাই ।”

বামুনগিন্নি এই কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত ।

অসিদ্ধবাবু উন্মাদ ব্যাকুলিতের ছায় অনুভূত করিয়া বলিলেন, “বামুন-
গিন্নি ! এ সংবাদ গাইবার আগে বজপাতে আমার মৃত্যু ঘটিলে, আমি
যার পর নাই স্থখী হইতাম ।” অসিদ্ধবাবু বিনাদে লজ্জাবনত নীরে নীরব
হইলেন ।

বামুনগিন্নিও তাহার তরঙ্গায়িত মনে অসিদ্ধবাবু বিয়াদাবনত চিহ্নান্বিত
বদনমণ্ডলোপরি নয়ন রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—❧—

“অত বড় কি মানুষ হয় ?”

শ্রীমদ্রোদপুত্র গোমে রামদয়ালবাবুর বাড়ি। বাড়িটা তিন মহলে বিভক্ত, —প্রথম ঠাকুর মহল, দ্বিতীয় সদর-মহল, তৃতীয় অন্তর-মহল। ঠাকুর মহলে শ্রীশ্রী ৮ শালগ্রামসী চণ্ডামণ্ডপে ক্ষুদ্র রৌপ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে পাশস্ত পারিকান পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ। রামদয়ালবাবুর রূপায় প্রত্যহ অনেক দীন দুখী এই প্রাঙ্গণে বসিয়া মন্ত্ৰটোঁটোঁ শালগ্রামজীর প্রসাদ ভোজন করিয়া আনন্দে ছুই ছাত ভুলিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে চালায়া যায়। ইহা ব্যতীত বৈকালিক ধর্মসংকীর্্তন, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ইত্যাদি নিত্যব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। সদর-মহলে অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ আনন্দে সচ্ছন্দে বসবাস করে। এই সদর মহলে একটা বড় ঘরে সুপ্রশস্ত কাষ্ঠাসনে শতরক্ষি যুক্ত পবিত্র পরিচ্ছন্ন ফরাস। ফরাসের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গণের মধ্যস্থত স্থানে বড় বড় দুইটি ধানের মরাই—পাশাপাশি অবস্থিত। আরও দুইটি গৃহ প্রাঙ্গণের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত; তাহার একটি ভাঁড়ার অপরটি আশব গৃহ। অন্তরমহলে অঙ্গপূর্ণা সদৃশ গৃহলক্ষী—শ্রীমত বিরাজমান।

এখন প্রাতঃকাল। সদর-মহলের ফরাসোপরি চিনিবাস শায়িত। রামদয়ালবাবুর বিশেষ যত্নে সেবা শুশ্রূষায় চিনিবাস এখন কথঞ্চিৎ সুস্থ। অতি প্রত্যুষে চিনিবাসের নিদ্রাত্তপ্প হইয়াছে। তজ্জাত চিনিবাস শয়্যায় শায়িত। কারণ রামদয়ালবাবু বলিয়া দিয়াছেন আর দুই একদিন না উঠিয়া কিঞ্চৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া শায়ত অবস্থায় থাকিলে, উরুদেশের ক্ষতস্থান আরোগ্য হইবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটবে না। সেই কারণ চঞ্চল চিনিবাস নিদ্রাত্তপ্পে শায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

উত্তর কিয়ৎক্ষণ পরে রামদয়ালবাবু ঘুমপান করিতে করিতে চিনিবাসের নিকট ফরাসের উপরে আসিয়া বাসনেন—দেখিলেন, চিনিবাসের নিদ্রাত্তপ্প

হইয়াছে—জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা চিনিবাস কেমন আছি ? কাল গুম হইয়াছিল ত ?

চিনিবাস উত্তর করিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ—গুম হইয়াছিল ; এখন ভাল আছি ।”

তৎপবে বামদয়ালবাবু একটু মোটা গলায় ডাকিল, “বন্ধু” ।

বন্ধু নিকটে ছিল, সে উত্তর দিল, “আজ্ঞে বাই” তার পর সে রামদয়ালবাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ।

রামদয়ালবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, “শ্যামা কোথায় ? তাহাকে ডাক ।”

শ্যামাকে ডাকিতে হইল না, সে ডাকিবাব পুকেই তথায় উপস্থিত হইল ।

বামদয়ালবাবু তখন তাহাদ্বয়কে বলিলেন, “এখন তোমরা দুইজনে চিনিবাসকে ধরাদবি করিয়া গিড়কিব ধারে লইয়া যাও ; সেখানে গবষ জল ঔষধ আছে । বেশ ভাল করিয়া ঔষধ লাগাইয়া দিবে, পরে খুব সাবধানে এঁইখানে রাখিয়া যাউবে ।” “বন্ধু ও শ্যামা উভয়ে বামদয়ালবাবুর কথা অগ্র-যায়ী চিনিবাসকে ধরাদবি করিয়া গিড়কিব দিকে লইয়া গেল ।”

রামদয়ালবাবু আবার পূর্বেরকাল মত তামাকুট সেবন করিতে লাগিলেন, আর পাঁচ বকম কত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে এক ডাক-হুকুরা একখান পত্র লইয়া উপস্থিত হইল, একটি নমস্কার করিয়া পত্রখান তাহার হস্তে অর্পণ করিল ও পুনরায় আর একটি নমস্কার করিয়া সে প্রস্থান করিল ।

রামদয়ালবাবু পত্রখানির শীর্ষনাম দেখিয়া জানিতে পারিলেন, পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিতেছে, সম্ভবতঃ চিনিবাসের মনিব অমিত্রবাবু লিখিয়া থাকিবেন, তাহাকে যে পত্রখান লেখা হইয়াছিল, তাহা তাহারই উত্তর হইবে । রামদয়ালবাবু পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন,—যাহা তা বয়াছিলাম, তাহাই ঠিক । পবে তিনি পত্রটি মোড়ক করিয়া বেনিয়ানের ডেবের ভিতর রাখিলেন ।

এমত সময়ে আর একটি বিরল শ্রদ্ধানিশিষ্ট দীর্ঘকায় দিব্য বালিষ্ঠ শ্যক্তি প্রোঙ্গন হইতে বিনত অভিবাদন করিয়া বামদয়ালবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল ।

রামদয়ালবাবু তাহাকে সাদবে গৃহীত করিয়া বলিলেন, “বদকদ্দিন ! কাল—
—তুমি সন্ধ্যার পব আর আসিলে না—কি হইল না হইল জানিবার জন্ত তোমার অপেক্ষায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে বসিয়াছিলাম ।

সে লোকটি কহিল, “বাবু! কাল আমি বড় নাকালে পড়েছিলাম, তাই আসতে পারি নাই। কাল আমার একটা মকুট ফাঁড়া গেছে, বেটাও আমাকে গুলি করেছিল, শু’গটা আমার কাণের চার আঙুল তফাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

বামদয়ালবাবু সভয় বিস্ফাবিত নেনে বলিলেন, “এল কি বদবাসিন!” তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কাণ্ড কোথায় হইয়াছিল—দ্বিধির পাড়ের বাগান বাড়িতে, না—ওদেব খাসমহলে?”

“খাসমহলে।”

“আবার খাসমহলে গেলে কেন? এরূপ ছঃমাহমের কাজ করিতে গেলে কেন?—আমি যে তোমায় দ্বিধির পাড়ের বাগান বাড়িতে যাঠিতে বলিয়াছিলাম!”

“আজ্ঞে সেখানে গিয়েছিলাম—সেখানে বাবুবা কেউ নাই, ছুই একজন চাকর বাকর ছিল। তাদেরকে জিজ্ঞাসা কব্লাম, তারা বহ্নে, বাবুবা চলে গেছে। কবে গেছে জিজ্ঞেস কব্লাম, তারা একথা কেউ ঠিক করে বলে না। তারপরে আমি অন্দকাবে গা ঢাকা দিয়ে পাত্তি পাত্তি করে বাগানবাড়ির উপর নিচে সকল দায়গায় খুঁজলাম। কোথাও তার উদ্দেশ্য না পেয়ে আপনাকে খবর দিতে বাড়িতে ফির্ছিলাম, কিন্তু আবার মনে হল, কিছু খবর না নিয়ে গমন ফির্বা, আজকে আর একবার দেখি না; যদি কোন খবর পাই, এই মনে করে জমীদারদেব বাড়িতে সেলাম।”

“তারপর।”

তারপর সেখানে গিয়ে দেখলাম। বাবুদেব খুব আহোদ চল্ছে, খুব দারু চল্ছে—খুব গান বাজনা হচ্ছে; তার মধ্যে বাবুদের কেউ পায়ে দুম্মুর বঁধে নাচ জুড়ে দিয়েছে। খানিকক্ষণ আমিও বাবুদের দলদাবিয়াগিরি দেখলাম। আমি যে জগ্গে সেখানে—গিয়েছিলাম তার কিছুই দেখতে না পোয় পাঁচিলে উঠলাম, বরাবর পাঁচিলের উপর দিয়ে পশ্চিম দিক্কাব বৈঠকখানায় গেলাম। বোন হোল যেন তাহার মধ্যে কাঁবা খুব আশ্বে আশ্বে কথা কইছে; শোনবার জগ্গে খুব সাবধানে হাত্ড়ে হাত্ড়ে একটা জান্গাব কাঁছে গেলাম—কে জানে সেখানে কতগুলো শুকনো গাতা আর কাঁটা রয়েছে—তার উপর পা পড়তেই পাতাগুলো খসখস করে আওয়াজ করে উঠলো, আর আওয়াজ না হয় এষ্ট মতলবে অপর দিকে যেই পা ফেলেছি, অগ্নি বাব্গার কাঁটা, না কি কাঁটা

পায়ের ছুটলো, বগলায় আমি বসে পড়লাম, একে একটু আত্মশাস্তি হয়েছিল। ঘরের ভেতর যারা কণা কহছিল, তারা এঁই আত্মশাস্তি মন্থনে বেশিবে পড়লো। উপস্থিত আমি পালাতে না পেরে মোর গানে বসে বসে পা থেকে কাঁটাগুলো তোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম—কান আমি ও বেটারা সকলে এক ছোট বেঁধে এলেও আমাকে আটুতে পাববে না। যাঁহ'ক তারা আঁধারি লগ্নে ঘুরয়ে ফিরিয়ে চারিদিক দেখতে লাগলো, একবার সেই আঁধারি লগ্নের আনোটা আমার উপর পড়লো, আমার বুকটা অমনি চমকে উঠলো আমি মাটির চিপির মত আড়ষ্ট হয়ে রইলাম। আমার ভগ্ন মনে হতে লাগলো একটু আলো ঘুরিয়ে নিলেই হয়, অমনি চম্পট দিই; কিন্তু তা হ'ল না—বেটারা আনোটা ঘুরিয়ে নিলে না; বেটারদের গুজব গুজব কথা শুনে আমার মনে বড় ভয় হতে লাগলো—খোদা আমার বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তারপর বেটারা আমাকে গুলি করে—গুলিটা আমার কাঁধে পাস দিয়ে সন্ করে বেরিয়ে গেল। বাবু! সেই অণ্ডেয়াজে আমার কানে এখনও তাল্লা ধরে রয়েছে।

“কি ভয়ানক। তার পর?”

“তার পর বাবু! তার সেখানে একটুও বিশ্রাম না করে, আঁঠির উপর ভর দিয়ে এক লাফে পাঁচিলে উঠে সদরের দিকে এলাম—দেখলাম সদর দরজা বন্ধ—মহা বিপদ! পাঁচিলের ওপাশেও পড়তে পারি না, কারণ বিষম গহ্বের খাদ (গড়খাই) তারি বেকায়দায় রয়েছে; কোন্ দিকে যাব কিছু ঠিক করতে না পেরে, ফের সেই দিকে ফিরে গেলাম, উঁকি মেরে দেখলাম—যেখানে আমি আড়ষ্ট হয়েছিলাম—সেখানে বিস্তর লোক জমেছে, তারা সকলেই গুণ্ডাগোল করে কথা কহছে; তাদের কথা শুনে সেই বিপদ কালে আমার বড় হাসি পেয়েছিল।

‘রামদয়ালবাবু আশ্চর্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “সে কি কথা?”

বদরুদ্দিন হাসিতে হাসিতে কহিল, “বাবু সে বড় মজার কথা। একজন বলছে অতদূর কি মানুষ হয়?—ও শাবা নিশ্চয়ই—ভূত! তার কথা শুনে অপর একটা লোক বলে, তা না হোলে চাঁদুবাবুর গুলি খেয়ে ভজম করতে পারে? আর একজন বলে,—ওটা ভূত কি মানুষ তা ঠিক জানা গেল না। আর একজন তাকে লক্ষ করে বলে, তোকেত দেখবার জন্তে বলা হয়েছিল। সে অমনি তাড়াতাড়ি তার উত্তরে বলে,—“কে বাবা এত রাত্রে গন্ধকানে গাপ

খোপের ঘাড়ে পা দিয়ে পরাণটা হেলায় হারাবে ।” এর পর চাছাবাবু গলাব আওয়াজ পেলাম, তিনি যেন কাকে জিজ্ঞাসা করে বলেন, “দরজা বন্ধ ? তবে সে পালবে কোথায় ! দেখ কোথায় ধুকয়ে পড়েছে ! চাছাবাবু কথা শেষ হোতে না হোতে আর একজন কে, তার কথার উপর কথা কয়ে বলে,— “সেই দিগ্গজ ভূতটা লোকের পাল্লায় পড়ে যদি মাথুখ হয়ে পড়ে । তাহোলে কি আমাদের এই ডাঙ্কটীখোরেরা তার মেও সামলাতে পারবে ?—এত বোম হয় না । আমাদের সকলের এক ঘোটে ওদের সঙ্গে সেখানে যাওয়া উচিত ।” তখন তার কথা মার্কিন সকলেই ভেড়া গোটরে গেল । আমিত রাস্তা মাফ দেখে অমনি আন্তে আন্তে সেই খানে নেমে পড়লাম ; ছয় মন বেটাদের হাত থেকে এড়িয়ে কতকটা হাঁক ছেড়ে বাঁচলাম ! তারপর আর একটা নতুন ভাবনা এসে জুটলো,—সেই ঘেরাটোপ থেকে কিমে পরিজ্ঞান পাই,— তাড়াতাড়ি সেখানে দাড়িয়ে একটা পালাবার মতলব আঁটবো, তার সময়টা পর্য্যন্ত নাই । কারণ বাড়ির চারিদিকে তখন লোকজন বেরিয়ে পড়েছে, কি করি, আন্তে আন্তে খুব হুঁসিয়ার হোয়ে অন্দকারে গা ঢাকা দিয়ে খড়কির পুকুর ধারে গেলাম ; পুকুর ধারটা তখন খুব নিঝুম । সেখানে গিয়ে পরাণটা জুড়াল, পুকুর পাড়ের সাঁড়তে খানিক বসে পালাবার মতলবটা ঠাওরাতে লাগলাম, অনেক ভেবে চিন্তে ছোটো মতলব ঠাওরালাম । তার মধ্যে একটা মতলব মনের মত হোল, অল্পটা হোল না । কারণ সেটা লাঠির ভনসা,— যদিও আমি লাঠির বাগে একশ লোককে কাবু করতে পারি । কিন্তু ওদের কাছে আর লাঠির কেরামত কি করবে । কাজেই লাঠির উপর ভরসা না করে, অল্পটার উপর নির্ভর করলাম, সেটীতে সকল দিক বজায় থাকবে, সেটা কি জানেন ?—পুকুর ধার দিয়ে গিয়ে—যেখানে পুকুরের সঙ্গে গড়খাটীর মিল হোয়েছে—সেইখান দিয়ে সাঁতাব কেটে পালাবার কিকির । সেটা তাড়া-তাড়ি হাঁসিল করিবার জন্তে উঠলাম । এমন সময়ে দূরে একটা আওয়াজ হোল শুনতে পেলাম । অমনি সেই দিক ফিরে দেখলাম, কাবা লঠন বুলিয়ে আমার দিকে আসুচে ; আমি বুঝতে পারলাম, এরা আমার সন্ধানেই আসুচে, তারপর দেখলাম তা নয় । যাঁহু হ’ক আর সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে—সেই সিঁড়ির আগা ডিঙ্গিয়ে খুব গুড়ি মেরে গুড়ি মেবে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়া-লাম । ক্রমে সেই দুইটা লোক কথা কহিতে কহিতে পুকুর ঘাটে এগো । তারা কি কথা কহিছে, শোনবার জন্তে আমি কান খাড়া করে রইলাম ।

বাবু! ক্রমে তাদের কথা আশায় বড় আশ্চর্য্য করলে। — যার মস্তানের জন্তে আমাদের এত নাকাল, এত বিপদ, এত চেষ্টা, সে সকলই ব্রথায় গেছে।”

“রামদয়ালবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার প্রতি তাকাইয়া বলিল, এঁা বল কি!”

“আজ্ঞে তাদের কথায়ত আমার এই রকম নোংরা হোল।”

রামদয়ালবাবু বদরুদ্দিনকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া — সেই কথা শুনিবার নিমিত্ত তিনি একটু দৈর্য্য ধরিয়া তাহাকে সেই কথার স্বরূপ কহিতে বলিলেন।

তখন বদরুদ্দিন আবার তাহাদের কথিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল।

একজন বল্চে, “এ লোকটা কে, তা আমি বুঝতে পেরেছি।

আর একটা লোক বল্লে, “কে বল না?”

“আমাদের ও গাঁয়ের রামদয়ালবাবুর একটা লোক।”

“ফিরোদপুরের রামদয়ালবাবুর লোক।”

“আমারত দেখে শুনে এই রকম ধারণা হচ্ছে।”

“তিনি ধার্মিক ভদ্র লোক। তিনি কি খেয়ালে এ রকম ফেসাদে কাজ করবেন? ও ধারণা তোমার ঠিক হয়নি—ভুল হয়েছে।”

“না হে না! তুমি জান না, তিনি এদানিং ধর্মের খাতিরে একটু ফেসাদে হয়ে পড়েছেন। ——— “কি রকম?”

“তুমি সেই ইঙ্গি লোকটির কথা জান—যাকে আমাদের ছদ্মবাবুর মা'বেক লেঠেন বদর আর খালফা কেড়ে নিয়েছিল—তাকে কের ছোঁ মারবার মত-লবে সে দিন নিশ্চিন্ত রেতেব বেলায় লোক জন নিয়ে চুপ চুপ বদরের বাড়িতে চড়াও হয়। কিন্তু বাবুরা যে আশায় গিয়েছিল, সে আশায় নৈরেশ হয়ে শেষে পাবড়ার খায় ঠেং ভেঙ্গে বাসা ফেরে”—

সে লোকটার কথার মাঝে কথা ফেলে অপর লোকটা বলে, “হুঁ—তাঁই বিনোদবাবু ঠেং নিয়ে বিছানায় পড়ে আছেন,—বলে ঘোড়ায় থেকে পৌড়ে গিয়ে পায়ে বড় চোট লেগেছে;—ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড হয়ে গেছে। একথা আমবা শুনিনি। তুমি”—

এই লোকটির কথা শেষ হোতে না হোতে, সেখানে আর একটি লোক এসে পড়ায় সে লোকটির কথা অমনি বন্দ হোল। আমারও তাদের সকল কথা শোনিবার পক্ষে বাধাত জন্মাল।

ঐ কথার পর রামদয়ালবাবু তাহাকে সন্তুষ্টক্যাচিন্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“সেই লোকগুলিকে চিনিতে পারিয়াছ কি?”

বদরুদ্দিন কহিল, “আজ্ঞে না—আলোক আঁধারিতে চিনিতে পারি নাই।”

রামদয়ালবাবু তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলেন,
“তার পর।”

“তার পর সেই লোকগুলোর জন্তে, সেখানে আমাকে আর খানিকক্ষণ
কম্বোভোগ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিলো।”

রামদয়ালবাবু বদরুদ্দিনের কথিত কথা পূর্বাপর সমস্তই শুনিলেন, শুনিয়া
ভূ-পৃষ্ঠে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া এতদসংক্রান্ত চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

বদরুদ্দিন তাহাকে চিন্তাশ্রিত দেখিয়া আর কোন কথা না কহিয়া, চিন্তান্তে
রামদয়ালবাবু তাহাকে কি কথা বলিবেন, তাহাই শুনিবার প্রতিক্ষায়, সে
নিরবে বসিয়া রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।

শীতল—

“প্রাণে বড় বাজিল—”

প্রিয় পাঠক মহাশয়! বদরুদ্দিন—এই অজ্ঞাত লোকটির সহিত
রামদয়ালবাবুর এতক্ষণ কি বিষয় সম্বন্ধে কথোপকথন হইতেছিল; বোধ কার,
তাহা আপন স্পষ্ট অবগত নছেন। আপনার স্মরণ আছে—সেই কাগ
বৈকালে বিজন রাজবড়ো সেই দুর্ভাগ্য সময়তান শিকারীদল, হতভাগিনী ননী-
দালীকে দগ্ধাচারে অপহরণ করিয়া, তৎকালে তথায় পিশাচ দিগের ঘাণবিক
ক্রিয়ার স্থানাভাবশত, তাহারা পরামর্শ মত অসহায় অচেতন ননীদালীকে বহন
করিয়া, তাহাদিগের পিশাচপুত্রী অভিযুগে ধাবিত হইল। কিছু দূর যাইতে
না যাইতে ভীম মূর্তি দুইটি লোকের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল।
এই ভীম মূর্তি লোক দুইটি আর কেহ নহে,—বদরুদ্দিন ও তাহার ভাতা

খলিফা । ইহাবা ঐ ছুবাআদিগের চিরশত্রু । প্রাকৃতিক বিভ্রাটের সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহারা সক্ষিত মনে আপন শস্তক্ষেত্রের তত্ত্বাবধানে আসিয়াছিল । তাবপর বাট ফিরিবার কালে দেখিয়া, পাপিঠের কাছাব একটি নমণীকে লইয়া পলাইতেছে । জাব যায় কোথায় ! তাহারা ভীমাক্রমণে ছুবাআদিগের উপর পতিত হইয়া মবলে হতভাগিনীকে গিশাচ-কবল হইতে উদ্ধার কারণ এবং দয়া করিয়া পায়ণ্ডিগকে অধিক কিছু না বলিয়া, কেবলমাত্র বন্দুকের চোটাগুলি কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল ।

বদরুদ্দিন ও খলিফার সহিত উহাদিগের শত্রুতা বিশেষ কারণে হইয়াছিল । ঐ যুবক শিকারীদ্বয়ের মধ্যে একটি — যোট দ্বিতীয় শিকারী, তিনি জীওলপুরের সজ্জাস্ত জমিদার বংশধর চন্দ্রকান্ত বাবু ওবফে চাঁদুবাবু । অল্পট-যিনি প্রথম শিকারী, তিনি চাঁদুবাবুর আত্মীয় বিনোদবাবু । উভয়েই এক পবিবাব ভুক্ত । ইহাদিগের অভিভাবক প্রবল প্রভাব গীতানাথ বাবু । তিনি জীওলপুরে বড় একটা থাকেন না—সহর বণিকাতা বা স্বাস্থ্য-নিবাস দা'জ্জলিঙ্গ—এই উভয় স্থানেব এক জায়গায় মরজিমত থাকেন । জমিদারিব কাজকর্ম ম্যানেজার বাবু ও নায়েব গোমস্তা মহাশয়েবাই দেখিয়া থাকেন । ইহা ছাড়া তাহাব উপযুক্ত মস্তান চাঁদুবাবু জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে মধ্যে মধ্যে পিতার নিকট হইতে তথায় পদার্পণ করিয়া থাকেন ।

এহ গীতানাথ বাবু তাহাব আমোলের সর্বসামারণের নিকট চুঁদে বাবু—এই আখ্যায় পরিচিত হিগেন । বদরুদ্দিন ও খলিফা দুই ভাই, চুঁদে বাবুর নিকট পুরুষ পুরুষানুক্রমে লাঠিধানের কর্ম্ম করিত । এই কর্ম্মেব বেতন স্বরূপ তাহারা কএক বিঘা শস্ত ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য ভোগ করিত ও ইহাব উপর নিছ রোপা মুদ্রা পাইত, তাহার পব পূজা পার্বণেও বকসিস আছে । এই পাট রকমে তাহাদিগের সংসার চলিত ও কিছু সংস্থান হহত ।

যাই হ'ক, তাহারা ঐ দুর্কিনীত যুবকদিগের অসংবৃতি চরিতার্থ করিবাব স্বযোগ ঘটাইয়া দিত না বলিয়া বদরুদ্দিন ও খলিফা তাহাদিগের বিষ নযনে পড়িয়াছিল । জলে থাকিয়া কুস্তীরের সহিত অবনিবনা করা যুগুতা । স্তরাত বদরুদ্দিন ও খলিফা তাহাদিগের বাপুতো মাউতো ভিটায় স্থান পাইল না । তাহারা অনন্তোপায় হইয়া সদাশয় রামদয়াল বাবু

শরণাপন্ন হইল। রামদয়াল বাবু সংব্যক্তিগণেব উপযুক্ত আদর করিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন।

সেই অবধি বদরুদ্দিন ও খালিফা রামদয়ালবাবুর প্রজা শ্রেণীভুক্ত হইয়া সম্মুখে তাঁহাব এলাকায় এসবাস করিতেছে। এখন তাহাদিগের জাতিমান-ধৃতি নাই—তাহারা এখন কৃষক। বদরুদ্দিন ও খালিফা তাহাদিগের পূর্ব অধি-স্বামীর সংস্রব ত্যাগ করিলেও এখন মধ্যে মধ্যে তাঁহারা তাহাদিগেব দ্বারা উত্যক্ত হইয়া থাকে। অবশ্য প্রকাণ্ডে নচে—গোপনে। এই সকল কারণে তাঁহারা মনিব হইলেও তাহাদিগেব শত্রুরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

যাহা চউক, তৎপরে বদরুদ্দিন ও খালিফা সেই বিকৃত সঙ্গী হতভাগিনী ননীবালাকে আপন আদ্যাসে আনয়ন করিয়া বিশেষ নজ্জ, অনেক কষ্টে ননীবালাব সংজ্ঞা আনয়ন করিয়াছিল, এবং নিজ অবস্থামত বণাসম্ভব তাহাব থাকিবাব স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছিল। তৎপরে পরদিন আগিলে, তাহাদিগেব সদাশয় আশ্রয়দাতাকে এ বিষয় জ্ঞাত কবাটয়া সেই সমুদায় রমণীব সুব্যবস্থা করিয়া দিলে। তাহারা এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ননীবালা দিপর্জায় ঘটনা চক্রে আবর্তিত হইয়া মনের বল একে-বাবে ছাড়াইয়াছিল, জ্ঞানমতি পাগলিনীর মত হইয়াছিল। ননীবালা তাহার আশ্রয় দাতাব সংবাদহারাে কথকিত প্রকৃতিস্থ হইতে না পারিয়া বরং অধিকতর ভীত হইয়া বিকৃত চিন্তায় রজনীযোগে পলায়ন করিয়াছিল।

যে সময় হুভাগিনী ননীবালা বদরুদ্দিনেব বাটী ত্যাগ করিয়াছিল, সে সময় বদরুদ্দিন ও তাহাব লাতা খালিফা বাটীতে ছিল না। বাটীতে ভয়ানক রষ্টির আশঙ্কায় তাহারা তাহাদিগেব সর্বত্র বাগানেব বিপদে নিবাবণে গিয়াছিল। বাটীতে যাহাবা ছিল, তাহাবা সমস্ত দিনেব পরিশ্রম অপনোদন মানসে বিরামদায়নীর অঙ্গগত হইয়াছিল।

হুভাগিনীব পলায়নেব অব্যবহিত পবেই কতকগুলি তরুন প্রকৃতিব লোক সেই বাড়িতে আসিয়া খুব সাবধানে গোপনে নানাস্থানে কাহার অনুসন্ধান করিয়া লোভনীর বস্তটিকে না পাট। যত শীঘ্র পারিয়াছিল সে বাড়ির অল্প বিস্তর ক্ষতি করিয়া পলায়নপব হইয়াছিল, উহার কতিপয় মুহূর্তে বদরুদ্দিন ও খালিফা তাহাব সমুজ্জিবাগান হতে আসিয়া গুনিতে পাইল ও চামুস দেখিতে পাইল, কাহাবা দম্ভাতাব ছাগে বাটির সমুদ অনিষ্টসাধন করিয়া

পলাইয়া গিয়াছে । বদরদিন কাঁপিল, —সে ভাড়াভাড়া, যে ঘান ননীবালাকে স্থান দিচ্ছিল, সেহ খবে গিয়া দেখিল ননীবালা নাই । অমনি তাহার আশ্রয় অনুভবে বুঝিয়া গেল —কাহারো আসিয়াছিল । বিষম বিজাতীয় ঘোরে বাটস্থ লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমজাদা বেটাবা কতক্ষণ হলো গেছে ।”

“তোমাদের আশ্রয় কিছুক্ষণ আগে তারা পানিয়েছে ।” আর তাহার ক্ষণমাত্র তথায় বিাশ না কবিয়া কতকটা পাবড়া সংগ্রহ কবিয়া তীব্র বেগে ছুঁয়াঙ্গাগণের দূর অনুধাবন কবিল এবং তাহাদের নিকটবর্তি হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিবার ক্রমাগত ক্ষিপ্ত হস্তে ছুঁয়াঙ্গাগণের প্রতি পাবড়া নিষ্কপ কবিতে লাগিল ।

এই পাবড়ার আঘাতে বিনোদবাবু শব্দাশায়ী পাঠক ইহা আপনি শুনিযাচ্ছেন । যাই হ'ক, বদরদিন ও খাগিয়ার শত্রুদমন উৎসোগ ঠিক সমধোপযোগী হয় নাই । স্মরণ্য তাহাতে আশা অনুকম্প ফল হয় নাই । তাহার পাবড়া নিষ্কপের পর তথায় গিয়া দেখিল । তৎকাল দিগের মুখোকেই আহত হয় নাই, তাহার আঘাত পাইবার পূর্বেই পলাবন কবিয়াছে । কি করিল, তাহার ক্ষম মনে বাট কিবিয়া আসিল । পাদিন প্রাণে ৭০ সংবাদ বাসদায়া এবং নিকট পৌঁছল । বদরদিন প্রামত্ত কার্যকারণের প্রকৃত কল গোপন কবিতে চেষ্টা কবিতছিল, কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া পবে সেই চক্ৰতান্নী সংগ্রহের তাবৎ কল বাসদায়া বাবুর নিকট খুলিয়া বলিল । বাসদায়া বাবু মনযোগের সহিত তাহার কথা শুনিয়া অশ্রুনি কৰ্ত্তন কবিত লাগিলেন ।

চিনিবাস সেখানে কন্যাসোপরি কথ শব্দায় শাখিত ছিল ; সে বদরদিনের আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার কথা শেষ হইলে সে চীৎকার কবিয়া বসনা বিজড়িতস্ববে বলিয়া উঠিল, “বাবু শুনিলেন, ছয়মন বেটাবা কি সয়তান ?”

বদরদিন ইহাদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল—বিস্ময়ে বাসদায়াবাবুর মুখপানে চাহি যা রহিল ।

বাসদায়াবাবু অনুশোচন কবিয়া বলিলেন, “বদরদিন ! তুমি যদি সেই জীপোকটিকে তোমার বাসাতে না রাখিয়া, আমার এখানে রাখিয়া যাইতে তাহা হইলে কাষটি বড় ভাল হইত—সে নিরাপদে থাকিত এবং একটি ভদ্র-গোকেব সম্ভব রক্ষা হেতু তোমাদেও পুণ্য সঞ্চয় হইত ।

বদরুদ্দিন বামদয়ালবাবুর কথার মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, ব্যাপার কি ?—জিজ্ঞাসা করিল ।

রামদয়ালবাবু চিনিবাসের জ্ঞান সন্ধাবের পব তদসংশ্লিষ্ট ঘটনার বিষয় (যাহা তিনি সবিশেষ জ্ঞাত নহেন) যতটুকু শুনিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে তাহাকে বলিলেন ।

বদরুদ্দিন ইহা শুনিয়া বামদয়ালবাবুর ভাব গ্রহণ করিয়া প্রতিহিংসাবসে উৎপাদনের সহিত বলিয়া উঠিল, “বাবু । আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তা’হলে আমি সেই জ্বীলোকটিকে আপনার নিকট হাজির করিতে পারি ।

রামদয়ালবাবু তাহার দৃঢ়তায়, তাহার ক্ষমতায়, তাহার কথায়, বিলক্ষণ বিশ্বাসবান ছিলেন । সুতরাং বদরুদ্দিনেব এই কথা শুনিয়া তাহাকে সেই হতভাগিনীর উদ্ধার সাধন করিতে বলিয়া দিলেন, কিন্তু নির্দিষ্টবাদে নির্গোলযোগে কার্য সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন ।

এই জ্ঞানের জগতে রামদয়ালবাবু স্বভাবতঃ পবছঃখকাতর সাধু ব্যক্তি । তিনি নিস্বার্থভাবে কাহার কিছু উপকার করিতে পারিলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন । এষ্ট দেবভাব প্রণোদিত হইয়া অপক্ষপাত ক্রমে যেরূপ সকলের সহায় হইয়া থাকেন, সেমান অম্পর্ক অপরিচিত হতভাগ্য অমিত্রবাবুর ভাগ্য নেতা রূপে তাহার সহ ধর্ম্মানীর উদ্ধার মানসে বদরুদ্দিনের কথা শুনিয়া মাত্র, অগ পশ্চাত্ত কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে তদ-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তদ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ছিলেন ।

বদরুদ্দিন তাহাচ করিয়াছিল নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিগোলযোগে কার্য সম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাঠিয়াছিল । কিন্তু ননীবাণীর অদৃষ্ট হওনের প্রকৃত তথ্য তাহার নিকট তদসমুদয় থাকায় তাহার উদ্ধারার্থ তাহার যে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল, তদসমুদয় লাভ পথে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । সহজ অনুমানে এইরূপ প্রতীত হয় ।

প্রায় পাঠক মহাশয় । এখন বুঝিতে পারিম্যাদেন বামদয়াল বাবুর সহিত বদরুদ্দিনেব কি বিষয় সম্বন্ধে কথা বার্তা হইতেছিল ? যাঁহাটুকু, বামদয়ালবাবু এইরূপ নিরব চিন্তায় মগ্ন আছেন । এমন সময় তাহার ভ্রাতুষ্ট চিনিবাসকে লইয়া তথায় ফিবল । রামদয়ালবাবু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চিনিবাসের ক্ষত স্থানের অবস্থা এখন কেমন ?” প্রত্যুত্তরে শুনি-লেন অপেক্ষাকৃত ভাল । তৎপরে তিনি তাহাদিগেব একজনকে চিনিবাসের

জ্ঞাতবাস অর্থাৎ চক্ষু আনয়ন করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং অতীতকে তাম্র-কুট সজ্জিত করিতে বলিলেন ।

এমত সময়ে বদরুদ্দিন “আচ্ছা—বাবু! এই কথাটি পবন করিবা কি বলিতে যাঠিতেছিল । বামদয়ালবাবু তাকে এখন এতদসম্বন্ধে কোন কথা কহিতে চক্ষিতে নিষেধ করিলেন । কানন উপস্থিত চিনিবাস সকাশে তাহার প্রভু-বণিতাব নিকদ্দেশ সংবাদ প্রচারিত হইবে ।

বদরুদ্দিন তাহার ইঙ্গিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া আন কোন কথা না কহিয়া পূর্বগত নীবব বহিল ।

উহার অনতিবিলম্বে সেই ভৃত্য চিনিবাসের জন্য ঈষদ্রুচ চক্ষু আনয়ন করিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপন করিল । চিনিবাস তাহা বিনা আপত্তিতে চুমুকে চুমুকে পান করিল । এইরূপে চিনিবাসের প্রাতঃ ভোজ সমাপন হইলে, তাহাকে কথঞ্চিত স্নান দেখিয়া তাহার বিপদ-বার্তার পূর্বাগর বিশদ-রূপে জানিবার নিমিত্ত, বামদয়ালবাবু তাকে কথা প্রসঙ্গে সেই কথা কহিতে বাধ্য করিলেন । চিনিবাস বিষাদভাবাবনত চিত্তে তাহার বিপদ-বার্তা বিস্তৃত সর্ণনা করিতে লাগিল ।

শ্রিয় পাঠক মহাশয় । আপনার যাহা অবগত জ্ঞাতবা, তাহাষ্ট এ স্থলে বর্ণিত হইল । “অতি প্রভূত্রে আমাদেব ইষ্টিমার কণিকাতা ছাড়িয়াছিল । প্রায় ৮ আট খটিকা ভ্রমণের পর ইষ্টিমার নাবাধগগজে আসিয়া লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে কত যাত্রি নাগিল । এতখান চটতে আমার মনিবের গ্রাম দুবন্ধে প্রায় ৭ কোণ মাল । আম মনে কদিবাস, এতখানে লাগিলে আমাদেব গন্তব্য স্থানে পৌছিবাব পক্ষে অনেক সুবিধা ঘটতে পারে ; কেননা এখানে গাড়ি পাউব । আর যদি এখানে না নাগিয়া—যেখানকার টিকিট কিনিয়া—চিন্নাম, সেখানে—মহেশপুরে নাগি । তাহা হইলে অসুবিধাব একশেষ ভোগ করিতে হইবে, —কেননা ইষ্টিমার দুটিয়া ফিবিয়া তথায় পৌছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইবে । সেইখান হইতে আমাদেব গ্রাম প্রায় ২৫কোশ মাল তফাত হইলেও পূর্বেকার দন্দোবস্ত ব্যতীত তখন তথা হইতে আমাদেব গ্রামে পৌছন বড় সহজ ব্যাপার নহে । মহেশপুর হইতে বরাবর যে রাস্তা আমাদেব গ্রামে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা কাঁচা রাস্তা—ভয়ানক মাঠের মধ্যবর্তি স্থানে অবস্থিত । সেই দক্ষ্যকালে সেই রাস্তা দিয়া চলা সম্পূর্ণ বিপদজনক এবং মহেশপুরে যে পাহনিবাস আছে তাহাও কোনক্রমে নিরাপদ নহে । এই সাত পাঁচ ভাবিয়া

মহেশপুত্রের টিকিট থাকা সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জে অবতরণ করিলাম । গাড়ির চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একটিও গাড়ি পাইলাম না । এদিকে ষ্টিমারও চাড়িয়া দিল । অনেক চেষ্টা করিয়া যখন গাড়ির সন্ধান করিতে পারিলাম না । তখন আমার মনে হইল, এখানে না'মিয়া ভাগ কাজ করি নাই । বি করিব ? আর উপায় নাই । তখন অগত্যা ২৥ আড়াই ক্রোশের স্থলে ৭মাত ক্রোশ চলিতে বাধ্য হইলাম । প্রাণে বড় বাজিল,—আমার নিকরু দ্বিতীয় এইরূপ ঘটিল,—মা কি করিয়া এতটা পথ ছাটিবে ভাবিয়া আকুল হইলাম । তৎপবে মনে এইরূপ আঁচনা লইলাম, খানিক পথ চলিয়া নিকটবর্তি কোন গ্রামে রাত্রিযাপন করিব । মাকে চিঠি বুঝাইয়া উভয়ে পথ চলিতে আবস্ত করিলাম । কে—জানে পথে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটবে ! কে—জানে ভবিষ্যত কাল গর্ভে আমাদের জন্ত এইরূপ সাংস্কারিক বিপদ লুকাইয়া আছে ।”

ইহা বলিতে বলিতে চিনিবাসের কণ্ঠবোধ হইয়া আসিল, চিনিবাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থামিল ।

তৎপবে ক্লান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল “মহাশয় ! যখন আপনারদেব গ্রামের নিকট আসিয়াছি ; অমনি কোথা হইতে সেই ঘৃণিত শয়তান ছুইজন আমাদের সন্মুখীন হইয়া টেবা হিন্দিভাষায় বলিল, তোমাদেরকে পুলিসে দিব । আমি মু'ঝতে পারিলাম না, কেন—কি জন্ত আমাদের পুলিসে দিবে ; একথা জিজ্ঞাসা করায় ছুইজেরা দারুণ জঘন্ত অশ্লীল ভাষায় আমার মস্তিষ্ক আঘাত করিল । বাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল—আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইলাম—ভুত ভবিষ্যত ভুলিয়া গেলাম । মুহূর্ত্তমধ্যে সেই পাষাণ অশ্লীল বক্তাকে ধরিয়া ভুতলে নিক্ষেপ করিলাম, তাহার হৃদপিণ্ড ছিঁড়িতে প্রস্তুত হইলাম । কিন্তু পরক্ষণে অচ্যুতের সৎস্কারিক গুলির আঘাতে চেতনা হারাইলাম । তাব পব কি হইল,—মা কোথায় গেল, কিছুই জানি না । বোধ হয় ; মধ্যে একবার সজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম । তৎপরে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলাম আপনার আশ্রয়ে আছি ।”

ইহা বলিয়া চিনিবাস নিবব হইল ।

বামদয়াল বাবু এই বিচিত্র পরিণাম বহুশ্রুত কাহিনী গ্রহণ করিয়া কিছু মাত্র বিস্মিত বা দুঃখিত হইলেন না । কারণ কল্প অল্পসারে মনুষ্য তাহার অবগুপ্তাবী ফল ভোগ করিয়া থাকে, ইহা শাস্ত্র সঙ্গত কথা । ইহাতে দুঃখিত বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই । তবে অপারগামদর্শী ব্যক্তিগণ অববেচনা

হেতু জগতে যে দুর্কর্মের বীজ নোপণ করে, তাহার ফলে নিবপবাসি সুমিষ্টাঙ্গ-
গণকে যে অকাবণ ছুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, ইহাতেই প্রাণ
কান্দে—ইহাতেই রামদয়াল বাবু ছুঃখিত হইলেন । তিনি চিনিবাসকে অগ্নিঝাবাবু
সংক্রান্ত কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু তাহাকে বিহ্বল দেখিয়া তিনি
সে বিষয়ে নিবস্ত হইলেন ।

এ দিকে বেলাও বাড়িতে চলিল । বদরুদ্দিন উপস্থিত তাহার মেথানে
প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া বিদায় হেতু রামদয়ালবাবুকে অভিবাদন
করিয়া উঠিল ।

তাহার প্রতি রামদয়াল বাবুর কিছু জিজ্ঞাস্তা ছিল । স্থান বিশেষ জিজ্ঞাস্তা
বিষয়েব প্রতিবন্ধক হেতু, তিনিও বদরুদ্দিনের সহিত উঠিলেন, তাহার সহিত
কথা কহিতে কহিতে ববাবর ঠাকুর মংল আতিক্রম করিয়া বাটিন বগিঙাগে
আসিলেন । বদরুদ্দিন তাহার এই সহযাত্রাব কারণ অবগত ছিল না ; সে
পুনরায় তাহাকে অভিবাদন করিয়া বাটি গমনোদযোগ করিল ।

এই সময়ে রামদয়ালবাবু তাহার গমনে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,
“বদর !—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব,—তুমি গুপীকে চেন ? সে
কেমন লোক ?”

“গুপী !” এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া বদরুদ্দিন একবার রামদয়াল
বাবুর তৎপরে মূর্ত্তিকাপাব দৃষ্টি নিশ্চেষ্ট করিয়া “গুপী” এই আশ্চর্য্যমাত্র
শোকটীকে তাহার ক্ষণিক চিন্তায় অনুসন্ধান পব হইল ।

রামদয়াল বাবু তাহার কাণতে ঘোঁকটিকে বদরুদ্দিন দামণাব আনিতে
পারিতেছে না দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “গুপী হে,”—সে আমার
কাছে একটি চাকরি পাইবার প্রত্যাশায় আজ কয়েকদিন ক্রমাগত যাতায়াত
করিতেছে । তুমি তাহাকে আমার এখানে ছাদিন দেখিয়াছে যে ।

বদরুদ্দিন অমনি বলিয়া উঠিলে, “ও—গুপী ?”—জীওনপুনেব সেই
ভয়মদার বেটাদের যুহরী যোগুব ভাই - গুপী কণা বনচেন ? তাকে আমি ভাল
বকম চিনি না । তবে তার ভাই যোগুবকে আমি খুব চিনি। সেদেটা ভাবি বৈইমান ।”

এই কথা শুনিতে শুনিতে রামদয়াল বাবু আপন মনে অন্তর্ভ্রমেরে বলিয়া
উঠিলেন,—‘হুম—ঠিক হইয়াছে ।’

বদরুদ্দিন রামদয়াল বাবুর আশ্চর্য্যমাত্র শুনিতে পাইয়া নিজের কথা
ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি ঠিক হইয়াছে বাবু ?”

তখন রামদয়ালবাবু তাহাকে বলিলেন, “এই যে গুপী—লোকটি আমার কাছে বেকার অবস্থা জানাইয়া চাকুরি লইবার আশায় আসিত—মেটা আর কিছুই নয়;—আমাদের এই সকল দ্রব্যের খবরাখবর জীওলপুর জমিদারদিগের বাড়িতে সরবরাহ করিবার ফিকির। ইহা না হইলে সেই লোকটি, যে লোকটি, পুরুষ পাড়ে দাঁড়াইয়া তাহাদের মনিব সংক্রান্ত গুপ্ত কথা অথ লোকটিকে বলিতেছিল, সে লোকটি কেমন করিয়া আমাদের এই গুপ্ত অল্পসন্ধান ব্যাপার অবগত হইল। যাই হ’ক, সে লোকটি বহুরূপী; তাহার সঙ্গে খুব সাবধানে কথাবার্তা করিবে।”

এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য, রামদয়ালবাবু ধার্মিক বিষয়ী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।” জীওলপুরের জমিদার মহাশয়েরাও তাহাই। তবে এইরূপ ব্যাপার সংস্বে উভয় পক্ষে কোনরূপ আবার অবনিবনার সূত্রপাত না হয়; এই হেতু, অশিক্ষিত বদরুদ্দিনকে ভবিষ্যতের জ্ঞান একটু প্রকাশ দীক্ষিত করিয়া, তাহাদিগের চরের নিকট হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিলেন।

বদরুদ্দিন তাহার মনের কথা যত বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক; সে কিন্তু, এই সকল প্রকৃতির লোকদিগকে মনের সহিত ঘৃণা করিত,—যতটা পারিত, ততটা উহাদিগ হইতে ভ্রাণ থাকিতে চেষ্টা করিত। সুতরাং, রামদয়ালবাবুর এই উপদেশ তাহাব প্রতি সম্পূর্ণ উপযোগী-হইবে। যাই হ’ক; সরল বদরুদ্দিন রামদয়ালবাবুর কথা শুনিয়া সে জাগতিক জটিল ব্যক্তির চরিত্র-গত রহস্যের বিশেষত্বে বিস্ময় মানিয়া তাহাদের সম্বন্ধে কত কথা কহিল। পরে রামদয়ালবাবুকে সে অভিবাদন করিয়া বাট প্রস্থান করিল।

রামদয়ালবাবুও এতদসংক্রান্ত বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

—————

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।



“তুইটিই দুঃখিনী, কিন্তু ভাতার আদরে সুখিনী ।”

রামদয়ালবাবু এই গ্রামে বহু পুরুষ পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়া আসিতেছেন । বর্তমান সময়ে ইহাদিগের মতন বনিয়াদি ঘর, এই গ্রামে আর অল্প আছে । যাহা আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে ইঁহার শ্রেষ্ঠ । ইনি অতি শৈশব হইতে পুরুষ পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত মহত্ত্ব ও সংগুণগ্রামের অধিকারী হইয়া নবীনে তাহার পূর্ণতা সাধন করিয়া যশস্বী হন ; এখন প্রবীনে তাঁহার সেই মহত্ত্ব ও সংগুণাবলী অতি মনোহর হইয়া, তাঁহাকে সমাজের একজন দেবতুল্য নেতার স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছিল ।

কখন কোন অনাথা, কিম্বা বিপন্ন ব্যক্তি, যে কোন দায়ে ঠেকিয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িলে, তিনি তাহাদিগকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিতেন । এতাদৃশ মহৎ ব্যক্তির দৈবরামুৎসাহে কিছুই অভাব নাই । তবে তাঁহার বদন মণ্ডলে তাঁহার দয়াজরসে আগ্নুত প্রবীণ উজ্জল নয়ন কোনে লুপ্তপ্রায় বিষাদের অস্পষ্ট ছায়া কেন বর্তমান ? তাঁহার প্রশান্ত সুন্দর ললাটে-পটে হৃদয়স্তর ফীণ রেখা কেন বিরাজমান । সময়ে সময়ে তাঁহার মহান পুরুষোচিত নাশারদ্ধ-পথ বহিয়া, তাঁহার বিশাল হৃদয়ের সম্ভাপহারি উষ্ম দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া, তাঁহাকে সাঙ্গনা প্রদান করিতে চেষ্টা পায় কেন ? তিনি মনে মানে শুণে সকল বিষয়েই সুখি । তবে কেন—তাঁহার আনন্দময় মন্দির গায়ে বিষাদের ফীণ কালিমময় ফীণ ছায়া অলক্ষিত ভাবে বিরাজমান । পরমকারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার বিধানে তিনি একটি সন্তান লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু ; সেই সন্তান—সেই আনন্দময়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস, তাঁহার কোলে আর নাই । তাহার অভাবে তাই কি ইঁহার এই ভাব হইতে পারে ? ইঁহার সকলই আছে, তাঁহার কেবল একটু অভাবে, তিনি সকলি শূন্যময় দেখেন ; তিনি সেই টুকুরই অভাবে সদা-সর্বদা নিরবে স্নিয়মাণ থাকেন । সাংসারিক লোকের ব্যক্তিগত প্রকৃতিই এইরূপ । যিনি

সাংসারিক জলবিষবৎ স্তম্ভ ছঃথের নশ্বরতা, অনিত্যতা, ভাল রকম স্থগ্ধম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা সাংসারিক স্তম্ভ ছঃথের অভাব আকিঞ্চনের হরণ পুরণে স্তম্ভ বা ছঃথিত নহেন। তাঁহারা পরম মঙ্গলময় জগদীশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার বিধানে নিৰ্ভীক, সদানন্দ সন্তোষময়;—তাঁহারা এই মহান্।

আমাদের রামদয়ালবাবু এখন প্রাচীন; নানা ঘটনা চক্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া, অন্তরদর্শনে ও ছরদর্শনে অনেক দেখিয়াছেন,—বুঝিয়াছেন এবং শিখিয়াছেন; সংসার, অনিত্য নশ্বর জলবিষবৎ স্থগ্ধময়। তবে তাঁহার আনন্দময়ধামে নিরানন্দের ক্ষীণ ছায়া কেন? বোধ হয়, তিনি এখনও উহা স্পষ্টে বুঝিতে পারেন নাই, অথবা তিনি সংসারি বলিয়া তাই উহার এই ভাব। যাই হ'ক, রামদয়ালবাবু জালাময় জাগতিক চিন্তার স্বাভাবিক নিয়মে আকৃষ্ট হইয়া, যুগপৎ নানা চিন্তার অধীন হইয়া, শাস্তিময়ের জীবজগত, এইরূপ অশাস্তির আলয় কেন?—ভাবিয়া একটি উত্তপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি অন্তর মহলে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, রক্ষনশালে সাক্ষাৎ অসম্পূর্ণা সদৃশা তাঁহার গৃহলক্ষী শালগ্রামজীর ভোগ রক্ষন এবং তাহার উদযোগ ব্যাপারে ব্যাপ্তা আছেন,—যেন মূর্ত্তিমতী কৰ্ম্মদেবী মহাকৰ্ম্মে নিযুক্তা। রক্ষনশালের অদূরবর্ত্তি প্রাঙ্গণে আর দুইটি প্রবীণা গৌরবরণা শুক্লবসনা কৰ্ম্মঠ রমণী শাক শব্জী আনাঙ্গ বাহিতে এবং কুটিতে তৎপর।

এই রমণীদ্বয় রামদয়ালবাবুর ভগিনী। দুইটিই সদবা নয়—বিধবা—ছঃথিনী; কিন্তু ভাতার আদরে স্তম্ভিনী। দুইটিরই পরলোকগত স্বামীর গৃহে স্থান হয় নাই। একটি স্বামীর স্বর্গারোহণের পর স্তম্ভবেচক স্তম্ভকুল হইতে সৰ্ব্বগ্রাসি সৰ্ব্বনাসি স্বাক্ষরী মেয়ে,—এই আখ্যা ধারণ করিয়া ভাড়িত হন। অপরটি বর্ধিয়সী ননদিনীর অমহ লাঞ্ছনা গঞ্জনা আকুল হইয়া ভাতার আশ্রয়ে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। “দুইটিই ছঃথিনী” কিন্তু ভাতার আদরে স্তম্ভিনী।

রামদয়ালবাবু অন্তঃপুরে নিজের কিছু প্রয়োজনীয় কৰ্ম্ম গারিয়া পুনরায় সদর মহলে গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—॥—

“বটে ! বটে !! এমনতর !!!”

তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার বহুদিনের পরিচিত হরিচরণবাবু ফরাসের বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ উচ্চ মৃণ্ময় রোয়াকে একখানি যাজ্ঞিকের উপর ছকাহস্তে উপবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে সাঁগু উবু হইয়া বসিয়া বিনীত অথচ প্রকৃত মূখে অগ্নি প্রক্ষালিত সজ্জিত তাম্রকুট অতি যত্ন সহকারে ফুৎকার দিতেছে।

রামদয়ালবাবু হাসি মুখে তাহাদিগের নিকট অগ্রসর হইয়া হাসিতে হাসিতে হরিচরণবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—“হরিচরণ যে ! বহুদিন পরে তোমার সহিত আজ শুভ প্রাতঃকালিন সাক্ষাৎ।”

হরিচরণবাবু রামদয়ালবাবুকে সম্মুখে দেখিয়া সমস্ত্রমে গাত্রোত্থান পূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার শারিরীক ও পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

রামদয়ালবাবুও তাঁহাকে যথোচিত সম্মানিত করিয়া, তাঁহার কথার শুভ উত্তর প্রদানে তাঁহাকে সুখী করিলেন ও হরিচরণবাবু যথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় তিনি গিয়া, তাঁহাকে উপবেশন করিতে বলিয়া, আপনি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

এইরূপ শিষ্টাচার অভিনয়ের পর রামদয়ালবাবু হরিচরণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সেই খানেই কৰ্ম্ম করিতেছে ?”

হরিচরণবাবু বিনীত উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।” আপনার আশীর্বাদে কৰ্ম্মস্থান বড় সুখের হইয়াছে।”

ইহা শুনিয়া রামদয়ালবাবু যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, তাঁহার মান ও মল যোগের আয়োজন হেতু, সাগুর প্রতি অনুজ্ঞা করিলেন।

হরিচরণবাবু বিনীতভাবে রামদয়ালবাবুকে কহিলেন,—“আমার জন্ম

আপনি নিশ্চিত থাকুন । আমি অতি প্রত্যায়ে জীওলপুরের জমিদার বাটি হইতে জানাদি প্রাতঃ কৃত্য সমাপন করিয়া আসিয়াছি ।”

রামদয়ালবাবু তাঁহার এই বিনীত প্রত্যাখানের পর কি যেন কহিতেন ; কিন্তু তাঁহার মুখে জীওলপুরের জমিদার বাটির নাম শুনিয়া, তাহা আর না কহিয়া, পুষাপেক্ষা কিছু উচ্চ কথায় এবং উৎস্রুত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তাহা হইবে কি তুমি জীওলপুরের জমিদার বাটি হইতে আসিতেছ ?”

হরিচরণ বাবু কহিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ ?” কাল যখন বৈকাল বেলায় আমার কর্মস্থল হইতে জীওলপুরের নিকট আসিয়া পহুঁছিয়াছি ; তখন পথিমধ্যে সেখানকার জমিদার বাবুদের সহিত সাক্ষাৎ হয় ; তাহাদিগের নিতান্ত অনুরোধে পড়িয়া গত কল্য তাহাদিগেব বাড়িতে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হই ।”

রামদয়ালবাবু এই কথা শুনিয়া জীওলপুর সংক্রান্ত কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইলেন । কিন্তু হরিচরণবাবুকে পথপ্রমে ক্রান্ত বোধ করিয়া, তখন সে বিষয়ে নিবস্ত থাকিয়া, তাঁহার বিশ্রামের অল্প আয়োজন হেতু ভৃত্যকে আদেশ করিলেন ।

হরিচরণবাবু রামদয়ালবাবুর তাঁহার প্রতি নিবন্ধাতিশয়া দেখিয়া, বিনীত ভাবে তাঁহাকে তাঁহার বিষয়ে নিবস্ত হইতে কহিলেন, পরন্তু বলিলেন, আমার পথ শ্রান্তি কিছুমাত্র জন্মায় নাই—আমি টাঙ্গবাবুর গাড়িতেই আসিতেছি । এখন আমি খানিক এইরূপ বিশ্রাম করিয়া একটু শুইব । কাল আদৌ নিদ্রা যাইতে পারি নাই ।”

„বল কি ?” রামদয়াল বাবু কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “বল কি ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ ।”

“ইহার কারণ ?”

সে অধর্মের কথা কেন কন ? আমার যে জন্ত সেখানে তাহাদিগের নিকট থাকির আছে—তা বৃথিতে পারিতেছেন । কোথায় পথ পর্যটনের ক্লেশ, ধীরে স্বস্থিরে অপনোদন করিব ;—সেটা তাহাদিগের হাতে পড়িয়া অদৃষ্টে যাওয়া উঠিল না,—মরগ্যে সেটা ধরিতেছি না । অনেক দিনের পর দেখা সাক্ষাতে তাহাদিগের জ্বরদস্তি থাকিরে কতক সময়, গান বাজনা আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া, তাহাদিগের চিত্ত বিনোদ করিয়া বিশ্রাম আশায় একটু শুইব—তা নয় মহাশয় জালাতন ! জালাতন ! সুরাপানে বাবুরা

(মায় মোমাংসেবাইতাদি) সকলেই উন্মত্ত, হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড কিছু মাত্র জান না। আমায় ধরিয়া টানাটানি, বলে মদ খাইতে চাইবে—নইলে ছাড়িব না। মহাশয় আমারত এই শরীর, তাহাদের টানা হিঁচড়াতে আমার কণ্ঠাগত প্রাণ—আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি কখন আর ও মুখো হইব না। তারপর মহাশয়। অনেক কাকুতি মিনতিতে দৈত্যদের হাত চাইতে পরিজ্ঞান পাইয়া তাহাদিগের সখের বৈঠকখানায়,—উপায়ান্ত না দেখিয়া, সেই খানে শুইলাম। তাহাতেই কি নিষ্কৃতি আছে—মহাশয়। এই সকল কথা বলতে ভয় হয়, হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে,—কি ভয়ানক! সেই গভীর নিশীথ রজনীতে উন্মত্ত সুরাপায়ী খিঙ্গীরা কত রঙ্গে ভঙ্গে বর্ষরীয় গর্বিত আশ্ফালনে হৃদয় আতঙ্ককারী তাহাদিগের ভীষণ নারকীয় গুপ্ত কার্য কলাপের ব্যাখ্যা পরস্পরের মুখে প্রশংসিত মিমাংসিত ও সমালোচিত হইতেছিল। যাহা আমি কখন শুনি নাই—যাহা শুনিয়া ভয়ে আমার নিদ্রাভ্রান্ত হইয়াছিল,—যাহা শুনিয়া আমি মৃতকল্প ছিলাম।”

এই কথা শুনিতে শুনিতে রামদয়ালবাবু সবিস্ময়ে সাতিশয় আশ্চর্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন, “বটে! বটে!—এমনতর!!!

তারপর তিনি কৌতুহলান্বিত বশত তাহা শুনিবার নিমিত্ত হরিচরণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে সকল কথা শুনিয়া ভয় পাইয়াছিলে, সে সকল কি প্রসঙ্গ?”

হরিচরণবাবু ঘৃণার সহিত কহিলেন, “মহাশয় সে সকল অতি অশুভ—অতি অপ্রাব্য—আপনার জানিবার যোগ্য বিষয় নহে।”

রামদয়ালবাবু হরিচরণবাবুর ভঙ্গিমা দেখিয়া, তাহার মর্ম্ম আভাষে কতক মাত্র বুঝিলেন। তারপর তিনি তাহার কৌতুহল বৃত্তি সন্তরণ করিয়া, কলা রাজিকালে বদরুদ্দিন জীওলপুরের জমিদার বাটীতে ননীবালাবাবু বিফল অনুসন্ধান হইতে ফিরিয়া আসিলে, তারপর তাহার সম্বন্ধে চাছবাবু ও তাহার বন্ধু বান্ধবদিগের মধ্যে কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কিনা, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষায় কথা প্রসঙ্গে তাহাকে সরল কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল সন্ধ্যার পর জীওলপুরে একটা যে গোলযোগ ঘটে; তাহার বিষয় কিছু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয়, তুমি ঠিক ঠিক বলিতে পারিবে? কেননা কাল তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে।”

হরিচরণবাবু মনে করিলেন, জীওলপুর অঞ্চলে কাল সন্ধ্যার পর দাঙ্গা

হাসিয়া হইয়া গিয়া থাকিলে । রামদয়ালবাবু বুকি তাঁহার কথাই উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন । সুতরাং তিনি নিশ্চিতের ভাষা বলিলেন, “গোলযোগ ! কই—কিসের গোলযোগ ! এ কথা ত আমি কিছু শুনি নাই ।”

হরিচরণবাবু এই কথা শুনিয়া রামদয়ালবাবু যেন একটু আশ্চর্য্য হইলেন—বলিলেন, “সেকি ! একথা তুমি শোন নাই ! কাল সন্ধ্যার পর জীওলপুরের জমিদার বাড়িতে একটি লোককে ধর পাকড় করিবার জন্য বাড়ির সকল লোকই মাতিয়াছিল”—

হরিচরণবাবু এতক্ষণে রামদয়ালবাবুর জিজ্ঞাস্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওহো !” আপনি সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?”

রামদয়ালবাবু তাঁহার কথিত কথা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ ! আমি তোমায় সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, উহাতে আমার কিছু জানিবার বিষয় আছে ।”

—হরিচরণবাবু হাসিয়া বলিলেন, “উহাতে আপনার জানিবার কি বিষয় আছে ?—উহাত একটা হাসি ঠাট্টার প্রহসন !—একটা ছিঁচুকে চোরকে ধর-বার সম্বলিসি গোলমাল !”—

রামদয়ালবাবু কহিলেন,—তা যা হ'ক, উহাতে আমার জানিবার কিছু আছে, তুমি যাহাকে ছিঁচুকা চোর মনে করিয়াছ, বস্তুত সে তাহা নহে—সে আমারই একজন লোক ।”

রামদয়াল বাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া হরিচরণ বাবু যারপর নাই বিশ্বাসবিষ্ট হইয়া বলিলেন, বলেন কি মহাশয় ।

রামদয়ালবাবু বলিলেন, “হরিচরণ আশ্চর্য্য হইওনা । ভিতরে অনেক কথা, উহা তোমায় পশ্চাত বলিব ;—এ ব্যক্তি সচ্চরিত্র—আমার একজন বিশ্বাসী প্রজা ;—নাম বদরুদ্দিন । এখন আমি তোমাকে—”

বিশ্বয় বিহ্বল হরিচরণবাবু “বদরুদ্দিন” এই নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তিনি রামদয়ালবাবুর কথিত কথায় ব্যাঘাত জন্মাইয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বদরুদ্দিন !—কোন বদরুদ্দিন ?”—

রামদয়ালবাবু হরিচরণবাবুকে শিহরিয়া উক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া, ভিতরে কিছু আছে মনে করিয়া, তিনি তাঁহার কথিত কথা ছাড়িয়া তাঁহার কথার জবাব দিয়া কহিলেন, “বদরুদ্দিন—বিখ্যাত লাঠিয়াল বদরুদ্দিন, “তুমি বোধ হয় তাহাকে চেনা ।”

“গাঠিয়াল বদরুদ্দিন ?—যে জৌগুপুরের ছাঁদেবাবুর নিকট থাকিত ?—
খলিকার ভাই বদরুদ্দিন ?”

“হ্যাঁ”—সেই বদরুদ্দিন ?”

“সে আবার কবে থেকে আপনার প্রজা হইল ?”

“প্রায় দেড় বৎসর হইল ।”

“বলেন কি । হরিচরণবাবুর বড় কোতুহল জন্মিল । তিনি রামদয়াল-
বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেখানে তার কি হইল ?”

রামদয়াল বাবু বলিলেন, সেখানে তার স্থান হয় নাই ।

“কেন ? সেত বেশ কাজের লোক ।”

“কাজের লোক হইলে কি হইবে ; কুলধ্বজগণের মরজি ।”

“ওঃ ।” হরিচরণবাবুর এই “ওঃ ।” শব্দ বায়ুগর্ভে মিলিয়া যাঠিতে না
যাইতে রামদয়ালবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি “বদরুদ্দিনের নাম
শুনিয়া চমকাইলে কেন ?”

টানুবাবু বদরুদ্দিনকে গুলি করিয়া মারিলে, ইহা আমি তাহার মুখে শুনি-
য়াছি । তাই আমি আপনার মুখে সেই ছিঁচুকে চোরে বদলে আপনার
অল্প প্রজা বদরুদ্দিনের নাম মনে করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম ।”

এই স্থানে বলা উচিত, রামদয়ালবাবুর বদরুদ্দিন নামে আরো দুই তিনটি
প্রজা ছিল । ইহাদিগের প্রত্যেক হরিচরণবাবু চিনিতেন । তাই তিনি
তাঁহার মুখে ঐ নাম শুনিয়া চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বদরুদ্দিন ।—
কোন বদরুদ্দিন ?”

যাই হ'ক ; রামদয়ালবাবু এই সাংঘাতিক কথা শুনিয়া যার পর নাই
উদ্বেগপূর্ণ হইয়া যেন অধৈর্য্যবেগে বলিয়া উঠিলেন, “এ্যা—বল কি । টানু
বলিয়াছে যে বদরুদ্দিনকে গুলি করিয়া মারিবে ?”

হরিচরণবাবু বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ আমিও এইরূপ শুনিয়াছি ।”

রামদয়ালবাবু তাঁহাকে ঐ সাংঘাতিক কথা পূর্বাগর সমস্ত বলিতে অসু-
রোধ করিলেন ।”

হরিচরণবাবু তখন বলিতে লাগিলেন, “কাল যখন উহাদিগের মহলে
গান বাজনার আয়োদ নব-হল্লোড়ের বজ্রার মত খুব ছুটাছুটি করিতেছে,
তখন সহসা জনরব উঠিল, উহাদিগের পশ্চিমের বৈঠকখানার দিকে
একটি চোর ধরা পড়িয়াছে । তখন জনরবের সহিত গান বাজনার

জান পাববর্তন ।—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত কতক গীত ও প্রকাশিত । ১৭৩১ নং কর্ণওয়ালিস্ জাঁট্ কলিকাতা ; ভারত-দর্পণ গ্রন্থে মুদ্রিত ।

আমোদ কোথায় মিলাইয়া গেল । সকলে উর্দ্ধ্বাসে চোরধরা দেখিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও গেলাম ; কিন্তু চোরকে দেখিলাম না, কেবল সকলে গঙগোল করিতেছে দেখিলাম । এতক্ষণ আমি বাবু ভায়াদের জন্তে ফুরসোত পাই নাই—হাজতের আসামীর মত তাহাদের গেরায়ে নজরবন্দি ছিলাম । এই চোর ধরার গোলমাগে ফুরসোত পাইয়া সৌখিন বাবুদের নজর ছাড়াইয়া, যে বৈঠকখানায় গান বাজনা হঠতেছিল, তাহারই সম্মুখের পুষ্প উদ্যানে যাইলাম, বিশ্রামার্থ একটি ক্ষুদ্র পুষ্পবাটিকায় আশ্রয় লইলাম । ইহার কতক্ষণ পরে টাঁহুবাবু আর একটি—কে লোক ; তাহারা পরস্পর কথা কহিতে কহিতে আমার দিকে আসিতে লাগিল । তখন আমার মনে হইতে লাগিল, ইহারা আমার পুষ্পবাটিকাটি অধিকার করিবার নিমিত্ত শুভাগমন করিতেছেন । কি করি ; যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়, মনে করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইয়া পুষ্পবাটিকার পার্শ্ব বহির্ভাগে গিয়া দাঁড়াইলাম ; মনে করিলাম ইহারা পুষ্পবাটিকায় আসিয়া বসিলেই, আমি অমন নিঃশব্দ পদসন্ধারে অচ্যুত গিয়া বিশ্রাম লইব । কিন্তু উহাদিগের কথা ক্রমশঃ স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, কোতুহল বশতঃ আমাকে সে ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল । আমি উদ্বেগপূর্ণ হইয়া নিঃশব্দে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম । তাহারা ধীর পদসন্ধারে কথায় মাতিয়া পুষ্পবাটিকায় প্রবেশ করিল । টাঁহুবাবুর সঙ্গেই সেই লোকটি বলিল, “বদরুদ্দিন বেটা, ক্রমশঃ আমাদের স্ব্থের পথে কাটা হইয়া দাঁড়াইল দেখিতেছি ।”

টাঁহুবাবু বলিল, “তুমি ছুইদিগ সবুর করনা, আমি একবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসি ; তারপর দেখাইব,—বদরুদ্দিন বেটা কত বড়, আর আমি কত বড় । বেটা একবার এ্যাড়াইয়াছে বলিয়া কি, বার বার এ্যাড়াইবে ; এটা তুমি মনে করিও না ; আমার গুলি—বড় শক্ত গুলি । কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেটাকে ঠিক গুলি করিব—ঠিক গুলি করিব । আমাকে কে যেন বলিয়া দিতেছে—বদরের মরণ আমার গুলিতে ।” টাঁহুবাবু এই কথা বলিয়া নীরব হইল । তার পর যেন দ্রুত হইয়া বলিল, “আমার বড় দুঃখ যে, এ সময় কর্তা (পিতা) কেন আমায় কলিকাতায় যাইতে পজা লিখিলেন ।”

সে লোকটি উত্তরে টাঁহুবাবুকে যেন আশাস দিয়া বলিল, “এই পত্র

আমার সঙ্গে তোমার ভালর জন্যে আসিয়াছে, এই ধূয়া ধরিয়া তুমি কলিকাতায় গমন করিলে, তোমায় মান সম্পূর্ণরূপে থাকিবে। কেহ তোমায় কাপুরুষ বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিবে না যে, তুমি এই কামাদে কাণ্ডের গোলায়ালে ভয় পাইয়া কলিকাতায় পলাইতেছ। এই কথা বলিয়া সে লোকটি তাহাকে পূর্নরায় বলিল, “আমার কথা বুঝিতে পারিতেছ, আমি কি বলিতেছি?”

ট্যাঙ্ক বু বলিল, “হ্যাঁ—তা বুঝিতে পারিয়াছি; তবে ঐতিহাস্য ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক লওয়া হইল না, এই বা ছঃখ।”

এই কথার পর রামদয়ালবাবু হরিচরণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহা হইলে গোঁয়ার হতভাগাটা শীঘ্র কলিকাতায় যাইবে? কবে যাইবে?”

হরিচরণবাবু তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বলিলেন, “তিনি আজ ঐতিহাস্য কলিকাতায় গিয়াছেন, তাহারই গাড়িতে আমি আসিয়াছি।

রামদয়ালবাবু এই কথা শুনিয়া বদরুদ্দিনের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি আনন্দভর মনে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, “হরিচরণ! বদরুদ্দিনের কোন বিপদ নাই। কারণ; তোমার এই আকস্মিক আগমন স্বত্রে যখন এই সাংঘাতিক বিপদ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন উদ্ভাসিতের ঐ মড়মড় জলবিষবৎ অলীক হইয়া পড়িবে; ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি।”

তৎপরে তিনি আর কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া হরিচরণবাবুর বিশ্রাম হেতু তিনি তথা হইতে গাড়োথান করিয়া ঠাকুর মহলের দিকে আসিলেন,— তথায় দেখিলেন, বিস্তর অজুস্ত অতিথিগণ শালগ্রামজীর প্রসাদ লাভোন্ময় সমাগত হইয়াছে। তৎপরে চণ্ডীমণ্ডপের দিকে নজর ফিরাইয়া দেখিলেন, পুরোহিত ঠাকুর সেবার বসিয়াছেন। তখন তিনি স্নানের সময় হইয়াছে দেখিয়া, অস্থঃপুরে গমন করিলেন।

রামদয়ালবাবুর নিকটবর্তী একটি গ্রামে হরিচরণবাবুর বাস। ইনি এক সময়ে অদৃষ্ট বিপদ পড়িয়া যার পর নাই বিলাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ সময়ে একদিন একটি ঘটনায় তিনি রামদয়ালবাবুর স্নানকরে পড়িয়া তাহার বেকার জীবনে কতক পরিমাণে শান্তি লাভ হয়। ইনি বহুদিন গ্রহ-বৈজ্ঞান্য বশতঃ বেকার অবস্থায়, ইহার আশ্রয়ে কালান্তিপাত করিয়া, অবশেষে

তাঁহার কুপায় কএক বৎসর হইল; এই গ্রামের দশ ক্রোশ অন্তর কোন জমিদার তরফে একটি চাকরির সংস্থান হওয়ায়, তদবধি তথায় কন্ম করিতেছেন। ইনি মধ্যে মধ্যে যখন কন্ম হইতে ক্ষুদ্র অবসর প্রাপ্ত হইয়া বাড়ি আসেন, তখন তিনি রামদয়ালবাবুর সহিত অগ্রে দেখা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া, পরে আপনার বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। কন্মের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অবসরে বাড়ি আসিবার কালে, যেমন অগ্রে রামদয়ালবাবু বাড়িতে আসেন, তেমনি এবারও আসিয়াছেন। * * *

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।



“তুমি কেমন আছ ?”

রামদয়ালবাবুর বৃহৎ বাটী, এখন মধ্যাহ্ন ক্রিয়া কাণ্ডের পর নীরব স্থির;—যেমন বহু পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া শ্রমোপনোদন মানসে তন্দ্রাকালে আঙিদুর করিতেছে। পাছে, এই স্থগ বিগ্রামে ব্যাস্মাত জন্মায়, এই আশঙ্কায় দনের উজ্জল আলো, বিগ্রাম কাতর বৃহৎ বাটির মহলে মহলে, গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, —যেন স্থির হইয়া রহিয়াছে। মধ্যাহ্ন সঙ্গীরণ আপন ক্ষুদ্রগতি সংযত করিয়া, শ্রমাতুর আবাস ভূমির শুশ্রূষার হেতু, যেন ব্যঙ্গম উদ্দেশে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। কেবল এই বিশ্রাম বির-কারী ছরস্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকুল বিহঙ্গকুল দল বাধিয়া চঞ্চলগতি বালকগণের মত, তাঁকুর মহলের নীরব নির্জন প্রাঙ্গণে, কলরব করিয়া নাচিতে নাচিতে ক্রীড়া করিতেছে; কখন চতুর্দিকে কলরব ছড়াইয়া সমগ্র দল উড়িয়া গিয়া শাপগ্রামজির চত্বীমণ্ডপে নাচিতেছে, আবার কখন বা দল ভাঙিয়া পৃথক পৃথক দল গঠন করিয়া স্বরবে ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছে। এইরূপে নিকেরা দানা মতে উপভব করিতেছে। ইহাদের শাসনকর্তা নাই।

এতদিন আর কোথাও গোপযোগ নাই, কেবল সদবমহলে করাসোঁপবি উপাধান আশব কানরা, রামদয়ালবাবু ভাস্কর চর্চণ করিতে করিতে মৃদুস্ববে হাবচরণবাবুর সাক্ষত সদালাপে নিবৃত্ত রাহিয়াছেন । এবং ফরাসের অল্প অংশে পীড়িত চিনিবাস নিদা যাইতেছে । মস্তাপেক্ষা আন্দব মহলে সন্নিবিক শান্তি বিলাজ করিতেছে । অস্ত্রপুৰ-লাজী এখন আর কোন কক্ষে নিবতা নছেন , তিনি সকলকে আহাৰ কনাক্ষা অবশেষে আপনি আহাৰাদি সমাপন করিয়া, এইমাত্র গৃহ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ পবিত্র পবিচ্ছন্ন শুষ্ক প্রাঙ্গণের একপাশ্বে অঙ্গণ বিচ্ছিন্না তরুণাব স্নকোমল কমলীয় দেহখানি ঢালিয়া দিয়া বিগ্রাম লাভ করিতেছেন । হঠাৎ অন্ন সময়ের জন্ত, --তাঁও নিজের হৃদয় বিকল্পে, হঠাৎ না কানে স্বামীণ আদেশ লঙ্ঘন করা হয়, তাহ এই বিশ্রাম-টুকু করিতে হব । হঠাৎ তচ্ছা সমস্ত দৈনিক কাৰ্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকিলে বিশ্রাম করিব । হস্তে কার্য্য থাকিতে গ্রাম কি ? এই তেঁতু, এখানে উঁহাব সহিত রামদয়ালবাবু মনমানিচ্ছা দেখা বাস , এতদভিন্ন আর বোধাত নহে । রামদয়ালবাবু মনে করেন এইকপ বিশ্রাম বিরত পনিগ্রমে আশ্রয়ান হইবার সম্ভাবনা , তাই তিনি উপদেশ দ্বারা তাহাকে ঐ নিয়মে বাধ্য করিয়াছেন । আর রামদয়ালবাবু প্রাচীনা ভগ্নদয়, একান্তে নিজনে বসিয়া ঠাকুর সেবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্পিত আপন মনে সম্পন্ন করিতেছেন । বধু ও সামু তাহার খড়্গকর পুত্ৰ পাড়ে ঘে, শাক সব্জ । বাগান লাগাইয়াছে গাছ । তঁহাব-যানে রহিয়াছে ।

ঠিক এইকপ সময়ে সদর মহলে একাট লোক আসিয়া রামদয়ালবাবুকে প্রণাম করিয়া সংবাদ দিল, একটা বিদেশী ভজ লোক আপনার অনুগমন করিতেছেন । তিনি আপনার ছাদদেশে লোক জনের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন ।

এই কথা শুনিবামাত্র, রামদয়ালবাবু ভীতি পড়ে, ঠাকুর মহা পাব হইবা, সদব ছাবে উপনীত হই । দেখেন, একাট ভজলোক কতিপয় প্রবাসিক লোক জনের সহিত মণিগ মুখে উদ্বিগ্নবৃত্ত হইয়া তাহার দাবদেশে বেন এ কাণব সাক্ষাৎ অপেক্ষায় দাড়াইয়া আছেন ।

আগন্তুক ভজলোক, রামদয়ালবাবুকে দেখিবামাত্র নাবব আশ্বাসদানে অগ্রে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় । কি রামদয়ালবাবু ?”

বামদয়ালবাবু পোতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার নিকট বিনয় ভাবে
আত্ম প্রকাশ করিলেন ।”

আগন্তুক ভদ্রলোক ইহা অবগত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “সম্প্রতি মহাশয়েব নিকট চিনিবাস নামক কোন ব্যক্তি বিপন্ন
অবস্থায় বাস করিতেছে ?”

বামদয়ালবাবু কি ভাবিয়া, এই জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর না দিয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি কলিকাতা হইতে আসিতেছেন ?”

যুবক উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে,—আমি কলিকাতা হইতে আসিতেছি ।
আমার নাম অমিন্দ্রকুমার চৌধুরী ।”

বামদয়ালবাবু তখন চিনিবাসের স্থিতি জিজ্ঞাসা করিয়া, অমিন্দ্রবাবুকে
যথোচিত বিনীত মাদব সম্ভাষণ করিয়া গৃহীত করিলেন । হরিচরণবাবু
এতক্ষণ সেঁটখানে ছিলেন । তিনি বাহকদিগের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাহিরে
আসিলেন । নিদ্রিত চিনিবাস ঐ শব্দে জাগ্রত হইল । মহা মনিবেশ চির
পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ক্ষণেকে নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইয়া চঞ্চল গতিতে
শয্যাপরি উঠিয়া বসিল, উদগ্রীব হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।
প্রথমতঃ কিছুই দেখিতে পাষ্টল না, তৎপরে দেখিল, তাঁহার মনিব—বিকৃতস্ত্রী
অমিন্দ্রবাবু, বামদয়ালবাবু সহিত তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলেন ।

চিনিবাস যথাসম্মতি অমিন্দ্রবাবুকে অভিবাদন করিয়া, অসময়ে মহা
প্রিয়জন দর্শন হেতু, উচ্ছ্বাসিত হৃদয় বিগলিত বাষ্পবারি সমাকুল অন্তর
নয়নযুগলে তাঁহার প্রভু বিদ্যাদমাখা করণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, নীরবে
অব্যক্ত হৃদয়ভাব জানাইল ।

অমিন্দ্রবাবু বিপন্ন প্রবাসী অন্তর্গত ভূত্যা চিনিবাসের এই অবস্থা দেখিয়া,
ব্যথিত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া বসিলেন । জর্জরীভূত মনঃপীড়ায় ক্রমবর্ণ
বিশুদ্ধ চিনিবাসের বদনমণ্ডলে নিজ আন্তরিক সমানুভূতি দীপ্ত নয়ন মোলয়া,
বিধাদিত করণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “চিনিবাস তুমি কেমন আছ ?”

চিনিবাস উত্তর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাষ্পবারিভরা নয়নে, ঈষৎ
হিল্লোনিত তথ্যের জড়িত বসনায় উত্তর দিল, “ভগবান এখনও আমার
জীবিত রাখিয়াছেন ।”

অমিন্দ্রবাবু ইহা শুনিয়া তখন আর কোন কথা না কহিয়া, চিনিবাসের
আত্মস্থান দেখিতে চাহিলেন । চিনিবাস উদ্দেশ্যস্থ আবৃত বস্ত্র উন্মোচন

করিয়া ঊষ্ম এবং বস্ত্র আচ্ছাদিত ক্ষতস্থান দেখাইল। অমিত্রবাবু যদিও ক্ষতস্থান দেখিতে পাইলেন না, তবুও অনুমাণে ক্ষত পরিমাণ বুঝিয়া লইলেন, এবং রামদয়ালবাবু যথেষ্ট অনুগ্রহসহকারে যত্ন করিয়া বিধিমত অপরিচিত বিপন্ন চিনিবাসের শুশ্রূষা করিতেছেন ও নিজ কৃপাশ্রমে চিনিবাসকে আশু মৃত্যুগুণ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ইহা জাবিয়া অমিত্রবাবু রামদয়ালবাবুকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে বাহকদিগকে ডাকিয়া তাঁহার জব্যাদি যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে কিনা জানিয়া, বাহকদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দিলেন। বলা বাতিল্য রামদয়ালবাবু— অমিত্রবাবু চিনিবাসের সহিত কথোপকথন কাগিন তাঁহার মজ্জিত জব্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর অমিত্রবাবুর বিশ্রাম প্রয়োজন বোধে রামদয়ালবাবু হরিচরণবাবুকে তাঁহার সহিত মিষ্টালাপে নিযুক্ত করিয়া আপনি অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

তথায় রঘু ও সাগুকে ডাকিয়া বলিয়াদিলেন, আগ্রে সদর মহলে তাম্র-কূটের ব্যবস্থা করিয়া, অনিলদ্বৈ তথাকার নিভৃত পরিচর্যাগারে পরিচর্যা উপযোগী সমস্ত জব্যের আয়োজন করিয়া তাঁহাকে যেন ইচ্ছিতে কামখানায় সংবাদ জানায় এবং তাহার উভয়ে যেন তথায় উপস্থিত থাকে।

অনন্তর তিনি ভগ্নীদ্বয়ের নিকট গিয়া আদেশ করিলেন, অদ্য বৈকালিক আহার আয়োজন অপেক্ষাকৃত অধিক করিবে এবং অন্তঃপুর ভোজনাগারে তিনখানি আগনের সমাবেশ করিবে। উভাদি ব্যবস্থা করিয়া অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতেছেন। এমন সময়ে নিম্নোক্ত গৃহিণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইল। রামদয়ালবাবু তাঁহাকে জানাইলেন যে, চিনিবাসের মনিব, এতমাত্র হইল কলিকাতা হইতে এখানে পৌঁছিয়াছেন, তিনি যে কয়দিন অনুগ্রহ করিয়া এখানে থাকিবেন, সে কয়দিন তাহার নিত্য আহার উদযোগ ব্যাপারে তুমি বিশেষ সতর্ক থাকিবে। আর আমি ভগ্নীদ্বয়কে বৈকালিক ভোজনের আয়োজন করিতে বলিয়া আসিলাম। তুমি তথায় যাও, গিয়া ক্রটি সংশোধনে তৎপর হও।

এতদ্বাক্যোত্তর সমাপনান্তে তিনি অমিত্রবাবুর সম্মুখানে গিয়া বসিলেন ও বিনীত সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমিত্রবাবু রামদয়ালবাবুর উদারতায় ও স্নেহধূর মিষ্টালাপে যারপরনাই পরিভূষ্ট হইয়াছিলেন।

এদিকে রঘু আসিয়া ঈদ্রিতে রামদয়ালবাবুকে জানাইল, আদেশ অনুযায়ী পরিচর্যাগুষ্ঠান করা হইয়াছে।

রামদয়ালবাবু রঘুকে তাকুট দিতে কহিলেন। রঘু তাকুট দিয়া পূর্ন আজ্ঞানুযায়ী তণায় গমন করিল। তাকুট সেবনান্তে রামদয়ালবাবু অসিদ্ধ-বাবুকে অনুরোধ করিয়া জানাইলেন, তাঁহার পরিচর্যার সকলই প্রাপ্ত, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেই হইল।

অসিদ্ধবাবু ঈষ্টিমার ও পথপ্রাপ্তি দূর করিবার নিমিত্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইবার মানসে রামদয়ালবাবুর অনুসরণ করিয়া পরিচর্যাগারে প্রবেশ করিলেন।

এই পরিচর্যাগার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পল্লিয় কচি অনুসারে গঠিত ও আয়োজিত। উহাতে প্রবেশ করিয়া রামদয়ালবাবু অসিদ্ধবাবুকে আপ্যায়িত বাক্যে বহিলেন, “মহাশয়! নিজ বাটী মনে করিয়া পরিচর্যার ব্যবস্থা ও লৌকিক অনুষ্ঠানের ক্রটি মার্জনা করিয়া, মহাশয়ের যাবতীয় নিত্যক্রিয়া সম্পাদনার্থে নিঃসঙ্কচিত চিত্তে অনুজ্ঞা করিলে, আমি বিশেষ বাদিত ও আনন্দিত হইব।” ঈদৃশ ভদ্রতায় অসিদ্ধবাবুকে মোহিত করিয়া, তাঁহার হৃদয় হইতে সঙ্কচিত ভাব অপসারিত করিয়া, তিনি তথা বহিতে নিঃপ্রাপ্ত হইলেন। মায়ু কেবল তাঁহার ঈদ্রিতক্রমে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

এই স্থানে বলা উচিত, রামদয়ালবাবু নিজ অবস্থার সাধ্যমত অসিদ্ধ-বাবুর যত্ন লইতে ক্রটি করেন নাই। কেবল পরিধেয় বস্ত্র বাতাত (তাচাও অসিদ্ধবাবুর একান্ত ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া) আর আর যাবতীয় আবশ্যকীয় সামগ্রী যোগাইয়া তাঁহার যথোচিত সযত্ননা করিয়াছিলেন। ইহা যদিও অতিথি অসিদ্ধবাবুর উপযুক্ত হইয়াছিল, তজ্জাচ ইহাদিগের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক না থাকায়, তিনি ইহাদিগের এই সকল সযত্ননায় ও যত্নে যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট থাকিলেও, সময়ে সময়ে সঙ্কচিত ভাব আসিয়া তাঁহাকে বিমর্ষ করিত। কিন্তু এতাব রামদয়ালবাবুর অকৃত্রিম উদারতায় ও স্বাভাবিক সদ্যবহারে ও তাঁহার মধুময় মিষ্টীলাপে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিত না।

যাই হ'ক ; ইহার কিছুক্ষণ পরে, অসিদ্ধবাবু পারিপ্লব পরিচ্ছন্ন হইয়া, রঘুর সমভিব্যাহারে পরিচর্যাগার হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইবামত

সামু তাঁহাকে বরাবর অন্তঃপুর মধ্যে ভোজনালয়ে—যেখানে রামদয়ালবাবু ও হরিচরণবাবু তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন তথায় লইয়া গেল । রামদয়ালবাবু তাঁহাকে মাদর সন্তোষণ করিয়া সজ্জিত বৈকালিক আহার আশ্রমে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন ।

অসিদ্ধবাবু বিনয় নম্র ভঙ্গিতে সতকারে আগে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন, পরে তিন জনে একত্রে এক পুষ্কিতে মারি মারি উপবেশন করিলেন ।

—

চতুবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—॥॥॥—

“আমার পরিজ্ঞান নাই ।”

অসিদ্ধবাবু পত্রোক্ত নির্দিষ্ট সময়ে না আসিয়া এত দীর্ঘ আসিলেন কেন ? এবং সেইরূপ সাংঘাতিক বিপদবার্তা পাইয়া, তিনি পত্রে বিশেষ আগমন বার্তা লিখিয়াছিলেন কেন ? তাহার কারণ ; আমার অনুমান তাহার মতিভ্রম প্রাপ্ত অস্থির চিত্তের ফলস্বরূপ । কিন্তু কি ভাবনার বশবর্তী হইয়া ঐরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি সঠিক অবগত নহি ।

সেই হ'ক ; তাঁহার সকলে আহারাদির পর পুনরায় সদর মহলে আসিয়া বসিলেন । বলা বাহুল্য সামু ইতিপূর্বে চিনিবাসকে তাহার বৈকালিক আহার হস্ত কটী খাওয়াইয়া গিয়াছিল । চিনিবাস এখন একটু সুস্থ ।

কিয়ৎক্ষণ পরে অসিদ্ধবাবু চিনিবাসকে সেই বিপদ সংক্রান্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন সেই সজ্জাকর নিদারুণ সাংঘাতিক ঘটনার কথা শ্রবণ

লেন, এবং তাঁহার বিনামূল্যে সেট হতভাগিনীকে সমভিন্যাসে বঠা বাটার বাহির হইয়াছিল কেন ? জানিলেন । তখন তাঁহার বদনমণ্ডল লজ্জায় অপমানে, ফোভে, ছুখে রক্তিম বর্ণ হইল এবং তিনি ছোটগু হইয়া নীরব রহিলেন ।

চিনিবাস এষ্ট সকল বিবৃত করিয়া কাতর মনের আবেগে, অসিদ্ধবাবু পদধারণ করিয়া লুটাইয়া পড়িল, “বাবু ! আমার প্রতিপালক—প্রিয় মনিব ! অজান অদম দাসের অপরাধ মার্জনা করুন, আপনি আমার অপরাধ মার্জনা না করিলে, আমার পরিজ্ঞান নাষ্ট ।”

অসিদ্ধবাবু কিংকর্ণ ঐক্লপ নীরব থাকিয়া, যেন কোন আশ্চর্য্যকর কথা দেগিয়া স্থপ্তোখিত নিজাঘোরে মথেন্দে সবিস্ময়ে আপনাকে ধীংকার দিয়া বলিলেন, “তোমার কি অপরাধ চিনিবাস ? আমার মোহান্বিতায় ঐক্লপ ঘটয়াছে । ইহাতে তোমার অপরাধ কি ? ইহার অপরাধী আমি । যে হতভাগ্য পুরুষ নিজ মনিষ্য কণ্ঠভরণের মর্যাদা না বুঝিয়া সেই অমূল্য কণ্ঠ-রত্ন কণ্ঠচ্যুত করিয়া সামান্য হিরণ্য হার গলায় পরিয়া, কণ্ঠ ভুষিত করিতে চায়, তাহার ভাগ্যে ঐক্লপ ঘটয়া থাকে ; চিনিবাস ! ইহার জন্ত তুমি কেন অনুতাপ করিয়া ছুগ পাইতেছ ; ইহার প্রকৃত অনুতাপকারী আমি—অনন্তকাল অনুতাপ বরিবার অধিকারী আমি । ইহাতে তুমি বৃথা অনুতাপ করিয়া কষ্ট পাইতেছ কেন ।—চিনিবাস ? আমি হৃদয়হীন—ঘণিত হয়,—কাপুরুষ । তাহা না হইলে, আমার ভাগ্যে ঐক্লপ ঘটবে কেন ? আমি সামান্য হিরণ্য হার গলায় পরিয়া স্বেচ্ছায় অমূল্য মনিষ্য কণ্ঠরত্ন হারাইব কেন ? ইত্যাদি বাতুল আক্ষেপ বাক্যে সেই স্থান পরিপূরিত করিয়া ফেলিল ।

চিনিবাস তাঁহার প্রভুর দীর্ঘ ভাবে সন্তুষ্ট হইয়া আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না ।

রামদয়ালবাবু এতক্ষণ প্রভু এবং অনুগত ভৃত্যের খেদোক্তি শুনিয়া হৃদয়ে ছুগ অনুভব করিতেছিলেন ।

এখন অসিদ্ধবাবুকে অনুতাপে নিতান্ত বিহ্বল দেগিয়া তাঁহাকে প্রচুর মার্জনা করিবার আশায় তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে বলিলেন, “মহাশয় মানুষ অদৃষ্টের দাস,—অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটয়াছে । তাহার জন্ত বৃথা অনুতাপ করা পুরুষের ধর্ম্য নহে ; উপস্থিত বিপদে বৈরাগ্য ধরিয়া

১৭৩১ নং কণ্ঠওয়ালিন্দু ঐক্লপ কণ্ঠকিতা ; ভারত-দর্পণ প্রেসে মুদ্রিত ।

তাঁহার প্রতিবিমানে বঙ্গীণা হওয়া জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের কর্তব্য। ‘অতঃ-
এব আপনি এ বিষয় উগ্ৰাঙ্গি-বাক্যে না হইয়া হইয়া কর্তব্যতা তাব
খানে গতি স্থির করুন।’

তারপর তিনি তাঁহার জোর অনুসন্ধান বিষয়ে ইতিপূর্বে আপন
মনে যেরূপ কর্তব্য স্থির করিয়াছিলেন, (অবশ্য গাঙ্গী বিষয় হইয়া
গিয়াছে তাঁহার বিষয় গোপন করিয়া) তদবিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন;
দেখুন একেপ অল্পসন্ধান আম আপনার উপকার করিতে পারিব, এরূপ
আশা করি।

অসিদ্ধবাবুর বিকল প্রাণ ইহাতে প্রবোধ মানিল না। তিনি রামদয়ালবাবু
প্রতি কৃতজ্ঞ ভাব দেখাইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখপূর্ণ বচন বলি-
লেন, আমি আপনার সহায়তাওণে চির কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি দুঃখে
মহিত বলিতেছি, আপনি পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন না।
কেন না আমি নিশ্চয়ই জানি, তিনি ইহ জগতে আর নাই। তিনি
এতাদৃশ অপমান সহ্য করিয়া কখনই জীবিত থাকিবেন না।

রামদয়ালবাবু বলিলেন, “ইহার কিছু নিশ্চয়তা নাই,—যেহেতু ইহা অদৃষ্ট।
আপনার এরূপ অনুমান, তাঁহার ভাববাসা কারণ। যাই হ’ক; আপনি
হতাশ হইবেন না।”

রামদয়ালবাবুর দীর্ঘ আশাস বাক্যে উত্তর, অসিদ্ধবাবু একটি উত্তর
দীর্ঘনিশ্বাসে পর্যবসিত হইল।

হরিচরণবাবু এতক্ষণ অবাক হইয়া উঠা দিগেব পরস্পরের কথোপকথন
শুনিতেন। এখন বুঝিতে পারিলেন, কি কারণবশতঃ রামদয়ালবাবু
তাঁহাকে জীওনপূর্বক কথা একটি একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন
এবং এই সূত্রে, গতকলা নিশাযোগে জীওনপুরের কুদধ্বজগণের আলোচিত
গুপ্ত কাহিনী তাঁহার শ্রুতিপথে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার স্বদয়ে আতঙ্কের
সঞ্চার হইতেছিল।

অকস্মাৎ এই সময়ে রামদয়ালবাবুর দৃষ্টি চিনিবাসের উপর নিপতিত
হইল। তিনি সর্বস্বয়ে দেখিলেন, চিনিবাসের সঙ্গ শরীর ঘন ঘন কম্পিত
হইতেছে। তাঁহার রক্ত নিম্পত্ত নয়নকোণে যেন কোন অটনৈমগিক উপায়ে
অগ্নি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহা বিদ্যাক্রমে ভূগড়ে প্রবেশ করিতেছে। সমস্ত
তাঁহার এই ভাবান্তর হইল কেন? রামদয়ালবাবু ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া অণ-

গত হইলেন —প্রাচীন্সী। —তাহাদিগের কথাশ্রুতে সেই সমস্তান অবতার-
দিগের কথা তাহাব মনোমবো উদীপিত হওয়ায়, বিজাতীয় ক্রোধবশত
তাহাব এই ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। কথ অবস্থায় দুর্জয় শরীনে এইকপ
উৎসাহনা শুভকর নাহ। এইহেতু তাহাকে এ বিষয় সাবধান কবিবার
নিমিত্ত হিত উপদেশ দ্বাবা তাহাকে প্রকৃতিস্থ কবিলেন।

তাবপব সেই দিবস এমন বিশেষ কোন কথা হয়। নাই—যাহা
উল্লেখ যোগ্য।

হবিচরণবাবু বামদয়ালবাবুর অনুবোধে সে দিবস বাটি যাইতে পাবি-
লেন না। অধিকন্তু তিনি তথায় আসিয়া অবসর মত অসিদ্ধবাবুব
যথাসম্ভব সাহচর্য্য গ্রহণ কবিত অল্পকাল হইলেন। বলা বাহুল্য পরকৃত্যঃ
কর্তব মহদয় বামদয়ালবাবুব ঈদৃশ ব্যবস্থায় ও সুভাব সঙ্গিত্ত বিগুঢ়
অন্তঃকরণ হবিচরণবাবুব সাহচর্য্যগুণে অসিদ্ধবাবুব সেই ৬ঃসময়ে—সেই
দুঃখেব প্রবাস জীবনে কথঞ্চিৎ স্তৈর্য্য সম্পাদন হইয়াছিল।

—

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—প্রাচীন্সী—

“এঁয়া!—কি বলিলে?”

আবার পবদিন মধ্যাহ্নকালে মদর মহলে যরাসোপরি রাম-
দয়ালবাবু এবং অসিদ্ধবাবু উভয়েই বিশ্রাম আগীনে সমধীন। চিনি-
বাস তাহার শয্যায় শায়িত অবস্থায় জাগ্রত। সে তাহাব মনিব ও
তাহাব আশ্রয়দাতাব মনো যে সকল কথা হইতেছিল, তাহা একাগ্রমনে
শুনিতেন। কিন্তু কি হুণে তাহাদিগের প্রবক্ষ্যের মনো চলিত প্রমদ

উঠিয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা ছক্কর। তবে আত্মমানিক কণার উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে, সম্ভবত অসিদ্ধবাবুর পরিচয় প্রসঙ্গে এ কথা উঠিয়া থাকিবে।

যাই হ'ক ; অসিদ্ধবাবু কহিতেছেন, “দেখুন কলিকাতার মত অমন স্থানের স্থান আর নাই। আমাদিগের গ্রাম (দেশ) অপেক্ষা আমি কলিকাতায় থাকিতে বড় পছন্দ করি। কেননা তথায় কোন অভাব নাই, অধিকন্তু সে স্থান অতি নিরাপদ, নিঃসঙ্কচিত চিত্তে,—কি রাবি, কি দিন, তথায় বিচরণ করা যায়।”

এই কথাগুলি শুনিয়া রামদয়ালবাবুর মহলা চিত্তটোলকণা ঘটিল।—যেন তাহার হৃদয়পটে কোন একটি লুকাইত গোপস্বপ্ন পুনরুদীয় হইয়া তাহার প্রশান্ত বদনমণ্ডল স্নান করিয়া ফেলিল, তিনি মজ্জাথে যুগার সহিত কলিকাতা নগরের নিন্দাবাদ করিলেন এবং কথিত প্রসঙ্গের পরিবর্তে অল্প প্রসঙ্গ উত্থাপিত হউক, ঈদৃশ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

মহলা উক্ত প্রসঙ্গে, রামদয়ালবাবুর ভাবনাতীত মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে অসিদ্ধবাবু যাবপন্নাই সঙ্কচিত ও আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি রামদয়ালবাবুর বিষাদ কুআটিকামিকৃত বদন পানে তাকাইয়া ভাবিলেন,—এ—কি!—মহলা ইহার মোম্যমুষ্টি, ঈদৃশ বাক্যাবলীতে মলিন ভাব ধারণ করিল কেন? আমি কি অজ্ঞতানিবন্ধন এই কথাপ্রসঙ্গে ইহার কোন ছঃখপূর্ণ সমুপ্ত স্মৃতির পূর্বাভাস আনয়ন করিয়াছি? অসিদ্ধবাবুর চিন্তাপ্রস্রোত এই স্থানাভিমুখে আসিয়া অল্প দিকে ফিরিল।—আচ্ছা ইহার ভিত্তর কি—এমন বিষয় থাকিতে পারে; যদ্বারা এরূপ দাশজিন্দাসম্পন্ন ব্যক্তির—হৃদয় পরাহত ঘটনার পূর্বাভাস স্মৃতিপথে পড়িয়া যুক্তি তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল।

এই আংশিক শাখা চিন্তার সঞ্চিত অসিদ্ধবাবুর কোতুহলেরও উদয় হইল; তিনি ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। আবার পরক্ষণে ভাবিলেন, যদি কোন অপেক্ষাকৃত বিষয় হয়; তাহা হইলে আমার ইহা জিজ্ঞাসা কিরূপে অত্যাশ হইবে। অসিদ্ধবাবু উহা ভাবিয়া আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তদ্বিষয়ে নিরত রহিলেন।

এমন সময়ে হরিচরণবাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার ভাব প্রকটময়। তিনি তাহাদিগের মৌনভাবের প্রতি প্রফা না করিয়া,

আগ্রহ সহকারে বেনা—সময় পাউয়া, তাঁহার হৃদয়কন্দর হইতে রোদিত আনন্দস্রোত সঞ্চিত বাক্যলহরী রসনাগ্রে প্রবাহিত হইল, “সেই লাগল সন্ন্যাসী অনেকদিন পরে আবার নাকি বালকনাথঘাটে দেখা দিয়াছেন ?”

রামদয়ালবাবু হরিচরণবাবুকে কিছু বেন বলিতেন ; কিন্তু তিনি হরিচরণবাবুর প্রসূত উক্ত কথা শুনিয়া সহসা তাঁহার মৌনতা অপসারিত হইল । তিনি আকুলিত বিশ্বাস-সংস্কারিত নেত্রে ব্যস্ততা সহকারে আনন্দ-গদগদ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এঁা—কি বলিলে ! তিনি আসিয়াছেন ! তুমি কাহার নিকট হইতে এ সংবাদ পাইয়াছ ?

হরিচরণবাবু বলিলেন, “আমি নদীতে স্নান করিতে গিয়া শুনিয়াছি এবং এখন আপনার নিকট আসিবার কালে পথেও এই কথা শুনিলাম ।”

রামদয়ালবাবু উদ্বেগিত আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন, “বটে !—হরিচরণ তবে আর কি ! এতদিনে প্রভু আগায় কৃপা করিয়াছেন—এতদিনে আমার সময় আসিয়াছে ; বলিতে বলিতে সেই প্রবীণ পুরুষের নয়নযুগল হইতে প্রেমাত্ম দরদর ধারে বিগলিত হইতে লাগিল । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কথঞ্চিৎপ্রকৃতিস্থ হইয়া অমিষ্টবাবুকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “মহাশয় ! চলুন না, একবার সাধু সন্দর্শন করিয়া আসি ।”

অমিষ্টবাবু এতক্ষণ নিব্বাক নিঃসঙ্গ একাত্রা উৎসুক চিত্তে বিস্ত্রিত ঢকল নেত্রে পরস্পরের ভানভঙ্গি অবগোকন করিতেছিলেন ও তাঁহাদিগের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিলেন । তৎপরে রামদয়ালবাবু তাঁহাকে বাগ্ৰতার সহিত সাধু সন্দর্শনে তাঁহার সহগামি হইতে অনুরোধ করিলে, তিনি কৌতুহল চিত্তে তাঁহার সহগামি হইতে সন্মত হইলেন ।

হরিচরণবাবু বলিলেন, “দেখুন অগ্রে আমি বালকনাথঘাটে গিয়া এ সংবাদের সত্যতা জানিয়া আসি ; তৎপরে আপনারা যাইবেন ।”

রামদয়ালবাবু কহিলেন, “না হরিচরণ এক সঙ্গে যাইবে ; তুমি একটু অপেক্ষা কর ।” এই বলিয়া রামদয়ালবাবু অরিত পদে অন্তপুরে গমন করিলেন ।

অমিষ্টবাবু হরিচরণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় ! তিনি কে ? তাঁহার নামে হনি এতাদৃশ অধীর হইলেন কেন ?”

হরিচরণবাবু কহিলেন, “তিনি কে ? তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে পারি নাই । তিনি কখন উন্মাদ, কখন পরম জ্ঞানি, কখন

বালক, আবার কখন বা তিনি অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়া অদ্বিতীয় পরম পুরুষরূপে প্রতিয়মান হন । কতিপয় বৎসর গত হইল । তিনি একবার কৃপা করিয়া স্বইচ্ছায় এই বাটিতে পদার্পণ করিয়া শালগ্রামজীউর আরতি দর্শন করেন এবং রামদয়ালবাবুকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়া যান । আমি আবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করিলে, তুমি কোথাও গমন করিবে না । তীর্থ দর্শনে তোমার এখন নানা বিষয় । এই কএকটি কথামাত্র বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হন । রামদয়ালবাবু কোন শোচনীয় দুর্ঘটনায় যাবত কতিপয় বৎসর ধরিয়া অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন, তাঁহার উদাস লক্ষণ সকল প্রকটিত হইয়াছিল । সেই কারণে তিনি তীর্থ পর্য্যটনে জীবন অতিবাহিত করিবেন মনে করিয়াছিলেন ; তীর্থ পর্য্যটনের সমস্ত প্রস্তুত । এমন সময় তাহার পূর্ব দিবস সেই মহাপুরুষ শালগ্রামজীউর আরতি কালীন উপস্থিত হইলেন । রামদয়ালবাবু পূর্ব হইতেই তাহার অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনিয়া মনে মনে তিনি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন । আশ্চর্যের বিষয় ; তিনি যে দিবস এ বাটি পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার পরদিবস হইতে রামদয়ালবাবুর ভাবনাতীত পরিবর্তন দেখা গেল । এত হা হতাস, এত আত্মগ্লানি, এত উদাসীনতা ইত্যাদি মন বৈকল্য, এক কালে সব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল । তদপূর্বে সকলেই মনে করিয়াছিলেন ; ইনি এ জীবনে শোক সম্ভাপিত হৃদয়ে আর শান্তি পাইবেন না । আরও আশ্চর্যের বিষয় সেই অবধি আর কেহ সেই সাধু মহাত্মাকে দেখিতে পান নাই ।

ইহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় রামদয়ালবাবু অন্তপুর হইতে ফিরিয়া আগিয়া বলিলেন, “আরও সাগাথ্র অপেক্ষা করিতে হইবে । রথ বাহিরে গিয়াছে, সে ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে কিছু বলিয়া যাইব ।

ইহা শুনিয়া সাধুদর্শন আকাজক্ষায় উতলা হরিচরণবাবু নিঃশব্দ আশ্রয় আরও চকল হইলেন এবং এই সংবাদ বাস্তবিক ঠিক কিনা জানিবার জন্তও ব্যাকুল হইলেন । তজ্জন্ত তিনি কহিলেন “অগ্রে আমি গিয়া দেখিয়া আমি, ইহা সত্য কিনা । যদি তাহা না হয় ; তাহা হইলে আপনি গিয়া কষ্ট করিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিবেন ।”

রামদয়ালবাবু হাসিয়া বলিলেন, “হরিচরণ ! সাধু দর্শন লাভ আশায় গিয়া যদি তাহাতে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়াও আসি, তাহাতেই বা কষ্ট কি ? বুঝিলে তুর্ভাগা ক্রমে এ স্তম্ভ সংবাদ মিথ্যা হইল ।

পরন্তু তিনি হরিচরণবাবুর আগ্রহ দেখিয়া আনন্দিত মনে তাঁহাকে অগ্রগামি হইতে কহিলেন । অমিত্রবাবুও হরিচরণবাবুর সহিত অগ্রগামি হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । রামদয়ালবাবু তচ্ছুরণে উভয়কেই অগ্রগমন করিতে কহিলেন । তখন উভয়ে বালকনাথঘাটামুখে গমন করিলেন ।

অমিত্রবাবু হরিচরণবাবুর সহিত অগ্রগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কেন ?—তাহার কারণ আছে ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।

“বিফল মনোরথ ।”

বালকনাথ ঘাট ইহা একটা প্রসিদ্ধ গ্রামা তীর্থ । চঞ্চলা নদীর তীর-বর্তী স্থানে অবস্থিত । এই বালকনাথঘাট সম্বন্ধে একটা বিস্ময়কর জনশ্রুতি আছে । একদা এই গ্রামস্থ কোন একটা ব্যক্তি বিষম ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল । সে বহু চেষ্টা করিয়াও তদ্বিষয়ের শাস্তিবিধান করিতে পারে নাই । অবশেষে তাহার বিড়ম্বিত মরুময় হতাস প্রাণে অনন্তোপায় হইয়া মরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাই সেই ভ্রান্ত হতভাগ্য পুরুষ একদিন নিশাকালে আত্মঘাতি হইবার আশায়, চঞ্চলার তীরবর্তী হইয়া সাধারণের অব্যবহার্য ঘাটে—যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল বেষ্টিত অশ্বখ ও বটরক্ষ পল্লবের সংমোজিত বা বন্ধুত্বসূত্রে সম্মিলিত । তাহার তলদেশে গিয়া তাহার বাতুল প্রাণ, তাহার দোহলায়ান মরণ কামনাকে স্থির মঞ্চের আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল । কিন্তু ভবিতব্য অখণ্ডনীয় ; সেইখানে ভ্রান্তবেশে সৌভাগ্য

লগ্নে দিবা অগ্নাদা ঐযথ প্রাপ্ত হইয়া রোগমুক্ত হইল এবং অগ্নাদেশ মত তথায় সেই ব্যক্তি কর্তৃক দেবমন্দির নির্মিত হইল ও তাহাতে বালকনাথ দেব নামক শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল ।

এইরূপে ঐ আব্যবহার্য স্থান দৈবমাধ্যম্য কালে গ্রাম্যতীর্থ—বালকনাথ-ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইল ।

ইতিপূর্বে যে মহাপুরুষের বিষয় উক্ত হইয়াছে, তিনি এই গ্রামে পদার্পণ করিলে, সেই যুগ্ম বন্ধু মহাপুরুষ তলদেশে নিজ আসন স্থাপন করেন । এখন এই গ্রাম্য তীর্থে বালকনাথ দেব দর্শন লাগসায় বহুস্থান হইতে বহুলোক আগমন করিয়া থাকে ।

এখন মধ্যাহ্নকাল প্রায় অবসান । এই সময় চরিত্রবাবু ও অসিদ্ধ-বাবু উভয়ে সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধীয় নানা কথায় সময়াতিবাহিত করিয়া অবশেষে বালকনাথঘাটে আসিয়া পৌঁছিলেন । যেখানে সেই মহা পুরুষ উপবিষ্ট থাকেন, সেইখানে গিয়া দেখিলেন, কেহ নাই । চরিত্রবাবু একটু অগ্রসর হইয়া ইষ্টক নির্মিত বালকনাথ-চত্বরে যে, কয়েকটি বেকার সন্ন্যাসি বেশধারী লোক বসিয়া পরস্পর চাফালাপে আঘোদ উপভোগ করিতেছিল । তিনি তাহাদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে যে সাধু পুরুষ আসিয়াছেন, তিনি কোথায় আপনারা বলিতে পারেন ?”

প্রথমতঃ তাহারা এই কথা শুনিয়াও শুনিল না । দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করায়, তাহাদিগের মধ্যে একজন উপহাস বাজক কৌতুকের হাসি হাসিয়া কহিল, “আপনি কোন্ সাধু পুরুষের অনুসন্ধানে আসিয়াছেন ? যিনি বৈদ্যনাথ হইতে আসিয়াছেন,—তাহাকে কি তারা ইহলে বলিতে পারি ।” এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাদিগের দলস্থ অন্য এক ব্যক্তিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া কহিল, “উনি !—আমরা সকলে উহার ঢেলা । এখন আপনি বলুন ; কি আবশ্যক বশতঃ উহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন । ভাগ্য গণনা করাইবেন না ঐযথ লইবেন ।

চরিত্রবাবু উহাদিগের ঐরূপ কথা শুনিয়া একটু হাসিলেন, এবং আব কোন কথা না কহিয়া অদূরবর্তী অসিদ্ধবাবুর নিকট আসিলেন । পবে চরিত্রবাবু বালকনাথদেব মন্দিরভিত্তিতে গমন করিয়া তথায় কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আনিগেন সেই মহাপুরুষ আসিয়াছেন, ইহা সত্য সংবাদ ।

১৭৩১ নং কর্ণওয়ালিস্ ড্রিট, কলিকাতা, ভারত-দর্পণ প্রেসে মুদ্রিত।

জনব নিষ্ঠাস্ত্র অমূলক নহে দেখাচ্ছিল, ভাবিয়া হবিচরণবাবু উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু উপস্থিত সাধুব শ্রীচরণ দশনে বঞ্চিত হইল। কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া তবৎ এই ক্ষণ-ভাব তাহার হৃদয়ে জল নিদ্রাবৎ অস্থায়ি হইল। তিনি মান কবিলেন, রামদয়ালবাবুর আগমন অপেক্ষায়, আমাদেব এখানে যে সময় ব্যয় হইবে, তাহার মধ্যে বোধ কবি, সেই মহাপুরুষ তাহার স্থানে আসিয়া আমাদেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তখন ইহা ভাবিয়া হবিচরণবাবু আসক্তবাবুর অভিশ্রম গল্পমাবে উভয়ে চঞ্চলাব তীব্রত্বী হইলেন।

উভয়ে যে কারণে তটিনী চঞ্চলাব তীব্রত্বী হইয়াছিলেন, তাহা সফল হইল না। প্রাকৃতিক সময় গুণে, চঞ্চলার চান স্বভাব, তাহাদিগেব তৃপ্তকর হইল না। কিন্তু ইহাতে ভাগ্য বিপর্যাস্ত্র অমিন্দবাবুর মানন ভাবাক্রান্ত শৃঙ্খল হৃদয়খানি, কি এক গভীর উদাস ভাবে আনীত হইয়া, বিবচ বিধুব আমিন্দবাবুর নিপীড়িত স্মৃতি আঘাত লাগু হইল।

সময়গুণে—স্থান মাহাজ্যো, প্রাকৃতিক মরম অথবা নীরম দৃশ্য সমাবেশে মানব প্রকৃতির এইরূপ অবস্থাস্থা ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই ব্যাপারে ছদ্মবেশগ্রস্থ, বিকল, হতাশা মানব—আমিন্দবাবুর সচসা তটিনী চঞ্চলার নীরম স্বভাব চিত্র দশনে মানসিক ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

তটিনী চঞ্চলার তদানীন্তন প্রাকৃতিক অবস্থা দেখিয়া, তাহার মনে জাগিল—এই বেগবতী চঞ্চলা বুঝি তাহার মত। প্রিয়জন-বিনাহে উন্মাদিনীর স্থায় উদ্ভ্রান্ত প্রাণে, বিজন সৈকতে ভূমি উদ্ভ্রান্ত করিয়া কুল কুল ককণ ক্রন্দন করিয়া প্রিয়জন উদ্দেশে ছুটিতেছে,—তাহার প্রিয় সঙ্গম হইবে। সে জানে তাহার প্রাণেশ্বর কোথায়। কিন্তু হায়! আমি নিশ্চেষ্ট, নিষ্ঠুর অদৃষ্টবশে আমি বিভ্রান্ত প্রিয়া সঙ্গিনীর কোন চেষ্টা করিতেছি না। হায় লাঞ্ছিতা অভিমানিনী! এতদিন আমি বিহনে জীবিতা আছি কি? না কখনই না—আমার মত হৃদয়হীন মহাশয়ী কাপুরুষের জন্ত,—মেকি এখন জীবিতা আছে। কখনই না, আমি নবাবম।—

হবিচরণবাবু সহসা আমিন্দবাবুকে অস্বাভাবিক গাভির্যো পূর্ণ হইতে দেখিয়া তাহার প্রতি তাকাইলেন,—নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিলেন, আমিন্দবাবু মুখমণ্ডল গভীর চুশ্চিন্তায় মান হইয়াছে। সহসা তাহার এইরূপ ভাবান্তর ঘটা

স্থান পরিবর্তন।—শ্রী অমিন্দবাবু চিত্র দত্ত কট্টর প্রণীত ও প্রকাশিত

কেন ?—ভাবিয়া চরিত্রবণবাবু আশ্চর্য হইলেন—“বস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
“মহাশয় ! আপনি মহাশয় বিষয় হইলেন,—কি ভাবিতেছেন ?”

অমিত্রবাবু চমক ভাঙ্গিল । অমিত্রবাবু আত্মগোপন করিয়া কহিলেন, “কষ্ট না ?”

চরিত্রবণবাবু বুঝিলেন, অমিত্রবাবু তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতেছেন । তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তরিত হইয়া বলিলেন, “অমিত্রবাবু ! আপনি আমাকে গোপন করিতেছেন, কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আপনার হৃদয়ে কি এক তরঙ্গ উথিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা আপনি অস্থির হইয়াছেন । আমি বুঝিয়াছি—সেকি ; দেখুন আমি আপনার বন্ধু, আমার নিকট আপনি কথা গোপন করিতেছেন ।”

অমিত্রবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, “দেখুন আপনার নিকট আমার কোন বিষয় গোপন করিবার নাই, আমার মনের জ্বরের কথা আপনাকে সব বলিতে পারি ।”

মহাশয় অমিত্রবাবুর কথায় নান্দা পড়িল । কোথা হইতে এক বিভীষিকা-পূর্ণ বিকট অট্টোমসিক শব্দ আসিয়া, সেট ভটিনী চক্ষুদ্বারা বিজন মৈকতভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া অমিত্রবাবুকে চমকিত করিয়া, তাঁহার বাক্য হরিয়া লইল ।

অমিত্রবাবু পলকহীন মচমকে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না, যে এই লোমহর্ষণকারী ভয়ানক শব্দ কোথা হইতে আসিল ।

ভয় চকিত পল্লিগামবাসী চরিত্রবণবাবু সাতকে অমিত্রবাবুকে কহিলেন,—“মহাশয় আর এম্বলে অপেক্ষা করা উচিত নহে, গভীর এই স্থান পরিত্যাগ করা বিধেয় ”

অমিত্রবাবু চরিত্রবণবাবুর এই কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, “এ শব্দ কোথা হইতে আসিল ?”

চরিত্রবণবাবু পুনরায় মডয়ে কহিলেন,—“মহাশয় ! এস্থান হইতে চলুন, এ নদীবধার বীজন অতীত মধ্যাহ্ন কাশ ।—কাজ চলুন, আপনাকে এ কথা শুনাটব ।”

অমিত্রবাবু চরিত্রবণবাবুর কথায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, তারপর বলিলেন, “মহাশয় আপনি ভয় পাঠিতেছেন কেন ?—এটার ভিতর কিছু রহস্য আছে নাকি ?”

হরিচরণবাবু কহিলেন, “আজ্ঞে হাঁ;—একথা আপনাকে সব শুনাইব। এখন আসুন।”

অসিদ্ধবাবু হরিচরণবাবুর কথার ভঙ্গিমায়া অধিকতর নিম্মিত ও কৌতুহলী হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহাশয়! আপনি অকারণ ভীত হইতেছেন কেন? ইহার মধ্যে এমন কি বিষয় থাকিতে পারে; যাচাতে আপনি ভীত হইতেছেন?”

“মহাশয় ভয়ের প্রভূত কারণ আছে।—ঐ যে চক্কার দক্ষিণ ভাগে সৈকত-ভূমির উপরিভাগে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাইতেছেন, যাহার ভগ্ন সোপানা-বলী উপলব্ধের স্থায় সৈকত-ভূমির উপর ইতস্ততঃ বাস্তব হইয়া ভগ্ন অট্টালিকার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দিতেছে। উহা অতি ভয়ানক স্থান, অতি বিভীষিকাময়। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনি এই দিনমানে বীজন নদীর তটে পাইলেন। দেখুন ঐ বিকট শব্দ কিরূপ ভয়াবহ বিভিষিকাময় মর্ক ব্যাপক, দেখিতে দেখিতে এই নির্জন সৈকত-ভূমি কিরূপ ভয়াবহ করিয়া ফেলিল। মহাশয় চলুন, আর এ স্থানে তিলার্কি কাল অবস্থান করা উচিত নহে।”

অসিদ্ধবাবু হরিচরণবাবুর ব্যাখ্যা গমন চক্কার কিছুমান চক্কা না হইয়া, এ সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে সেই ধ্বংসীভূত অট্টালিকার নথর চিত্র দেখিতে-ছিলেন।—সেই বীজন বালুকাময় তটিনী তটোপরি ভয়াবশিষ্ট অট্টালিকা বাস্তবিক অসিদ্ধবাবুর চক্ষে শাশ্বত সমজুলা বোধ হইতেছিল, যেন মহাকাল তাহার করাল মুখ-ব্যাধন করিয়া জগতকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত তথায় ভীষণ ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অসিদ্ধবাবুর শরীর লোমাঞ্চিত হইল,—কি এক অজানিত দুঃখময় হত্যা চিত্রা তাঁহার মনমধ্যে উথিত হইয়া, তাঁহার হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত করিল। সহসা এইরূপ কেন হইল? অসিদ্ধবাবু তদবিষয় অণিক চিন্তায় অহমমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে আবার সেই বিভিষিকাময় বিকট শব্দ, অসিদ্ধবাবুকে চমকিত করিয়া আকাশ, পাতাল, জল, স্থল, প্রতিধ্বনিত করিয়া দিগদিগন্তে ছুটিল। কি ভয়ানক, কি বিভীষিকাপূর্ণ স্মৃতিবিমর্দনকারী ভীষণ শব্দলব্ধী?”

“হরিচরণবাবু! সত্যই সত্যই এই অট্টালিকা বিভীষিকাপূর্ণ—অতি ভয়ানক স্থান। আমি অনেক দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি এরূপ আতঙ্ক-দায়ক ভয়ানক স্থান দর্শন করি নাই, যাহা আজ দেখিলাম, জাহা জনমে

ভুলব না । - হরিচরণবাবু আপনি কিছুক্ষণ এই স্থান অবস্থান করুন,--
আমি দেওয়া আসি, এত অটেনশনিক ব্যাপারে কি সত্য নিশ্চিত আছে ।”

অসিন্ধুবাবু এই কথা শুনিবা হরিচরণবাবুর মুখ শুকাইল। প্রথমতঃ
ইহাব কি উত্তর দিলেন, কিছুই ঠিক কানতে পারিলেন না। তাবপব
যখন তাঁহার বাক্যক্ষুব্ধ হইল, তখন তিনি মত্তর ব্যাকুলতাময় মুখ
ভঙ্গিমায় বলিলেন, “মহাশয়! এমন বাজ কবিবেন না—এমন ছঃসাহসেব
কার্যো অগ্রসব হইবেন না।”

অসিন্ধুবাবু হরিচরণবাবুর কথা শুনিবোন না—তাঁহার দুর্জলতায় আকর্ষিত
হইলেন না। তিনি যেন কোন অলঙ্ঘনীয় ভবিষ্যত দৈব দুর্ঘটনার অশঙ্ক্য
সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সেট শাস্ত্রান তুণ্য অট্টালিকা পাই, ক্রম অগ্রসব হইতে
হইতে কাঃলেন, “হরিচরণবাবু আপনি এই স্থানে নিশ্চিন্তে অবস্থান করুন—
আমি শীঘ্র আসিতেছি,—আপনার কোন ভয় নাই।”

হরিচরণবাবু অবপদ গনিলেন, তিনি অকস্মাৎ অসিন্ধুবাবু তাৎকালিক
দারুণ চমকতা দর্শন করিয়া, আশ্চর্য্য হইলেন, মনে কবিলেন, একি!
এই আশঙ্ক্য বৈরাগীল ব্যক্তি, অব্যবস্থিতচিত্ত বাশকের স্বভাব প্রাপ্ত
হইলেন কেন? তাবপব নিশ্চিত নেত্রে অবাক হইয়া, অসিন্ধুবাবু আশ্চর্য্য
জনক উদ্‌যাত্ত গাত দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন কি এক মায়ায়
আচ্ছন্ন হইয়া, পুনর্বার দ্বিগীয় কণায় তাঁহার গমনে বাধা দিতে ভুলিয়া
গেলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য অসিন্ধুবাবু অবিচলিত চিত্তে, নির্দীক হৃদয়ে, দৃঢ় পদে,
সেই ভয়ানক ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকা পাদমূলে উপনীত হইলেন। অগম্যাত্ত
চিহ্না না কারয়া দৃঢ়পদে উদ্যম্ভনে, ভগ্ন সোপানাবলী অতিক্রম করিতে
কবিত্তে উপবে উঠতে লাগিলেন, -এমন সময়ে তাহার গতিরোধ হইল, তিনি
শিহরিয়া দাঁড়াইয়া পাড়লেন, কেন দাঁড়াইয়া পাড়লেন? উপরে জঙ্ঘলাকীর্ণ
অট্টালিকা প্রাঙ্গণের আঁত পাচ্ছন্ন স্থানে—কে যেন দাঁড়াইয়াছিল, সে যেন,
সহসা তাঁহাকে দেখিয়া নিমিষে কোথায় লুকাইল,—শূন্য গর্ভে, কি যেদিনী
কোলে মিশাইল! তাহার কিছুই বুঝা গেল না—সে ছায়ারূপ অথবা পুরুষ কি
স্ত্রীরূপ, ইহাব কিছুই জানা গেল না। এই হেতু এই প্রাচেলিকাময় মায়া
দশনে, অসিন্ধুবাবু সচমকে কণ্টকিত বনীবে দাঁড়াইয়া পাড়ি পাড়িলেন;
কিন্তু আদিকক্ষণ নয় মুহূর্ত্তেব জল। তার পর অসিন্ধুবাবু আবার সাহসে

বুক বাঁধিয়া, উপবাতিমুখে ছুটিলেন। কি জানি কেন অসিদ্ধবাবুর চরিত্রমণীয়া চিত্রবেগ—এমন ভয়ানক ভাব ধাবণ করিল,—তিনি সহসা কেন এমন বিষয় কর প্রকৃতি সম্পন্ন হইলেন।

অসিদ্ধবাবু উপরে উঠিলেন, ভয়ঙ্কর কৌতুহলোদ্দীপ্ত মননে দেখিলেন, মের জঙ্গ বাকীর্ণ অট্টালিকার প্রাঙ্গণ ভূমি, ঘোব নৌবব নির্জন ভয়ানক গাভীয়া পাবপূর্ণ বিভীষিকাময়। অসিদ্ধবাবু এ দৃশ্যে অচল অটল নির্ভীক হৃদয়। তিনি সেই বিজন বনময় ভগ্ন অট্টালিকার ইতঃস্বত নিবীক্ষণ করিয়া ভীষণ স্থানের ভীষণতা উপলব্ধি করিলেন। সহসা এই সময়ে সেই বিভীষিকাময় অট্টালিকার এক পার্শ্ব যেন ভয়ানক শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, এইরূপ শব্দ অসিদ্ধবাবু শ্রুতিগোচর হইল। অসিদ্ধবাবু স্তম্ভীত প্রস্থব নিশ্চিত মূর্ছিত শ্রায় নিনিমেষ নখনে—যে দিক হইতে শব্দ আসিল, সেই দিকে চাওয়া বহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এই বাটী সত্য সত্যই ভীষণ, নানা অনৈসর্গিক ব্যাপারে পবিপূর্ণ। এ শব্দ কোথা হইতে আসিল!—বাটীর কি কিয়ৎ অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল? তাই বা কেমন করিয়া সম্ভবে, তাহা চাইলে ত বায়ুভরে ধূলবাশি উড়িত! না, দেখিতে হইল,—এ কিসেব শব্দ।

এই ভাবিয়া অসিদ্ধবাবু, যে দিক হইতে সেই শব্দ আসিয়াছিল, তদভিমুখে অগমর হইলেন, এক পদ—দুই পদ—তিন পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে অসিদ্ধবাবু সহসা সচমক দেখিলেন, একটি ছায়া মূর্তি কি প্রোত মূর্তি অথবা মনুষ্য মূর্তি ঠিক জানা গেল না—সেই তমোময় অট্টালিকার একটি জীর্ণ গবাক্ষপথে মুহূর্তে বিভ্রাতের শ্রায় প্রকাশ পাইয়া পলকে আবার কোথায় মিশিয়া গেল। দৃঢ়মায়ু অসিদ্ধবাবু বিভীষিকাময় স্তম্ভিত নির্জনমণ্ডপে, এই ঐক্যজালিক ভৌতিক দৃশ্যে মত্তমূর্খের শ্রায় নিশ্চল,—কণ্টকিত শরীর, ভীত, চকিত হইলেন। তিনি যুগপৎ কত কি চিন্তাব অধীন হইয়া সেই ঐক্যজালিক ভৌতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে—জীর্ণ গবাক্ষ পথে অনির্মিত নখনে চাহিয়া আবার কি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কি ভয়ানক চরিত্র দ্বিতীয় পলক পড়িতে না পড়িতে—এ আবার কি বিভীষিকা! কাহার প্রতিধ্বনিময় শ্রোণ শিথল বিকট অট্টহাস্য বায়ু প্রবাহ আলোড়িত করিয়া ভীষণ নাটিকা অঙ্জন করিল। বাটিকামনে এ আবার কি! কাহার বন্দনধ্বনি চপলাব হাসিব মত অনেক উঠিয়া অনেক মিশাহল। উঃ

কি ভয়ানক !—একটার পব আর একটা তৌর বাভমিকান কি অমানুষিক ঘাত প্রাপ্তঘাত । হঠাৎ কি মানব হৃদয়ে সহ্য হয় । অসিদ্ধবাবু বুঝে আসে স্থির থাকিতে পারিলেন না । —ওঃ ! ও আবার কি ? কে এই বিকট বলনা, এই তুমোময় জীর্ণ গলাফ পথে দাঁড়াইয়া, ভয় হিহ্বন স্তম্ভিত হৃদয় অসিদ্ধবাবু প্রতি তৌর কটাক্ষ ফেলিয়া ভীষণ সম্মুখসী বিজ্ঞপের হাসি হাসিয়া চপলাব মত চকিতে লুকাইল । উঃ কি ভয়ানক । অসিদ্ধবাবু আসে থাকিতে পারিলেন না, তারার যে ধৈর্যটুকু ছিল, তাহাও এষ্টবার ফুটাইল ।—হাঁহাব মগ্ধক ঘূর্ণিল, তিনি সেত বনময় বিজন ভৌতিক নিবেতনে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন । নিয়তিব কোন দুর্জয় ভবিষ্যত দুর্ঘটনার অসিদ্ধবাবু স্বতঃ আকৃষ্ট হইয়া সেই ভীষণ অশ্রুমান সমতুল্য স্থানে নিরাশ্রয়ে বিপদগ্রস্ত হইলেন ।—হহাহেই বলে কি অলঙ্ঘনীয় ভাবতবা ?

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।

—হাঁহাব—

“এ রমণী উন্মাদিনী না কি ?”

হাঁহাব ভবিষ্যৎ ছবাদৃষ্ট ! তুমি কেমন নিষ্ঠুর ! যে অসিদ্ধবাবু তোমার ক্রীড়া পুতলা হইয়া আজ পড়িয়াছে ; সেই সবল চিত্ত সন্তপ্ত হৃদয় জীবনাত অসিদ্ধবাবুর উপর এ তোমাব কেমন অত্যাচার । ভাট, বন্ধ, আত্মীয় স্বজন হইতে অসিদ্ধবাবুকে তুমি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহার প্রবাস জীবনে আজ তাঁহাকে এ—কি বিপদে ফেলিলে । যাঁহাব এত করুণ দৃষ্টে এই বনের পাখী, শাখী শিবে নীববে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে । দেখ—দেখ—নিষ্ঠুর ভবিষ্যৎ ছবাদৃষ্ট ! তোমাব যদি নয়ন থাকে, উন্মিলিত করিয়া দেখ, নীববে এ করুণ দৃষ্ট দেখিয়া অত্র বিসর্জন কর ; প্রিয়াচীন শূন্য হৃদয়, ভাঙমতি বিপন্ন অসিদ্ধবাবুর মাগন মুখ দেখিয়া একপার

মাত্র সহানুভূতি প্রকাশ কর—তুমিই এত দুঃসময়—অসিদ্ধবাবু এত নিরাশ্রয়। বিপন্ন দশায়, বাবেক সহানুভূতি প্রকাশ করিলে, হতভাগ্যের জীবন বক্ষা হয়, নতুনা নহে। তুমি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে বহু কি ? অসময়ে তুমিই ছবাদৃষ্টে, আমার সুসময়ে তুমিই শুভাদৃষ্টে। হতভাগ্যের প্রতি প্রসন্ন হও—তার প্রতি একবার চাও, দয়া করিয়া দুর্ভাগ্যের এই মঞ্চট জীবনে সহায় হও। হায় নির্দয় ভাবিয়া ছবাদৃষ্টে ! তুমি এততেও শুনিলে না, তোমার নিম্নম কঠিন পাখান হৃদয়ে একটুও দয়ার উজ্জেক হইল না। না—না—এ আমি কি বলিতেছি ! দয়ার উজ্জেক হইল বই কি,—নির্দয় ছবাদৃষ্টে শুভাদৃষ্টে হইয়া দেখা দিল বই কি ? তাহা না হইলে কে ঐ কোমল হৃদয়া রমণীকে সহসা এত নির্জন ভীষণ ভৌতিক গৃহে সাঙ্গ করিয়া পাঠাইল ! কেমা তুমি অনাথিনী পবিত্র কাতরা দিব্যরূপা মোহিনী ললনা ! এস মা এস !—তোমার অসিদ্ধকে দেখ। এই শোক, তাপ, আপদ, বিপদ—কালে তুমি ভিন্ন, কে আব সাঙ্গনা কবিত্তে পারে মা !—একি মা ! বিপদ কালে তোমার কোমল পক্ষজ কটাক্ষ হইতে, সহসা তীব্র অনল-শিখা বাহির হইল কেন ? কে কি নির্মমীকা ! মা তোমার চরণে ধবি, তোমার নয়নের ঐ সর্বনাসী অনল-শিখা, শীঘ্র সম্বরণ কর ! শীঘ্র সম্বরণ কর ! না হইলে এখনি অনর্থ ঘটিবে—সকলই দগ্ধ হইবে। বুঝাচ্ছি, তোমার এত আশ্রয়ের কারণ কি ? এ আশ্রয় কি ! তুমি ভাবিতেছ কেন ? মুখে অশ্রু দিয়া হাস কেন ?—একি আশ্রয় হাস কেন ? এ বিপদকালে একি তোমার বক্ষ বস ? তুমি শুশ্রূষা করিতে নামিয়াছ, শুশ্রূষা কর, হাস কেন ?—কি বলিলে ? শুশ্রূষা কাববে না ?—কেন ?—পাপ হইবে ? শুশ্রূষায় আমার পাপ কি ?—পরোপকার ব্রতে পাপ কি ?—কি বলিলে ?—কি ? এ আশ্রয় কি ? চুপ করিলে কেন ? একি আপদ। কথা কও না !—স্পষ্টে কবিয়া কথা কও না। কি বলিলে ? লজ্জা করে ! সে কি ? বিপদ আপদের সময়ে লজ্জা কি ?—এ কি ? এ রমণী উন্মাদিনী নাকি ? উন্মাদিনীই ত বটে ! হা ছবাদৃষ্টে তুমি মায়ায়—চর প্রতারক ! ক্ষণেক আশার মোহনী মোহে আশ্বস্ত করিয়া, এ আশ্রয় ক ছাব দেখাইলে। এই বিপদকালে এ তোমার কি মায়া খেলা ? তুমি যাচকব তোমার নিকট দয়ার আশা করাও বাতুলতা। ঐ দেখ ! নিম্নম নষ্টের পাখান হৃদয় ! দয়াময়ী প্রকৃতি সত্য নিরাশ্রয় বিপ্লবে হৃদয়ে গাওয়া, তারার সুকোমল মিশ্র কর সঞ্চারণে, ধারে ধাবে

অসিদ্ধবাবুর চেতনা যখনই কবিত্তেছে—দেখ মমতা বিচীন ! মানব
তোমান করুণা লাভে হতম হতযাও করুণাময়ী কোনন সখ্যশ্যশৌ মন্থ
হয় । এই দৃষ্টান্তে তোমান বচিন হৃদয়ে কোমলতার আবর্তন হয় না-
কেন ? জীব নিপাড়নে তুমি স্থানান্তর কব বলিয়া কি ? হ'বে ! কি
জানি তোমার কেমন স্থানান্তর ।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ ।



“এ কি এ !”

প্রাকৃতিক ওজসায় ধীরে ধীরে অসিদ্ধবাবুর চেতনার সঞ্চাল
হটল । অমনি ক্রমে ক্রমে অতীত ঘটনার পূর্ব স্মৃতি তাঁহর স্মৃতিপথে
আকৃষ্ট হটল । প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি নিজ স্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয়
করিয়া, আপন ঈশ্বর দেবতার নাম স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিলেন,—
দেখিলেন, সম্মুখে সেই উন্মাদিনী । অসিদ্ধবাবু শিখায়া চকিতে চাহিয়া
দেখিলেন, এ রমণী তাহারই যেন পরিচিতা । দারুণ উদ্বেগে তিনি
উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিয়ম উৎসুক নয়নে উন্মাদিনীর ভাব ভাব অবলোকন
কবিত্তে লাগিলেন । কিন্তু কি আশ্চর্য ! এ হাব জাব তাঁহার চিব পরি-
চিতের মত দেখাটাতছে যে । এ কি এ ! বিষয় সন্দেহে অসিদ্ধবাবুর
চিব আগোড়িত হটল । তিনি দারুণ উজ্জ্বলনাথ নিজ অবস্থা বিস্ময়
হটলেন, অদমা উৎসাহে অধীর হটয়া উন্মাদিনীর প্রতি গমন ক'রলেন ।
চপলা উন্মাদিনী চপলার হাসি হাসিয়া মুহূর্ত্তে পলাটল । অনুগমনোদ্যত
অসিদ্ধবাবুর গতি সম্মুখস্থ নিবিড় লতা জন্ত পর্ববেষ্টিত জঙ্গল প্রাতিহ
হটল । কিন্তু পবক্ষণে উন্মাদিনী অস্ত্র দিক দিয়া তাঁহার সম্মুখ আবি-
ভূত হইয়া, মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল । হাস্য শব্দে অসিদ্ধবাবু
চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন,—দেখিলেন, সেই উন্মাদিনী, যে তাঁহকে সন্দেহ

মোলায় নিঃশ্বাস করিয়াছে, সে তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাঁহারই অদূরে থাকিয়া, তাঁহার প্রতি চাহিয়া, মূখ্যে অঙ্গন দিয়া হাগিতেছে। কি আশ্চর্য্য ! কি অঘটন ঘটনা ! এ চাহনি যে, তাঁহার চিত্র পরিচিত,—এ চাহনি যে, তিনি অনেক বাব দেখিয়াছেন,—এ চাহনি আর কাহার নয়,—এ চাহনি তাঁহার ননীবালাব । এ উন্মাদিনী কি তাঁহারই ননীবালা ? ননীবালা বই কি ! ননীবালা আর এ উন্মাদিনী আর কেহ নয় । হা অদ্ভুত ! ননীবালা শেষে উন্মাদিনী হইল ।

উদ্ভাস্ত যুবক অসিদ্ধবাবু আর কি থাকিতে পারে,—তঁহার প্রিয়
ঐ অভাবনীয় বিসদৃশ হৃদয় বিদ্যাবক উন্মাদ ছবি দেখিয়া, তথায় আব কি
ক্ষণকাল অবস্থান করিতে পারে? তিনি হৃদয়ের দুঃখময় প্রবল উচ্ছ্বাসে
একাগ্রে উদ্বেগিত হইয়া উন্মত্তবৎ উন্মাদিনীকে বক্ষে ধারণ করিতে ছুটিলেন ;—
কিন্তু বিফল প্রয়াস ;—বিধি যা'ব প্রতি বাম, তা'র আশা কি মিটে । তিনি
উন্মাদিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না,—বিষম পদস্থগনে ভূমি-
চূষন করিলেন । উন্মাদিনী অমন দশ হাত অন্তরে সরিয়া দাঁড়াইল ।
নিচিহ্ন ব্যাপার । সময় অবস্থাপ্রণে এমনও হয়—যা'র জন্ত রমণী উন্মাদিনী,
সে সাক্ষাতে আবার উন্মাদিনী সরিয়া দাঁড়াইল । হায় বিধি ! তোমার
খেলা নিচিহ্ন ।

অসিক্তবাবু মুহূর্ত্তেক নিশ্বাস না করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাহু প্রসারিত
করিয়া পুনর্বার অটোখ্যাবেগে, প্রিয়া সম্মিলনে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু কৈ
প্রিয়া সম্মিলন ত হইল না,—প্রিয়া কৈ !—এই ছিল !—এই নাই ! একি
ভোজ-বাজি ! না—কোন মায়াবী মায়াণীলা ! এই ছিল—এই নাই !
এই যে আশাব !—এ কি প্রহেলিকা ! উন্মাদিনী আবার অসিক্তবাবুর
সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ! এইবার উন্মাদিনীর অল্প ভাব । অঞ্চলাবৃত
তাহার অধরপুটে—প্রগল্ভ বালিকার, সে চঞ্চল হাসি আর নাই । তাহার
আয়াত পঙ্কজ নয়নে, বসিকা নাগরীর মত, সে অপাঙ্গ ভঙ্গি আর নাই । যাহা
দেখিয়া অসিক্তবাবু তাহাকে আপনাব ধন বলিয়া চিনিযাচ্ছিলেন, সে সব
এখন কিছুই নাই । তাহার পবিত্র, ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, মুখে মমতাহীনা
পায়াণীব অট্টহাস, নয়নে শশ্যানেব সৰ্ব্বগ্রাসি অনলরাপি বিদ্যমান । এ মূর্ত্তি
দেখিয়া, অসিক্তবাবু তাহাব প্রতি অগ্রসর হইতে, আর সাহস করিলেন না ।
তিনি বিষমু ভ্রমে পড়িয়া, দারুণ সংশয়স্থ হইয়া, কাতর কণ্ঠে উন্মাদিনীকে

লক্ষ্য করিয়া সিজাসা করিলেন, “তুমি কি ননীবালা ? বল—বল উন্মাদিনী আমার আশা দাও—আমার প্রাণের যাতনা ঘুচাও ?”

উন্মাদিনী নিরুত্তর ।—সে সেই ভাবেই নিরুত্তর ।

অসিজবাবু দারুণ অটোখ্যাবেগে বলিয়া উঠিলেন, “উন্মাদিনী !—বল—বল, কেন নিরুত্তর । তোমার চরণে ধরি, বিনয় করি—বল । তুমি কি আমার ননীবালা ?—আমার স্নেহ হইতেছে ; যথার্থ বলিয়া আমার সংশয় ঘুচাও ?”

অসিজবাবুর এই বাকুলতায়, উন্মাদিনীর ঠেঙরবী মূর্তি সহসা অপসারিত হইয়া, মধুর মূর্তি হইল । অসিজবাবুর ভ্রম ঘুচিয়া গেল,—তিনি সাড়াহে আবার দোথলেন,—এইত তাহারই সেই ননীবালা । অমনি উছলিত হৃদয়ে উন্মত্ত যুবক অসিজবাবু আবার উন্মাদিনীকে হৃদয়ে ধবিত্তে গেল । উন্মাদিনী পলকে আবার দূর অন্তরে সরিয়া দাঁড়াইল । তীব্রস্বরে অসিজবাবুর প্রাণে আতঙ্ক তুলিয়া বলিল, “ছুঁও না—কাছে এস না,—সবে—সরে দাঁড়াও ।”

অসিজবাবু তাহার চঞ্চল তর্জ্জনী তাড়নে রক্তগাত হইলেন, সংযত হিল্লোলিত কথায় বলিলেন, “একি কথা—ননীবালা ! তুমি আমার চিনিতে পারিতেছ না ? আমি যে তোমার আমি—দেবতা ! এস ননীবালা, এস আমার কষ্টে দিও না—আর ছলনা কর না,—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর—আমার প্রাণ জুড়াও ।”

“না,—তুমি সরে যাও—দূরে দাঁড়াও,—কাছে এস না ; পাগ হ’বে,—আমায় ছুঁও না ।”

“এ আবার কি কথা ননীবালা ? তোমায় ছোঁব না !”—

“না !—পিশাচের পাপ সংস্পর্শে দেবতার ফুল অপবিত্র হইবে ।”

কি বলিলে ! পিশাচের পাপ সংস্পর্শে দেবতার ফুল অপবিত্র হইবে ! “না—এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না,—পবিত্রকুল কথন, পিশাচ সংস্পর্শে কলুষিত হয় না । তুমি বাতুল হইবে ; তাই ও কথা তুমি বলিতেছ । আমি তোমার ও কথা শুনিতে চাহি না । তুমি আমার হৃদয়ের ধন—হৃদয়ে এস । তোমার এই নিষ্ঠুর পরিণাম—আবার স্বথ পূর্ববর্ত্তনে মিশিয়া যাউক ।”

ছুঁভাগ্য উন্মত্ত যুবক অসিজবাবু উন্মাদিনীব বাধা মানিল না—তাহার বাতুল হৃদয়ের কথা বুঝিল না—তাহার কথা শুনিলা না । তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে উন্মাদিনীকে পুনর্বার বক্ষগত করিতে ছুটিয়া । বিহ্বল এ—কি করিল !

উন্মাদিনী নিম্নিসে কটিতে বজ্রাভাস্তর হইতে একখানি শাণিত ছুরিকা বাহিব করিল। বার্কিকা মার্ভণ্ডেবেব লোহিত কিরণে ছুরিকাষ বিছ্যৎ খেলিল। উন্মত্ত যুবকের নয়ন বাগমিত হইল। যুবক নয়ন মুদ্রিত করিলেন,—জ্বলিত হইয়া দাঁড়াইলেন, হতাস ভাব-বিজড়িত প্রাণে পলকে চাফিয়া দেখিলেন। উন্মাদিনী নবীনা যুবতী, মুহূর্তে শাণিত তীক্ষ্ণ দ্বার ছুরিকা হৃদয়ে বসাইল—হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুহূর্তে উন্মাদ শরীর মুক্তিকাষ লুপ্তিত হইল। তাহার উষ রক্তস্রোত তীব্র বেগে ছুটিয়া যুবকের মুখমণ্ডল রক্ত রাগে রঞ্জিত করিল। যুবক মহা অনৈসর্গিক চীৎকার তুলিয়া পশু পক্ষীর প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়া ভূম্যবলুপ্তিত উন্মাদিনীর কধিরাঙ্ক বক্ষে পড়িল। উন্মাদিনী শুষ্ক ক্ষীণ অধরে, ক্ষীণ অস্তিম হাসি ফুটিল। উন্মাদিনী ননীবালাব উন্মাদ জীবলীলা অবসান ক্ষেত্রে, আগী সহ মিলন হইল।—সেই স্বপ্ন কথা এতদিনে সত্যে পরিণত হইল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।



“একি প্রহেলিকা !”

এ দিকে হরিচরণবাবু অসিত্রাবাবু আগমনে বিলম্ব দেখিয়া মহা উদ্বিগ্ন হইলেন,—সাধু সন্দর্শনে আসিয়া এ কি গ্রহের ফেরে পড়িলাম ভাবিয়া, তথায় দাঁড়াইয়া, মনে মনে একটু বিরক্ত হঠাতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের এমন মাহস নাই যে, তিনি সেই পতিত ভগ্ন অট্টালিকার গিরা, অসিত্রাবাবু বিলম্বের হেতু অবগত হন, অথবা সেখানে এমন একটি

লোক দেখিনেন না, যাঁহাকে কথায় রাতি করিয়া, তদসমভিযায়াৎ সেই ভয় গৃহস্থগণ গমন করেন । হনিচরণবানু মহা দুঃস্থানে পড়িয়াছেন ; এ যাকে তিনি আনত কিছুমাত্র, তথায় সাহস করিয়া দাঁড়াইয়াও থাকিতে পারিতেন না । কি করিবেন ; তিনি বালকনাথ ঘাটেব জীকাস্ত স্থানে আশ্রয় দাঁড়াইলেন । অপ্রস্তুত মনে ভাবিতে লাগিলেন, অসিদ্ধবানু কবিকাতন লোক হইয়া, এমন খাম খোয়ালিব পরিচয় দিলেন, এঁরা । আমি রাম-দখাল মানুষকে কি বলিব । তিনি আমায় কি বলিবেন । এইরূপ আন কত কি চিন্তা, তাঁহার মনে আসিতে লাগিল ।

প্রিয় পাঠক মহাশয় ! হনিচরণবানু এ চিন্তা অমথা নহে—এ চিন্তার অনেক কারণ আছে । ঐ ভয় গৃহস্থগণ, এই স্বীকৃতিপূর্ব গ্রামবাসীর চির পরিচিত অতি ভয়প্রদ প্রসিদ্ধ স্থান । গ্রামবাসীর ন্যাক্সিত বিশ্বাস, যে ঐ বাড়িতে প্রবেশ কবে, সে আর ফেরে না । এই বিশ্বাসের মূল একটা ভয়াবহ জনশ্রুতি আছে ।

একদা কোন উগ সমাসী, ঐ গট্টালিকার অধিবাসীর নিকটে অতিথী হইয়া আসেন । গৃহস্থসমী অতিথীর উপযুক্ত সম্মান করেন নাই, পরন্তু তাঁহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন । সেই অবমানিত অতিথীর কোপানলে পড়িয়া গৃহস্থসমী, সেই রাজ আমাদ সম লোকান্তে গট্টালিকায় সবংশে মরিয়া পোড়ায়ানী প্রাপ্ত হইয়াছেন । এত জনশ্রুতির মূলে, কিরূপ মত নিহিত রহিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে, গামস্ত প্রাচীন লোকের কথার উপর নির্ভর নাহীত, আর অন্য উপায় নাই । প্রাচীনগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া, ঐ জন শ্রুতি লিখিত হইল । তাহা ঐ জনশ্রুতি ছাড়া, ঐ লৌকিক গট্টালিকা সম্বন্ধে আর, অনেক বিষয়কর ভয়াবহ কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন । তাহার দুই একটি কথা, প্রিয় পাঠক মহাশয়েব নিকটে উল্লেখ করিলে, স্বাক্ষর হইবে না । এতদিন একটি ছেনোবোক পেটের মাংসে ঐ জনশ্রুতি গট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যানে, কাঁঠি আঁচণে কবিত্তে গিয়া, সে কিন্তু আব ফিবিয়া আসে নাই, উদ্যোতবতাব তাহাকে মজি করিয়া রাখিয়াছে ।” সেই কাঁঠিজীবি উপদেষ্টার শ্রোতা হইয়া, তাহার স্ব গামস্ত অনেক এক বাহ্যবসিগেন প্রসি উগদব করিত ও ভয় দেখাইত,—বিটিকেল যথ ভয়প্রায় বলিত, আমাদের দলে এস, না হ’লে ঘাড় মটকাইব, এইরূপ আশ্রয় কত কি ।

এই সকল কথা হরিচরণবাবু অল্প অল্প গ্রামবাসীগণের মত আশঙ্কন জানিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। তাই তিনি স্থানীয় বিষয়ে, অল্প গ্রাম্যী অসিদ্ধবাবুর নিমিত্ত অতিমাত্র ভীত হইয়াছিলেন, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং বিবাক্ত হইয়াছিলেন।

যাই হ'ক, হরিচরণবাবু সেই দৃষ্টিভঙ্গির সময়, সহসা একটি কথা, তাঁহার মনে আসিল। তিনি তাহাতে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে গ্রাম্যপথ ধরিলেন। পথে রামদয়ালবাবুর সন্নিহিত তাঁহার দেখা হইল। রামদয়ালবাবু মুহূর্ত্ত প্রকৃতির হরিচরণবাবুকে এতাদৃশ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যাইতে দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আনন্দবসন্ত নির্মল মনে, কেমন একটা খটকা লাগিয়া, তাঁহার নির্মল চিত্তপ্রসাদ মলিন হইল। তাঁহার মনে হইলে, এ কি ! হরিচরণ একপাক্ষ্যে কোথায় যাইতেছে ! কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়াছে না কি ? তিনি প্রকাণ্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরিচরণ ! তুমি একপাক্ষ্যে কোথায় যাইতেছ ?—তুমি একক্ কেন ? অসিদ্ধবাবু কোথায় ?”

রামদয়ালবাবুকে দেখিয়া, হরিচরণবাবু একটু থতমত খাইলেন ; কিন্তু তাঁহার সাহস বাড়িল। তিনি তাঁহার জিজ্ঞাস্য কথাব উত্তর না দিয়া বলিলেন, “মহাশয় ! বড় বিলাট ঘটনা ঘটিয়াছে,—অসিদ্ধবাবু সেই ভুতুড় বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছেন। অনেকক্ষণ হইল, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।”

এই কথা শুনিয়া রামদয়ালবাবু যারপর নাই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “মাধু সন্দর্শনে আসিয়া সেই দিকে কি জ্ঞাতি গিয়াছিল ?”

হরিচরণবাবু ইহার কাবণ, তাঁহাকে সর্বিশেষ বুঝাইয়া বলিলেন।

রামদয়ালবাবুর বড় সাধে বাধা পড়িল,—তাঁহার আশা মুকুল শুকাইল। সকলই অদৃষ্ট,—অদৃষ্টে স্মৃতি না থাকিলে, কে স্মৃতি যোগাইবে। রামদয়ালবাবু এই ঘটনায় বড় দুঃখিত হইলেন, কেবলমাত্র তাঁহার নয়নাঙ্গ গিলিত হইতে বাকী রহিল।

কি করিবেন, তিনি নিজ দ্বাদশটিকে অশেষবিধ ধীংকান দিয়া, হতভাগ্য অসিদ্ধবাবুর উদ্দেশে, সেই ভৌতিক অট্টালিকাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি নদীর দিক দিয়া না গিয়া, লোকালয় সদর পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেন। হরিচরণবাবু তাঁহার পশ্চাৎ অচুসরণ করিলেন।

রামদয়ালবাবু আসিয়া না পড়িলে ; দুর্দল হরিচরণবাবু কতিপয় সন্ধ্যা-বধি সন্ধ্যা করিয়া, অসিদ্ধবাবুর উদ্দেশে সদর পথস্থ জোঁরন পথ বহিয়া,

সেই ভৌতিক অট্টালিকায় প্রবেশ করিতেন। বলা বাহুল্য, এই উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবু সদর পথ ধরিয়াদিগেন।

যাইহক ; কিয়ৎক্ষণ পরে, উভয়ে সেই অট্টালিকার সদর মুখে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিচরণবাবু কহিলেন,—“হুই একজন লোক দেখি—কি বলুন ?”

রামদয়ালবাবু ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—“কি আবশ্যক।”

হরিচরণবাবু আর কোন কথা না কহিয়া, নিঃশব্দে রামদয়ালবাবুর সহিত সেই প্রেতপুরী সদৃশ বিশাল অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এখন আর ভয় নাই। বুদ্ধ রামদয়ালবাবুর অসীম সাহস তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে।

রামদয়ালবাবু লতাগুল্য জঙ্গল পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণ পথ, কষ্টে অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর, সহসা তাঁহার সম্মুখে—একটু দূরে—লতা গুল্ম পরিবেষ্টিত জঙ্গল মধ্যে, কাহার করুণ বিলাপের অক্ষুট শব্দ শুনিতে পাইলেন। সবিশেষে রামদয়ালবাবু এই শব্দ শুনিবামাত্র, নিজ গতি একেবারে সংযত করিলেন, দারুণ উৎসুক চিত্তে সেই শব্দ প্রাপ্তি উদগ্রীব হইয়া, কি যেন শুনিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু তিনি উৎকণ্ঠা বশতঃ, এই ভাবে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি দারুণ উদ্বেগে অকুণ্ঠিত করিয়া হরিচরণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হরিচরণ ! এ শব্দটা তোমার কাণে কেমন লাগিতেছে ?”

হরিচরণবাবু রামদয়ালবাবুর সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এতক্ষণ বেশ অকম্পিত হৃদয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ করুণ বিলাপের অক্ষুট শব্দ শুনিবামাত্র, তিনি কিছু বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মনে কিছু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। সুতরাং রামদয়ালবাবুর ঐ কথার উত্তরে তিনি একটু ঢোক গিলিয়া, অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্বরে বলিলেন,—“ঐ শব্দটা যেন মামুষের মত বোধ হইতেছে।”

রামদয়ালবাবু তাঁহার এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—“না হে না—তোমায় ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না।—আমি বলিতেছি, তোমার কাণে ঐ শব্দটা কি নকম লাগিতেছে—পরিচিতের মত—না অপরিচিতের মত ?”

এইবার হরিচরণবাবু তাঁহার জিজ্ঞাস্য কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়া, সেই দূরাগত অক্ষুট শব্দ ক্ষণমাত্র নিবিষ্ট মনে শুনিয়া বলিলেন,—“আমিত ভাল বুঝিতে পারিতেছি না ।”

রামদয়ালবাবু তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া—যেদিক হইতে ঐ শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল ; সেই দিক দৃষ্টি করিয়া, পূর্ববৎ তিনি চল পদে অগ্রসর হইলেন । হরিচরণবাবুও পূর্ববৎ রামদয়ালবাবু সাহসে তাঁহার অনুসরণ করিলেন । কিন্তু তাঁহার মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অপসারিত হয় নাই ।

রামদয়ালবাবু উদ্বেগ আশঙ্কা পরিপূর্ণ চিত্তে ক্ষিপ্তপদে, সেই জঙ্গলাকীর্ণ প্রাঙ্গণ-ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে সহসা তাঁহার একটি হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । রামদয়ালবাবু ইতিপূর্বে যে কল্পনাবিলাপের অক্ষুট শব্দ শুনিয়া, তিনি মনে মনে যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এই হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্যের সম্মুখে আসিয়া, তাহাই নেত্রগোচর করিলেন, কিন্তু অসম্ভবনীয় ।—এ দৃশ্য তিনি কখন দেখেন নাই—এ দৃশ্য তাঁহার নয়ন সম্মুখে এই প্রথম ।—এ দৃশ্য দেখিয়া, তাঁহার চিত্ত কি ভাব ধারণ করিল, তাহা আমি বলিতে পারি না—তাহা বর্ণনাতীত । আর হরিচরণবাবু চিত্ত, এই দৃশ্য কিরূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল ; তাহা বর্ণনা করিতে আমার ক্ষুদ্র লেখনী একান্ত অক্ষম । যদি রামদয়ালবাবুর চিত্তভাব বর্ণন কোন প্রকারে সম্ভব হয় ; তাহা হইলে তুর্লভ হরিচরণবাবুর মানসিক অবস্থা প্রকাশ করিয়া লেখনী বদ্ধ করা, একেবারেই অসম্ভব । এ কথা, প্রিয় পাঠক ! বোধ হয়, আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না ।—এ দৃশ্য আপনি পূর্বে দেখিয়াছেন—আমার অনিপুণ নূতন লেখনী লেপনে এই ভীষণ শোচনীয় দৃশ্যের সামান্য অস্পষ্ট চিত্র দর্শনে যতদূর সম্ভব, ইহার ভীষণতা আপনার অনির্ণয় হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন,—ইহা বলা বাহুল্য । যাই হ'ক ; সেই শোক সন্তপ্ত ভ্রম হৃদয় হতভাগ্য অসিদ্ধবাবু তাঁহার এই বিষম বিপদ কালে, সহসা হুঁদীগকে তদসমক্ষে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, উদ্বেগিত সমুদ্রবৎ হৃদয়ের পূর্ণ শোক উচ্ছ্বাসে, তিনি নিতান্ত অধীর হইয়া, রক্ত সন্তপ্ত হৃদয়ের অক্ষুট শোক শব্দে মুখরিত—সেই নির্জন শোকাবহ বনময় প্রাঙ্গণভূমি, প্রত্যক্ষ পক্ষে আরও শোকাবহ করিয়া ফেলিলেন ।

তাঁহার সন্তপ্ত উদ্ভাদ হৃদয়ের অস্বস্ত শোক উচ্ছ্বাসে, সেই শুষ্ক পর্ণ-

দুঃখকাতর মহৎ ব্যক্তিময়ের, প্রাকৃত ব্যাপার বুঝিতে আর থাকি রহিল না । তাঁহারা যামগর নাই বিস্মিত, আশ্চর্য্যাস্থিত, ফৌজুহলোদীপ্ত হইয়া ঐ অচিন্ত্য-নাম অঘটন ঘটনার বিষয় ব্যগ্রভাবে সেট শোক মুহূর্ত্তমান ব্যাকুলিত অগিষ্ট-নামকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু বিফল মনোরথ হইলেন । তাঁহার শোকাক্ত হৃদয়ের অর্থশূন্য অড়িত বাক্যবলীতে তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । পরন্তু তাঁহাকে একান্ত বিহ্বল দেখিয়া তখন তাঁহার নিকট হইতে তাঁহাদিগের জিজ্ঞাস্তা কথার সছতর পাওয়া অসম্ভব জানিয়া, সে বিষয়ে আপাততঃ বিরত হইলেন ।

তৎপরে উপস্থিত লোমহর্ষণকান্নি দাক্ষণ দুর্ঘটনার ভবিষ্যৎ বিপদের কথা শ্রবণ করিয়া রামদয়ালবাবু নিহবীত হইলেন, কিন্তু পুনরায় নিজ স্বাভাবিক বৈর্য্যভূপে, প্রত্যাশপন্নমতিবশে, উপস্থিত বিপদের যথাকর্তব্য অবধারণ করিয়া স্থির হইলেন, এবং তিনি ভীত বিগত কণ্ঠে হরিচরণবাবুর প্রতি নয়ন ফিরাইয়া বলিলেন,—“দেখ হরিচরণ ! যেরূপ অচিন্ত্যনীয় ঘটনায় এই বিপদপাত হইয়াছে, তাহা মনে করিয়া দেখ, কিরূপ ভয়ানক ! এখন ভীত হইবার বা শোক করিবার সময় নয় ; যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা পরমেশ্বরের অনুমোদিত । ইহা আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি । সামান্য লোক এ কথা কি—বিশ্বাস করিবে ? যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা মনে করিবে, অগিষ্টবাবুই এই নারী হত্যার প্রকৃত নায়ক ।

আমরা এই হত্যার প্রকৃত কথা সাধাবলকে বুঝাইয়া বলিলেও তাঁহারা কদাচ বিশ্বাস করিলে না । তাঁহারা মনে করিবে, আশ্রিতেন প্রাণ বাচাইবার নিমিত্ত ও আপনাদের সাফাই রাখিবার জন্ত আগুন সত্য চাকিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছি । ইহা তাহাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক । সুতরাং এখন সময় থাকিতে থাকিতে, এই বিপদের সম্ভাবনা দূরীকরণ করিবার নিমিত্ত আমাদের পক্ষে, যথা উপায় অবলম্বন করা একান্ত উচিত হইতেছে । যদিও আর খানিক পরে দিনের আলো নিবিয়া যাইবে, এই হেতু এই নিরুজ্জ্বল স্থানে আমাদের বিপদের সম্ভাবনা কম থাকিলেও তবু আমাদের পূর্ব হইতে ইহার যথাবিহিত উপায় করা যুক্তিযুক্ত । কি জানি ! ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, কি ঘটিতে কি ঘটে !—বুঝিলে ? এখন তুমি এষ্টখানে, কিছুক্ষণ বৈর্য্য ধরিয়া অগিষ্টবাবুর সাহায্য নিযুক্ত থাক, আমি চলিলাম।—এই বিপদ নিবারণের ক্ষণেকটা উপায় করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি ।—তোমার কোন ভয় নাই ।

তৎপরে অগ্নিদেবাবুকে গুটিকতক সাহসনা বাক্যে, উপস্থিত বিপদে ধৈর্য-
শীল হইতে কহিয়া, তিনি দ্বিভিত পদে, সেই ভৌতিক অট্টালিকা চত্বরে
নিষ্ক্রান্ত হইলেন । কিন্তু সদর পথ দিয়া তিনি বাহির হইলেন না, তটিনী
তট দিয়া, বাড়ির বাহির হইলেন । সদর দিয়া বাহির হইলেন না ; তাহার
কাবণ—এই অসময়ে, এই পতিত অট্টালিকা হইতে বাহির হইলে, কাহারও
মনে কিছু সন্দেহ হইতে পারে ।

ত্রিশ পরিচ্ছেদ ।

— ❦ —

“সর্বনাশ ! এখন উপায় !!”

সেই সময়ে বামদয়ালবাবু ও চরিত্রবণবাবু ঐ অট্টালিকা মধ্যে
প্রবিষ্ট হন । সেই সময়ে কতিপয় গোমা যুবক, ঐ অট্টালিকার অনতিদূরবর্তী
একটা মোকানেনব সম্মুখস্থ গ্রামের ছুর্কা ক্ষেত্রে বসিয়া, পদস্পর্শ চাখালাপ
করিতেছিল । সহসা তাহারা তাহাদিগকে এই অপবাহু কাণে অত ত্রস্তভাবে
পতিত অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, যার পর নাই বিস্মিত ও
আশ্চর্যান্বিত হইল ।—চাখালাপ ছাড়িয়া, পদস্পর্শ বলাবলি করিতে লাগিল,
“একি ভাই !—একি হইল ! এই বাববেলায় উহারা অত ত্রস্তভাবে ভুতুড়ে
বাড়িতে ঢুকিল কেন ?”

সকলের কথার উপর কথা পাড়িয়া, এক জন বহুদর্শী যুবক বলিল;
“বোধ হয়, আবার কেউ গেছো ভুতের পাল্লায় পড়িয়া, জীবলীলা সম্বরণ
করিয়া থাকিবে,—তাই ।”

আর একজন যুবক তাহাব কথা সমর্থন করিয়া বলিল, “হ্যাঁ ! এই সব য
কিছু একটা কাণ্ড কাবখানা ঘটিয়াছে, না হইলে, এই বাববেলায় ভুতুড়ে
বাড়িতে সন্ম করিয়া কে ঢুকিতে যাইবে বল ।”

এই রূপ এই একটা যুক্তি সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইবার পর, যুবকদিগের মনে কৌতুহলের উদ্রেক হইল ; তাহারা আর সেই জ্ঞানে যমিয়া থাকিতে পারিল না । তাহারা এই নিয়মের মূলে কি সত্য নিহিত আছে জানিবার নিমিত্ত, উৎসুক চিত্তে, সেই পতিত ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখস্থ সদর পথে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং জটলা করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল ;—কি রূপ উপায়ে, উপস্থিত জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদিগের জ্ঞানগোচর হইতে পারে । বহু যুক্তিযুক্ত তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইল ; অট্টালিকার মনো প্রবেশ বাতীত এ বিষয় জানিবার আর অন্য উপায় নাই ; কিন্তু সে উপায়—সাহস অভাবে অবলম্বন করিতে সকলেই নারাজ ;—ভুতের হাতে কে সখ করিয়া কাঁচা মাথা দিতে যাইবে, —এরূপ আশঙ্কক তাহাদিগের মনো কেহ নাই ।

যাতি হ'ক ; যুবকগণ তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার পক্ষে, দ্বিতীয় উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া মহা কঁপরে পড়িল ।

তাহাদের এই সরগরম জটলায়, ক্রমে ক্রমে ত্তে একজন করিয়া আঁতড়ি, বিশ পঁচিশ জন গদিক—বাণীর কি জানিবার নিমিত্ত আপন আপন গন্তব্য পথ ছাড়িয়া, অতি উৎসুকচিত্তে, সেই যুবক জটলায় আসিয়া মিশিল এবং বাস্তব সমস্ত হইয়া, —এ উহাকে, ও উহাকে, কি ব্যাপার ঘটয়াছে, জানিবার নিমিত্ত, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল । কিন্তু ছুৎখের বিষয়, কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, অথবা বস্তা অবসর অভাবে, শ্রোতার জিজ্ঞাস্ত কথার উত্তর দিতে পারিল না । সকলেই বাস্তব, কে কাহার উত্তর দিবে ।

যখন তদার এইরূপ হৈ চৈ রকমের গভ্রগোল চলিতেছে ; তখন সেখানে একজন চৌকিদার আসিয়া উপস্থিত হইল ।—“এত ভিড় কেন ? কি হইয়াছে ? জানিবার নিমিত্ত, ক্ষীত বক্ষে, জনতা চেলিয়া, ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল, কবচ গভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে এত গোল কেন ?”

এই কথা শুনিয়া, সেই যুবকদের মধ্যে একজন চৌকিদারের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, মুকবির লোকের মত, তথাকার জনতার, প্রকৃত কথা বুঝাইয়া বলিল ।

কিন্তু চৌকিদার, যুবকের কথা বুঝিল না ; সে মনে করিল, যুবক আগোন্ড কথা, গোপন করিয়া বাজে কথা বলিয়া, তাহার সহিত মস্করা করিতেছে ।

আর যায় কোথায় ! সে বিলক্ষণ মধুর সম্ভাষণ করিয়া, যুবক যুবকের
প্রীতিবর্দ্ধন করিল ।

চৌকিদারের এই অসামান্য ভদ্রতায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ কিঞ্চিৎ ভীত
হইয়া পড়িল । কিন্তু যুবকদলের মধ্যে, জটনক সাহসী যুবক, নিজ বন্ধুর
চিন্তাতীত সম্বন্ধনা দেখিয়া, সে চৌকিদারকে ছাড়িয়া কথা কহিল না ।

চৌকিদার আক্কেল সেলামী পাইয়া, মেজাজ ঠাণ্ডা করিল, এবং মনে
মনে কি ভাবিল । তাৎপর্য সে জনতার মধ্যে হইতে ছুই এক ব্যক্তিকে
তাহার সহিত সেই অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে কহিল । কিন্তু
তাহার কথায় কেহ সম্মত হইতে পারিল না । অগত্যা চৌকিদার সাহসের
উপর নির্ভর করিয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল । সে সাহস তাহার
নিজের নহে ;—সে সাহস উপস্থিত জনতার । সে ইহা বিলক্ষণ অবগত
ছিল যে, একজন এই পতিত অট্টালিকা মধ্যে পথ প্রদর্শকরূপে গমন করিলে,
একটি ছুইটি করিয়া সেই সমস্ত জনতা, নিশ্চয় পথ প্রদর্শকের অনুসরণ
করিবে । ফলে তাহাই হইল,—চৌকিদার সেই অট্টালিকা মধ্যে প্রবেশ
করিলে, একটি ছুইটি করিয়া তথাকার সমস্ত জনতা চৌকিদারের পশ্চাৎ
অনুসরণ করিল ।

সাহসী হ'ক ; চৌকিদার যখন সন্ধান অনুসন্ধান করিতে আসিয়া
বিপর্যায় ফেলিয়া গিয়া পড়িল । তথায় গিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার
কঠোর চিত্তও যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, শোকে, ছুৎথে অভিভূত হইয়া পড়িল ।
কিন্তু চৌকিদার হৃদয় স্বভাবতঃ নির্ভর কঠিন ।

সে কণকিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া আশ্চর্য্য প্রতীতিবলে, সেই শোণিতাজ
উন্মাদিনীর শব্দ বগে নিপতিত নিরাশায় মগ্ন, শোকবিহ্বল অসিদ্ধবাবুকে ও
তাহার অনতিদূরে স্থিত নিকাক হরিচরণবাবুকে উন্মাদিনীর হত্যাকারী বলিয়া
সাব্যস্ত করিল ।

তৎপরে বিনা প্রমাণ প্রয়োগে, চৌকিদার মহাশয় উভয়কে দৃঢ়রূপে
বন্দন করিল ।

ঠিক এই সময়ে রামদয়ালবাবু একটি ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে তথায়
উপস্থিত হইয়া—যাহা আশঙ্কা করিয়া ছিলেন, তাহাই দেখিলেন । বিস্ময়
চিহ্নিত হইয়া সমভিব্যাহারী ভদ্রলোকটির মূখপানে চাহিয়া বলিলেন, “সর্ব-
নাশ !—এখান উপায় !”

ভদ্রলোকটি তাঁহার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “সকলনাশ আবার কি! কি হইয়াছে! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, স্থির হইয়া দেখুন, আমি কি করি।

এই বলিয়া ভদ্রলোকটি বিপুল জনতা ঠেলিয়া চৌকিদার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

চৌকিদার উক্ত ভদ্রলোকটিকে সম্মুখে দেখিয়া, সম্মুখানে ফোঁতাদোরস্ত মস্ত এক মেলামঠুকিয়া, আশ্চর্য্য নিপুনতার সহিত হত্যাঘটিত ব্যাপার বিলক্ষণ বিস্তৃত করিয়া বলিল।

ভদ্রলোকটি চৌকিদার কথিত হত্যাকাণ্ড ব্যাপার সমস্তই শুনিলেন, তারপর দীর্ঘ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি,—এই দুই জনকে হত্যা করিতে দেখিয়াছ কি?”

চৌকিদার তাঁহার এই কথার উত্তরে বলিল,—“আজ্ঞে না, আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে দেখি নাই। তবে”—

ভদ্রলোকটি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বললেন, “তবে কি! যখন তুমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে দেখ নাই, তখন তুমি ইহাদিগকে কি হিসাবে বন্ধন করিয়াছ?—খুলিয়া দাও। আগে প্রমাণে ইহারা আসামী বলিয়া সাব্যস্ত হউক;—তবে বন্ধন করিও,—এখন খুলিয়া দাও।”

এই নিয়ম ব্যাপার দর্শনশীল জনতার মধ্যে হইতে দুই এক জন প্রবীণ ব্যক্তি, সেই অপমানিত শোক-মুহুমান অসিদ্ধবাবুর বিবাদ মূর্ধি দেখিয়া ও তাহাদিগের পরিচিত নিরীহ ভদ্র হরিচরণবাবুকে দেখিয়া, অবশ্য বুঝিয়া ছিলেন, ইহারা হত্যাকারী নহেন। সুতরাং তাঁহারাও ঐ ভদ্রলোকটির শেষ কথাটি প্রতিধ্বনিত করিয়া বলিলেন, “এখন খুলিয়া দাও—খুলিয়া দাও!”

এই ব্যাপারে চৌকিদার পুঙ্খবের বড় আশায় ছাই পড়িল। সে মনে করিয়াছিল; এই দুই জনকে খুলি আসামী বলিয়া সম্মুখানে গ্রাম্যমণ্ডল মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিতে পারিলে মস্ত বড় একটা বকসিম পাইবে। কিন্তু বিদীর বিপাকে, উপস্থিত তাহার কোনই সম্ভাবনা রহিল না। সে গ্রাম্য মণ্ডল মহাশয়ের (ভদ্রলোকটির) উক্ত বিদ্যাহুঁম শুনিবামাত্র, নিজ ছুরাশায় জলাঞ্জলি দিয়া, অসিদ্ধবাবু ও হরিচরণবাবুর বন্ধন মোচন করিয়া দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু চৌকিদার মনে মনে গ্রাম্যমণ্ডল মহাশয়ের উপর উৎকোচ গ্রহণের সন্দেহ করিয়া দীর্ঘ পরিশ্রম হইল। দীর্ঘ পরিশ্রম হইবার

কারণ, সে নিজ অপূর্ণ অনুমান বলে বুঝিয়াছিল । তাহার যৎকিঞ্চিৎ শাক-
অন্নের উপায় রহিত করিয়া আপন পায়সার সংস্থানের যোগাড়ে রহিয়াছে ।

চৌকিদার গ্রাম্যমণ্ডল মহাশয়ের প্রতি,—ঐ ভদ্র লোকটির সম্বন্ধে বাহাই
ভাবুক না কেন, তাহাতে গ্রাম্য মণ্ডল মহাশয়ের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই ।

সে যাহা হউক । গ্রাম্য মণ্ডল মহাশয় কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহার
এই ক্ষুদ্র পরিচয়ে স বিশেষ অবগত হওয়া যাইবে ।

দীনবন্ধু চৌধুরী ক্ষীরোদপুর গ্রামের একজন গণ্য মাত্ৰ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ;
নিজ সদাশয়তাগুণে, স্থানীয় সর্বসাধারণের প্রিয় নিকটানে ভবৈতনিক
গ্রাম্যমণ্ডল হইয়াছেন । ‘স্বগ্রামে’ ইনি চৌধুরী মহাশয় বলিয়া সুপরিচিত ।
এই চৌধুরী মহাশয় আমাদের রামদয়ালবাবুর একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ
বন্ধু । তিনি রামদয়াল বাবুর মুখে সহসা এই বিপদবার্তা পাইয়া, হরিত
পদে তদসমভিব্যাহারে ঘটনা স্থানে আসিয়া পৌছিয়া ছিলেন ।

গ্রাম্যমণ্ডল মহাশয় ইতিপূর্বে অসিদ্ধবাবুকে, রামদয়ালবাবুর বাটীতে
দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার দুঃখময় বৃত্তান্ত শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন,
ও তাহার সহিত আলাপ করিয়া বিলক্ষণ প্রীতিলভ করিয়াছিলেন ।

অসিদ্ধবাবু গ্রহবৈজ্ঞান্যবশতঃ নানা বিপদজালে জড়িত হইয়াছেন, তাহা
তিনি তাহার বশয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া অগ্রে বুঝিয়াছিলেন । এখনও যে অচিস্তনীয়
ঘটনায় ভয়ানক বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন । তাহাও রামদয়ালবাবুর
কণায় ও উপস্থিত ব্যাপার অবলোকন করিয়া, বুঝিতে পারিয়াছিলেন ।
পরন্তু তাহার মত ব্যক্তি যে, কখন নরহন্তা হইতে পারে না,—ইহাতে তাহার
ঐব ধারণা । সুতরাং অসিদ্ধবাবুর সাপক্ষে দাঁড়াইয়া, চৌকিদারকে ও উপস্থিত
বান্ধিবর্গকে, উপস্থিত ছুর্ঘটনার বিষয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহার কি অবগত
আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন । কিন্তু কেহই অসিদ্ধবাবুর বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য
কোন অপরাধের কথাই বলিতে পারিল না ।

তখন সময় বুঝিয়া, বিচক্ষণ গ্রাম্যমণ্ডল মহাশয়, অসিদ্ধবাবুর বিষয়
যতটা জানিতেন ও রামদয়ালবাবু যতটা তাহার বিষয় অবগত ছিলেন ।
তদসমুদয় উল্লেখ করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিলেন ।

একথা শুনিয়া সাধারণের মনে অসিদ্ধবাবুর প্রতি কোন সন্দেহ
রহিল না । বরং সকলেই অসিদ্ধবাবুর এই অভাবনীয় বিপদ কাহিনী শুনিয়া
থারপর নাই গম্ভ্যপিত হইয়াছিল ।

এই সময়, এই ঘটনা দৃশ্যনাভিলাষি জটনৈক নবাগত যুবক তথায় আসিয়া, সেধ কনিবাপ্ত উন্মাদিনী বশবদেহ, খানিক নিবিষ্ট মনে নিরীক্ষণ করিয়া, সম্মা চোঁকাব করিয়া বলিয়া উঠিল, “উঃ !—এ যে সেই মাগিটা !” পরক্ষণে সে আবার সংযত হইয়া ক্ষিপ্ত লজ্জাবশত বদনে মৃত উন্মাদিনীকে দেখিতে লাগিল ।

যুবক ন্যূন নিম্নত, এই কৌতুহলপ্রদ কথা, সর্ব সাধারণের কর্ণে যেমন বাজিয়াছিল, তেমনি গ্রাম্যগণ্ডল মহাশয়ের কর্ণে বাজিয়াছিল । তিনি এই আশ্চর্য্য বক্যমব কথা শুনিয়া, উৎসুক চিত্তে, সেই যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ওহে !—তুমি কি বলিলে ?”

যুবক গ্রাম্যগণ্ডল মহাশয় কতৃক এত রূপ ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া যেন, ভীত ও লজ্জিত হইল, অবশেষে সে কিঞ্চিৎ ইতঃস্তত করিতে লাগিল, “আজ্ঞে—আজ্ঞে—আপনি ওঁথা কেন”—

গ্রাম্যগণ্ডল মহাশয় তাহার মনভব বুঝিতে পারিয়া, তাকে অভয় দিয়া বলিলেন, ‘লজ্জা কি !—ভয় কি !—তুমি একথা সহজেই বলিতে পার, ইতঃস্তত হইবার কোন কারণ নাই ।’

তখন যুবক বলিতে লাগিল, “সেই ভয়ানক বাদলার পরদিন, সকাল বেলায়, আমার যখন ট্রেনেদেব যষ্টি ডোবার, মাছ ধরা দেখিতে ছিলাম, তখন হঠাৎ দেখি ও পাড়ার ওধ বাড়তে, এক মাগি ককে এই জুড়ুড়ে বাড়ির দিকে ভাড়া করিয়া আসতেছে । আমবা মজা দেখিবাব নিমিত্ত জঙ্গলা জুতেব পশ্চাৎ অনুসরণ কাবলাম । কিহু আমাা গোশা দুব অগ্রসব হইতে না হইতে দেখে, এই মাগিটা, এই জুড়ুড়ে বাড়িতে ঢুকিয়া, জঙ্গলা জুতেব হাত হইতে পরিজ্ঞান পাই ।।”

প্রিয় পাঠক মহাশয় ? এই যুবকের সকল কথাই সত্য, তবে সে আপনাকে সাফাই বাখিয়া এত কথাগুলি বলিয়াছিল । যাই হ’ক, একথা সকলেই শুনিয়া, অসিদ্ধবাবু কি শুনিলেন না ?—শুনিলেন বই কি — মরমে মরিয়া গুলিলেন । শুনিয়া তিনি স্নাত পণে ইচ্ছা কাবত লাগিলেন, যোদিনো বিদোর্ঘ হটক, আমি তাকার গর্ভে প্রবেশ কবি । ভাগ্যেব যেমন কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না, তেমনি মন্দাগ্য অসিদ্ধবাবুব, এই গলোক ইচ্ছা পূর্ণ হইল না । তিনি অধবদনে দীন কীনের মত নিস্বাক প্রাণশূন্য জড় পদার্থবৎ দাঁড়াইয়া বহিলেন ।

গ্রাম্যগুণ মহাশয় চকিতে অসিদ্ধবাবু এই মর্মান্তিক সমস্যাটো ভাব দেখিলেন । দেখিয়া সহদেবতা প্রাণ, তাঁহার মর্মকথা, আপন অঙ্গের অনুভব করিয়া, ছুঃখিত হইলেন । অতঃপর তিনি এই বিষয়ে আর যথা বাক্যবাধে সময় নষ্ট না করিয়া, অসিদ্ধবাবু মৃত সহধর্মিণীর মৎকার কাগা, যাহাতে বিনা তর্কিতর্কে সাধাবণেব অনুমানিত হইয়া শীঘ্র স্তম্ভের হইতে পাবে, তাহাব চেষ্টায় গ্রাম্যগুণ মহাশয় অনুবোধ ভনে বাক্য চাতুর্যে সাধাবণকে নিজ মনভাব জ্ঞাপন করিলেন ।

সাধাবণ ব্যক্তিবর্গ, খোদ গ্রাম্যগুণ মহাশয়ের, এবস্থি মন্তব্য হৃদযন্ত্রণ কবিতে পারিয়া, তাঁহার সাপক্ষে একমত হইয়া, আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ।

তখন নিঃশংসে সাধাবণেব উদ্‌যোগে, সেই হতভাগিনী উন্মাদিনীর শব-দেহ যথাবীতি স্থানীয় শ্মশানক্ষেত্রে আনীত হইল । অচিরে ই তথায় একটি চিতা সজ্জিত হইল—অচিরে তদোপরি শোণিতাক্ত উন্মাদিনী ননীবালাব শবদেহ স্থাপিত হইল । দেখিতে দেখিতে ছুর্ভাগ্য হতভাগ প্রেমিক অসিদ্ধবাবু হৃদয় কপ নন্দন কাননেব ছিন্ন পাবিজাত কুসুমটি অকালে ভস্মীভূত হইয়া গেল ।

আব প্রিয়া বিয়োগ বিধুব অসিদ্ধবাবু নীববে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, উত্তপ্ত চিতা, সুশীতল বারি বর্ষণে শাতল কবিয়া, সেই পবিত্র চিতাভস্ম অত্র পূর্ণ নয়নে, নিজ অঙ্গ সাধাবণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রাণ প্রিয়াব পবিত্র স্মৃতি সংবন্ধার্থে সকলেব অজ্ঞাতে অঞ্জলি পবিমিত সেই চিতা ভস্মবাশি নিজ পবিধেয় বস্ত্রাঙ্কলে রক্ষা করিলেন । এইকপে জনমেব মত, যুবক অসিদ্ধ-বাবু আশা ভবসা, তাঁহার প্রিয়াব সহিত সমস্ত ফুরাইল ।

বিবেক বুদ্ধি বিহীন ক্ষুদ্র মানব অসিদ্ধবাবু, তরুণ জীবনেব দ্বিতীয় আত্ম পদার্পণ কবিতে না করিতে, অদৃষ্টদোষে ভবিষ্যতের নির্ভুৎ কালচক্রে আবর্তিত হইয়া, আপন স্মৃথ ঐশ্বর্য্য হইতে চির বঞ্চিত হইলেন ।

* * * * *

এই দুঃখময় শোচনীয় বিষয়কর দারুণ চর্যটনায়, সমগ্র ক্ষীবোদপুর গ্রামবাসী—আবাল-বৃদ্ধ-বগিতা, সকলেই যাব পর নাই মগ্ধ হইয়া-ছিলেন ।

অসিদ্ধবাবু ইহাব পব আব কাবোদপুরে রহিলেন না । যে জন্তু ওগায় আসিয়াছিলে— যাহাব দরুন ওগায় উলেন, তাহার নিশান ত' কুনাঠেগাছে— তবে আব কেন ? কাবম্ থ লইয়া ওগায় থাকবে আব কোন হিসাবে ।

অসিদ্ধবাবু প্রভু শুক চিনিবামের সচিত সাধনয়নে সহদয় রামদয়াল বাবু নিকট হঠতে, বিদায় হইলেন । কবিকাতায় না গিয়া স্বতান্নাভিমুখে গমন করিলেন ।

রামদয়ালবাবু সহসা অভাবনীয় চক্রে পাড়িয়া তাহাব চিববাহিত সাধু-দর্শন আকাঙ্ক্ষায় বঞ্চিত বশতঃ ও আশ্রিত অসিদ্ধবাবুকে অবগ্নাৎ অচিন্ত্যনীয় অদৃষ্টবিলাটে আনোড়িত হঠতে দেখিয়া, তাহার হৃদয়ে দারুন আঘাত লাগিয়াছিল । এই আঘাতে তাহাব মেই স্মৃতি দুঃখময় জীর্ণ শোকস্মৃতি হৃদয়ে পুনর্বার ভাসিয়া উঠিয়াছিল । বিষম মনস্তাপে তিনি একান্ত অিয়মান হইয়া পড়িয়াছিলেন । তাহাব এই দারুন দুদিনে তাহাকে অবোধ বাক্যে সাঙ্গনা করিয়া, তাহার হৃদয়ে সস্তাপ হবণ কে করিবে ?

যিনি একবার করিয়াছিলেন—মেই মহাপুরুষ !

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।



বহস্য-প্রদীপ ।

তৃতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

“দেখবেন বাবু ?”

কৃষ্ণপক্ষ, দ্বিতীয়ারতিমিত রজনী । গ্রাণ্ড টার্মরোড । গভীর অন্ধকার ও পূর্ণ-নীরবতায় জন-মানবহীন রাজপথ এখন ডুবিয়া রহিয়াছে । এইরূপ ঘোব নীরব নিশীথে, এই পথের উপর দিয়া একখানি ছক্কর গাড়ি কনু কনু কনু মধুর রব তুলিয়া, নৈশ রাজপথের গভীর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া, বালি উত্তর পাড়ার দক্ষিণ পূর্বাভিমুখে ছুটিয়াছে । গাড়ীর মধ্যে দুইজন আরোহী, আরোহীদ্বয় বিষম উদ্বিগ্ন—বড়ই উতলা । তাহা তাহাদিগেব অযথা ব্যগ্রতায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট অস্তর, তাহারা এক একবার শকট চালককে, গাড়িখানি অধিকতর বেগে চালাইবার নিমিত্ত, অনুরোধ করিতেছে বা বিরক্ত করিতেছে ।

শকট-চালক, আরোহীদিগের কথায় নিরন্তর থাকিয়া, বিনা কণায়, বিবিধ কৌশলে, প্রাণপন যত্নে, ছকুম অনুযায়ি, গাড়িখানিকে অধিকতর দ্রুত লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইতেছে । কিন্তু পক্ষিরাজ অশ্ব দুইটি নিদ্রাতুর থাকায়, তাহার চেষ্টা তাদৃশ সফল হইতেছে না । ইহার জন্ত শকট চালক, মহা ক্রোধে, বেচারা পক্ষিবাজ অশ্ব দুইটির প্রতি নানাবিধ ছর্কোথ অকথ্য কুকথ্য প্রয়োগ করিতে, করিতে মুহূর্হু কসাঘাত করিতেছে । নিদারুণ কসাঘাতে পক্ষিরাজ অশ্ব দুইটি, চমক ভাঙ্গিয়া বিরক্তভাবে,

পশ্চাৎপদোৎক্ষেপন করিতে করিতে খানিক ছুটিয়া যাইতেছে, আবার নিজাবেশ বশতঃ তাহাদের গতি পুনর্বার সংঘত হইয়া যাইতেছে । আবার মিষ্টর শকটচালকের বিষয় নির্যাতনে ঘৃতপক পক্ষিরাঙ্গ অঞ্চলইটি, চমক ভাঙিয়া ছুটিতেছে ।

পরস্পরের এইরূপ ক্রমাগত চেষ্টা চরিত্রে, অবশেষে গাড়িখানি, বাণি উত্তর পাড়ার কোন একটি পার ঘাটের প্রান্ত গীমায় আসিয়া থামিল ।

শকটচালক তথায় উপস্থিত হইয়া, গাড়ির অভ্যন্তরস্থিত আরোহিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, “বাবু ! একবার দেখুন দেখি, এই জায়গা কি না ?”

উদ্বিগ্ন আরোহিদ্বয় তাড়াতাড়ি গাড়ির দ্বার উদ্বাটন করিয়া, বাহিরে গীম উন্নত করিয়া দেখিল,—বলিল, “হ্যাঁ এই জায়গা ।”

আরোহিদ্বয়, আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া, বিশেষ সতর্কতার সহিত গাড়ি হইতে অস্পষ্টে অন্ধকার পথে অবরোহণ করিল । তার পর একটি আরোহী অন্য আরোহীটিকে জীবদ্ অনুচ্চসরে কহিল, “তুমি অগ্রসর হইয়া দেখ, ঘাটে নৌকা থানা মজুত আছে কি না ।”

দ্বিতীয় আরোহী, বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুতপদে, ঘাটে নৌকাখানা মজুত আছে কি না, দেখিতে গেল ।

তারপর প্রথম আরোহীটি গাড়োয়ানকে তাহার প্রাপ্য মুদ্রা দিবার নিমিত্ত, গাড়ির লণ্ঠন-নিষ্কৃত আলোক-রশ্মির নিয়ন্ত্ৰণে আসিয়া, নিজ পকেট হইতে ‘মনিব্যাগ’ বাহির করিল ।

শকট-চালক, লণ্ঠন নিষ্কৃত হীনপ্রভ আলোকে প্রথম আরোহীটার হস্তস্থিত মুদ্রাদার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে, চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিল, বাবু ! গরিবের প্রতি একটু মেহরবানি করবেন, আপনারা আমীর লোক, এ বিষয়ে বেশী আর কি বলিব,—দেখবেন, বাবু ।”

আরোহী গাড়োয়ানের, এই বেশী কথায় বিরক্ত হইয়া, তাহার প্রতি তীব্র ক্রকুটি-ভঙ্গিমায় চাহিল, আরোহীর ইচ্ছা, নিঃশব্দে, বিনা বাক্য-ব্যয়ে, কার্য্য সম্পন্ন হউক ।

শকটচালক, তাহার তীব্র ক্রভঙ্গি দেখিয়া নীরব হইল, বোধ হইল, সে উহার সন্মত বুঝিল ।

আরোহী সস্তর মুদ্রাদার হইতে, কএকটি মুদ্রা বাহির করিয়া, শকট-চালককে অর্পণ করিল ।

শকট-চালক, মুদ্রা কয়েকটি আপন হস্তে পাইয়া, তাহার পার্শ্বস্থিত আলোক রশ্মি মুখে ধরিল—কুটিল কটাক্ষে দেখিল, প্রভূত—আশার অতীত ! তখন সে আশ্বস্ত হইয়া, হৃদয়ের সরল আনন্দে আরোহীকে সেলাম দিল, কিন্তু আরোহী সেলাম পাইবার পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে ।

শকট-চালক আরোহীর এইরূপ আশ্চর্য্য স্বভাবে, কিছু মাত্র চমৎকৃত না হইয়া, সে মনের আনন্দে তথা হইতে গাড়ি স্থানান্তরে লইয়া গেল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

—oo—

“এও কি হতে পারে !”

ঘোর ভিমিরাবৃত গভীর শ্রুতিত রজনী, এই সময় ছইটিলোক, বালি উত্তরপাড়ার একটি পার ঘাটে দাঁড়াইয়া, আপনা-আপনি কি কথা কহিতেছে, কথাগুলি বড়ই মূঢ় স্বরে কথিত হইতেছে ।

একটি লোক বিরক্ত ভাবে, অপর লোকটিকে বলিতেছে, “তুমি কি বল্চ ? এও কি হতে পারে !”

অপর লোকটি আনুগত্য ভাব দেখাইয়া বলিতেছে, “আজ্ঞে হ্যাঁ,—যতদূর সাধ্য, ততদূর বিশেষ করে দেখলাম,—ঐ তিনখানি খালি ডিম্বি ছাড়া, অল্প ডিম্বি ঘাটে নাই ।

“বেকুব ! ফের তুমি ঐ কথা বল্চ ?—পাগলের মত কথা কহিতে তোমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না ?—ওপারের ঐ আলোটা দেখে, তুমি কি এখনও বুঝতে পার্ছ না যে, আমাদের অল্প একখানি প্রস্তুত ডিম্বি এই ঘাটে মজুত আছে ?”

“তাতো বুঝতে পার্চি ; তবে আমাদের ডিম্বি দেখতে পার্চি না কেন ?”

“গাড়োল ! তুমি বেইমানি হিসাবে চল্চ বলে দেখতে পাও নাই । আমার সামনে, তুমি একবার যাও দেখি,—দেখ দেখি ; কেনন না তুমি আমাদের ডিম্বি এইবার দেখতে পাও ।”

এই তিরস্কৃত ব্যক্তি, আর কোন কথা না কহিয়া, ডিম্বি দেখিতে গেল, কিন্তু পরক্ষণে আবার কি ভাবিয়া, লোকটি যবকের নিকট ফিরিয়া আসিয়া

কহিল, “সাহেবজী পকেট বাতিটা একবার দেবেন,—ঐ ডিম্বি গুলোর ও পাশে যে নুগ্গি জলটা আছে, সেখানে একবার গিয়ে দেখি।”

যুবক, ঐ লোকটির এই কথায় যারপর নাই বিরক্ত হইয়া অধিকতর রক্ত স্রব তাহাকে কহিল, “পকেট বাতির কোন আবশ্যক করে না। তুমি”—

সেই লোকটি, যুবকের কথায়, এইবার ঈষদ্ বিরক্ত হইয়া, কহিল, সে কি সাহেবজী, বিনা আলোকে কি ওখানে যাওয়া যায়, ও কি রকম ভয়ানক আয়গা ; তা কি আপনি জানেন না ?”

এইকণ প্রতি উত্তরে, সেই যুবকের ধৈর্য্যচ্যুত হইল, যুবক বিষম ক্রোধ ভরে, সেই লোকটিকে অপমান করিয়া বলিল, “শুয়ার ! তুমি এ কি পরিচয় দিচ্ছ ?—আমার প্রত্যেক কথায় তুমি সমান জবাব করছ ? ইহার দণ্ড কি—তুমি জান না ?—তুমি কি মনে করেচ,—তোমার মতলব কি ?”

যুবক আত্মবিস্মৃত হইয়া, এই কথাগুলি, এমন উত্তেজিত হইয়া কহিয়াছিল যে, নীরব নিশীথ রজনীর অগাঢ় নিশ্চলতা ভঙ্গ হইয়া, কথাগুলি সেই তমসাচ্ছন্ন জাহ্নবী তটিনীর চতুর্পার্শ্ব ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে, অতি অস্পষ্ট দৃশ্যমান প্রেত ছবি সদৃশ, একটি দীর্ঘাকার মনুষ্য মূর্তি তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই নিশীথ তটিনী তটে ঐ সূদীর্ঘ প্রেতাকার ছায়া মূর্তি সদৃশ—মনুষ্য মূর্তি, সহসা তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সেই বাক্যবতপ্রাকারী ব্যক্তিব্যয় শিহরিত হইল না, অথবা প্রাণ ভয়ে, কোথায় পলায়ন করিল না। পরন্তু সেই ক্রোধাবিষ্ট যুবক, আগন্তুককে তাহাদের নিকট আসিতে দেখিয়া, সাধারণের বোধের অতীত, কি একটা ভাষায় আগন্তুককে কি কহিল।

আগন্তুক—সেই অস্পষ্ট দৃশ্যমান দীর্ঘাকার মনুষ্য মূর্তিটি, অমনি যুবককে কহিল, “গুলাম হাজির ?”

যুবক তাহার এই কথা শুনিয়া কহিল, “কেয়া দেব ?”

দীর্ঘাকার পুরুষ কহিল, “কুচ্ নেহি ?”

যুবক কহিল, “তব্ চলো ?”

দীর্ঘাকার পুরুষ চলিল।

তাহার পশ্চাতে যুবক এবং সেই ব্যক্তি চলিল।

কয়েক মুহূর্তের পর, সেই দীর্ঘাকার পুরুষ, তাহাদের উভয়কে একটি ক্ষুদ্র তরীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। ক্ষুদ্র তরীখানি জীবৎ আন্দোলিত অন্ধকারাবৃত নিশীথ জাহ্নবী সলিলে, অল্প অল্প ছলিতেছে। ক্ষুদ্র তরীখানির মধ্যে আরো ছই ব্যক্তি, অন্ধকারে মিশিয়া রহিয়াছে।

— তাহারা সেই ক্ষুদ্র নৌকাখানির সন্নিহিতে আসিলে, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি, কি একটা শব্দ করিল। এই শব্দের প্রতি উত্তর স্বরূপ যেন, সেই দীর্ঘাকার ব্যক্তি, কি একটা কথা কহিল।

তখন সেই ক্ষুদ্র নৌকারোহিদের মধ্যে, এক ব্যক্তি নিশীথের কাল জাহ্নবী সলিলে অবতরণ করিয়া, তরীখানিকে তীরে সংলগ্ন করিল।

অগ্রে যুবক, পরে সেই ব্যক্তি, তাহার পর সেই দীর্ঘাকার যক্ষ্মা, সেই তরী খানিতে আরোহণ করিল। ইহার পর, আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, সেই তরী তীরেসংলগ্নকারি ব্যক্তি, তরীখানিকে অগাধ সলিলে ঠেলিয়া দিয়াই তাহাতে আপনি চড়িয়া বসিল। পলকের মধ্যে এই সকল কার্য্য হইয়া গেল। অপরপারে পুঞ্জিকৃত অন্ধকারের মধ্যে, একটি দীপালোক লক্ষ্য করিয়া, ক্ষুদ্র তরীখানি তীরবেগে ছুটিল।

এইরূপ সময়ে যুবক জাকুটি ভঙ্গিতে কহিল, “বুলাকি ? তুমি ক্রমে ক্রমে তোমার কাজের ধরূপ নমুনা দিচো, তাহাতে তোমার ভবিষ্যৎ বড়ই বিপদজনক, তুমি এখন থেকে সাবধান হতে চেষ্টা করবে, ইঙ্গিতে আমি তোমায় এই কথা জানালাম।—শুধু তোমার গাফিলিতে আজ আমরা ঠিক সময়ে ডেরাতে পৌছিতে পালাম না। বোধ করি, ইহার ফলে আমাদের দলশুদ্ধ সকলকে অনর্থক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।”

বুলাকি কহিল, “আচ্ছা, আগার কণ্ডুর হয়েছে গাপ করবেন, আমি আর এ কাজ করব না। বাদের সঙ্গে থাকি, তারা মনের ব্যথা বোঝে না—তারা কেবল কাজ বোঝে, মনের মত কাজ না হলে—রাগ করে।

এই কথাগুলি বলিয়া, সেই লোকটি নীরব হইল। তারপর আবার বলিতে লাগিল, “আমার একমাত্র ছোট ভাইটি মারা গেছে, ইহার কারণ আমার মানসিক অবস্থা আজ কদিন থেকে বড়ই খারাপ হয়েছে। সেই জন্য, আমি আগে বলেছিলাম, অল্প কাহাকে সঙ্গি করুন, আমাকে দিনকতক রেহাই দিন, এখন আপনার মনের মত, কোন কাজ করতে পারব না, কাজে গাফিলি দেখুবেন। আপনি এ কথা শুনলেন না, জেদ

কোরে আমাকে আপনার সঙ্গে নিলেন। এখন আপনার মনের মত কাজ হয় নাই বলে, আমাকে খমখা গোলাগালি করলেন।”

সেই লোকটি মনের আবেগে, এই কথাগুলি বলিয়া, অধবদনে গীরব হইল।

যুবক পরম ভাষায় বলিল, “তোমায় গালি দিয়েছি কি ?—তোমায় আঁকলকে দিয়েছি।”

ইহার উত্তরে বুলাকি, কি বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু সেই দীর্ঘাকার পুরুষের নিষেধ বাক্যে বুলাকি, উক্ত কথায় প্রতিনিবৃত্ত হইল।

এইরূপে পরস্পরের বাদানুবাদ বন্ধ হইল।

তরীখানিও সেই আলোক লক্ষ করিয়া জাহ্নবীর অপর তীরে আসিয়া লাগিল।

এখন নিশা প্রায় অবসান। তটিনী তটস্থ অন্ধকারাবৃত্ত নিটবি শ্রেণী হইতে নিজেখিত বিহঙ্গমগণের মধুর কলস্রুতিগানে, সেই স্থান মুগ্ধিত হইতেছে।

এইরূপ সময়ে, সেই পক্ষ আদ্রোহিপূর্ণ ক্ষুদ্র তরীখানি, তীরে আসিয়া-
মাত্র, অপর পারের ছইজন লোক তরী প্রতি আগ্রসর হইয়া, অবতরনোগ্রুণ
যুবকের সম্মুখীন হইল।

যুবক তীরে পদার্পণ করিয়া উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের সহিত কএক মুহূর্ত্ত তথায় দাঁড়াইয়া কি কথা কহিল। এই কথাবাত্তায় যুবক যেন, কিছু অশ্রু মনস্ক হইল। সুন্দর মুখখানিকে বিকৃত করিয়া বলিল, “যা আসিয়া করে ছিলাম, তাই ঘটল দেখ্‌চি।”

তার পার্শ্বস্থ বুলাকিকে লক্ষ করিয়া বলিল, “দেখ্‌লে ! কেন আমি ব্যস্ত হইয়াছিলাম, কেন আমি তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলাম,—এখন বুঝে ?—একটু বেঁকুণীতে কতদূর কাজটা খারাপ হইয়া দেখ্‌লে ? একটু তৎপর হলে—সব দিক বজায় থাকতো।”

বুলাকি এই কথায় কোন কথা কহিল না, সম্পূর্ণ নিরুত্তর রহিল।

তারপর তরী বাহক সেই তিনটি লোক ব্যতীত, অপর সকলে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

— ০০ —

“কেন এরকম কল্লে ?”

দক্ষিণেশ্বরের ঠিক উত্তর পূর্বে, একটি পল্লিপথের উপর, একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। উদ্যানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর। তন্মধ্যস্থ দ্বিতল ক্ষুদ্র অট্টালিকাখানি আরও সুন্দর, বড় মনোহর,—ঠিক একখানি ছবির মত—দেখিতে বড় আরামদায়ক। এই উদ্যান ও তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকাখানি দেখিলেই মনে হয়, ইহা কোম সুকৃষ্টি সম্পন্ন সোখন ধনি-বাক্তির বিলাসভবন। উদ্যানটি সুদৃঢ় লোহ বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত ও নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রদেশী বিদেশী মনহর লতা 'জুলা ও পুষ্পবতী বৃক্ষে সুশোভিত, কিন্তু উদ্যানের প্রধান অঙ্গ—সুন্দর সরসী না থাকায়, এই সুদৃঢ় উদ্যানটি সর্বজন প্রাণগিত হয় নাই। যাহা হউক; আলেখ্য স্থানীয় এই উদ্যানটি সর্ব বিষয়ে নিখুৎ না হইলেও উহাকে একটি আরামেব স্থান বলা যাইতে পারে, তদ্বিবক্ষে মনেহ নাই।

প্রাতঃকাল, সূর্য উদয় হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এই সময়ে, এই উদ্যানস্থ দ্বিতল অট্টালিকার অনাবৃত ছাদের উপর ছইটি লোক বসিয়া পরস্পর কি কথা কহিতেছে। একজন বয়সে নবীন যুবক, আর একজন বয়সে বৃদ্ধ, ছইজনেই গৌরবর্ণ, ছই জনেই বলিষ্ঠ ও ছইজনেই অনাবৃত শরীর, অবশ্য উলঙ্গ নহে। ইহাদের আকার প্রকারে ও কথা-বার্তায় পশ্চিম দেশবাসি বলিয়া বেশ বুঝা যায়। ইহারা যথায় বসিয়া আছে, তাহার চতুঃপার্শ্বের দৃশ্য অতি চমৎকার, বড় মনমুগ্ধকর, অনন্ত সুদৃশ্য পল্লিগ্রাম—ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য পর্ণ-কুঠীর—যেন সুশ্রামল বৃক্ষপত্রের মধ্যে ডুবিয়া সুখাবেশে বিচেন।

এই সুদৃশ্য নির্মিত পল্লি-চিত্রের মধ্যে মধ্যে, শিশির স্নাত ক্ষুদ্র বৃহৎ উন্নত সোধচূড়া সকল, যুমন্ত দরিদ্র পর্ণকুঠীররূপ প্রতিবাসীর প্রহরীর কার্যে মিশ্রিত আছে।

এই চিত্তাপহারী মনহর দৃশ্যের অপর পার্শ্বে বিমল জাহ্নবী স্রোত নবীন

প্রভাত সমীরণে ধীরে ধীরে, নাচিয়া নাচিয়া, বহিয়া যাইতেছে । ইহার উভয়পাশ্বে চিত্র সম অট্টালিকা, পর্ণকূটীর, দেবমন্দির ও উদ্যান, প্রভাত তটিনীর শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিতেছে । এই প্রভাতী প্রাকৃতিক অনন্ত মহান দৃশ্য, কিরূপ আশ্চর্য্য মনমুগ্ধকর, তাহা আমার ক্ষুদ্র লেখনি কি লিখিবে ?

এই পুণ্যময় বিমল স্বর্গীয় দৃশ্য ও মধুময় প্রভাত সমীরণ উক্ত ব্যক্তির হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে নাই । তাহারা সেই অনাবৃত ছাদেব উপর মুহূর্ত্তে কথা কহিতেই মত্ত ।

বৃদ্ধ লোকটি আপণোষ করিয়া তিরস্কার ছলে, সেই নবীন যুবককে বলিতেছে, “আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি এই ছেলে গাছটি জেদেব দরুণ, কোন দিন বিষম বিপদে পড়িবে । আমি তোমাকে পই পই করে বারণ করি, তুমি এরকম কাজ কখনও করো না, তবু তুমি করবে,—এ তোমার কিরূপ স্বভাব । তুমি টেলিগ্রাফের উদ্দেশ্য জেনে শুনে, কেঁদে এরকম কলে,—বুলাকিকে কেন সঙ্গে নিলে, অন্য লোককে কেন সঙ্গে নিলে না,—দেখ দেখি একটু বিলম্বের জন্যে কাজ কতদূর খারাপ হলো ।

বৃদ্ধ, এই কথাগুলি বলিয়া, যুবকের প্রতি চাহিয়া ক্ষণেক থামিল ।

যুবক নিম্নদৃষ্টে অধঃবদনে নিরন্তর, বৃদ্ধের কথায় কোন কথা কহিল না ।

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল, “আর ঘণ্টা খানিক আগে আস্তে পারলে, সব দিক বজায় থাকতো ; এই ছত্তে পাঞ্জি সাহেব বেটার চোকে ধূলা দেওয়া যেতো,—সে বেটা নরম হতো । তার পর আজি রাত্রে আবার দরিয়াপুরে রওনা হয়ে, সেখানকার কাজ হাসিল করতে পাব্তে ।—

বৃদ্ধেব এই কথার পর, যুবক এইবার কথা কহিল, সে বলিল, “কাকা ও কথা যেতে দিন, যা হ’য়ে গেছে, সে কথা নিয়ে, মিছে আর নাড়ানাড়ি কেন ? এখন উপস্থিত কর্তব্যতা ভাবুন । আমি থাওয়া দাওয়ার পর, সেই সাহেব বেটার সঙ্গে দেখা করবো গিয়ে ; তার পর যেমন বুঝবো, তেমনি করবো । এখন আমি আপনাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করি, সে কথা বলুন, সাহেব বেটার মেজাজ কেমন ?”

বৃদ্ধ কহিল, “বেটার মেজাজ বড় কড়া, একটা খাজা গাঁয়ার বলি-
গেই হয় ।”

যুবক এই কথায় লগাট কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে তীব্রকটাক্ষে বৃদ্ধের উক্ত কথায় সায় দিল, “হুঁ।”

তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, “এখানে যে বাঙ্গালি বাবুটি ছিলেন তিনি কোথায় বদলি হলেন।

বৃদ্ধ কহিল, “কলিকাতায়।”

যুবক এই কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল নীরবে, কি ভাবিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, “সাহেব বেটা এখানে আগাকে ক-দিন খুজ্তে এসেছিল?”

“যেদিন এসেছে—তাহার পরদিন থেকেই,—একদিনও কাগাই নাই।”

“কখন কখন আসতো?”

“তার কোন ঠিক নাই—কখন রাত্রি ছুঁর,—কখন রাত্রি ছুটো, কখন রাত্রি ভোর,—এই আজ ভোর বাত্ৰিতে এসেছিল,—তুমি আসবার একঘণ্টা আগে। আজ বেটা তারি শাসিয়ে গেছে; বেটা ওয়ারেন্ট বার কব্বো—জেনে দেব বলে গেছে।”

ইহাব পর যুবক কহিল, “এখানকার পুলিশের নুতন বন্দোবস্ত হবার উপক্রম দেখে, কেন না আমায় আপনি পূর্ক হতে টেলিগ্রাফ দ্বারা সতর্ক না করে—এরূপ দেরিতে টেলিগ্রাফ করিবার কারণ কি?”

বৃদ্ধ কহিল, “যে সাহেব বেটা এখানে এসেছে, তার নাম, আমি আর কখন শুনি নাই। সাধারণ লোক যেমন হয়, এই নুতন পুলিশ সাহেব বেটা বুঝি, তেমন হবে মনে কবে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। তারপর দুই এক-দিন এ বেটার সহিত কথা কয়ে কড়া বোল চালের ভাব ভঙ্গি দেখে, বুঝতে পালাম, এই সাহেব বেটা সরল লোক নয়—ভারি সয়তান। তোমার এই রকম গব্ হাজিরেব ছুতো ধরে আমাদিগকে বিপদে ফেলবার আশংকায়—অগত্যা টেলিগ্রাফ করতে বাধ্য হয়ে, তোমাকে ইঙ্গিতে শীঘ্র আসতে বলেছিলাম।”

যুবক এই কথাগুলি মনোযোগ পূর্কক শুনিল, তার পর চিন্তিত অন্তঃকরণে বলিল, “আপনি সাহেবের সহিত কি রকম কথা কয়েছিলেন?”

বৃদ্ধ কোন একটা গ্রামের নাম করিয়া বলিল, অমুক গ্রামের জমিদার—পিতাম্বর বাবু বাড়িতে গেছে, পিতাম্বর বাবুর বড় ছেলে হজরতের প্রিয় সাক্ষরেত হয়, সেখানে একটা বড় কুস্তি হইবার কথা আছে, তাই হজরত সাহেব, সাক্ষরেতের আমন্ত্রণ পত্র পোষে সেখানে গেছে।”

যুবক এই কথায় যেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, উৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল,
“একথা শুনে মাহেব কি বসে ?”

“মাহেব একথা শুনে আদর্শে বিস্ময়িত কহে না ।”

যুবক উদ্বেগপূর্ণ হইয়া বুকের মুখেই প্রতি চাহিয়া, তাহার শেষ কথা প্রতি-
নি করিয়া বলিল, “বিস্ময়িত কহে না ।”

১৮। বগবে কাহল, “না ।”

যুবক পুনরায় উৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, “তাবপব মাহেব বেটা কি
বসে ?”

তার পর সে বেটা কড়া কথায় জবাব দিয়ে বসে, “ওমব কথা আমি শুনতে
চাহি না,—আমি হজরতকে আজ দেখতে চাই ?”

যুবক বুদ্ধ প্রমুখাত এই কথাগুলি শুনিয়া, শুনিয়া অধোবদনে স্থিরভাবে
কতক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিল । তাবপর যুবক সহসা নিজোখিত মল্লধোর
মত চমকিত হইয়া বুদ্ধকে মনোমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আচ্চা কাকু
মাহেব বেটাব মতলব কি ?”

এই কথার চিহ্নিত কথা উচ্চারণ করিয়া, যুবক বুকের স্বৈত্র-শব্দ-বিমুক্তিত বদন
পানে উৎসুকচিত্তে চাহিল ।

বুদ্ধ যুবক বড়ক এই কথা জিজ্ঞাসিত হইয়া, তার পরে কহিল, “বেটার
মতলব হার !—কালকাতান সেই গাজি কোতয়াল মাহেবের তাজকে, এই
খিজ বেটা একটা চাতুরি খেলচে ।”

হজরত বুকেব এই প্রহেলিকাময় কথার ময়ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া
বিশেষ ব্যস্তভাবে কহিল, “চাতুরি খেলচে !—কি চাতুরি খেলচে ? স্পষ্ট কবে
বলুন, তা নীর কথা ভাব শুনতে পারিচনা ।”

বুদ্ধ স্পষ্ট করিয়া বলিল, “বড়বাজারের সেই মণিলাল জলরী—তাম যাব
কাছে আগে কাজ কবুতে—সে সম্প্রতি একটি খনি মোকদ্দমার পালাতক
আমাসী । পুলিশেব লোক নানা উপায় খাটিয়ে তাব সন্ধান পায় নাই ।
এখন যদি তোমা হতে তার সন্ধান হয়,—তুমি তার কাছে অনেক দিন চাকরি
ও সাক্ষ্যেতা কলচে,—তা ছাড়া ; তার হাও চাল, ডেরা দাঙা তোমার কাছে
দুকান নাই,—এক কথায় তুমি তার সব বিষয় জান । এই বিষয়েব বশবস্তী
হয়ে কালকাতান কোতয়াল মাহেব, এইখানকার পুলিশ মাহেবকে অমূল্যোধ
করেব বনে পাঠি-সছে সে, তোমার হুকুম—হজরত পেশোয়াবী নামে অব

একজন পাকা বদমাইস বাগ করে, তুমি তাকে পিড়াপিড়ী করে—কোণে ফেলে,—যে কোন প্রকারে তুমি পাম,—আমাব এই খুনি মোকদ্দমার কিনারা যাহির কবিত্তে চেষ্টা করিবেন ।”

বৃদ্ধ আরও কিছু বিবৃত কবিত ; কিন্তু তাহার কথায় বাধা পড়িল ।

বৃদ্ধমুখে “মণিলাল জহুরী, সম্ভ্রান্তি একটা খুনি মোকদ্দমার পালাতক আসামী এই কথা শুনিবামাত্র হজরত মুহূর্ত্তে আপন অবস্থা বিস্থত হইয়া, সবিস্ময়ে বিষম আগ্রহভবে বৃদ্ধ বর্ণিত শেষ কথা পর্য্যন্ত শুনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল ; কিন্তু পারিল না—দাক্ষণ অধৈর্য্যে একান্ত উদ্বেলিত হইয়া, হজরত বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, “আপনি এসব খবর কেমন করে জানুতে পাল্লেন ?”

বৃদ্ধ নিজ কথিত কথা ছাড়িয়া, হজরতের জিজ্ঞাসিত কথা বলিতে লাগিল, “সাহেব বেটা যখন ঘন ঘন কড়া তদারক আরম্ভ কল্লেন, তখন আমর মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মাল, মনে হইল—বুঝি বেটা আমাদের কোন ছুত ধবুতে পেবেছে । অমনি আমি নিশ্চিত থাকুতে না পেরে ভোগাকে এখানে আসবার জন্ত টেলিগ্রাফ কব্বাম ; তাবপর এই কড়া তদারক কব্বার প্রকৃত কারণ কি ?—জানবার জন্তে, গোপনে পুলিশে একটা লোক পাঠালাম !—

“তাব মাঝফত এই সব ব্যাপার জানুতে পাল্লাম ।”

হজরত এই সব বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যারপর নাই উৎসাহিত হইল, মুহূর্ত্তে একটি প্রেমপূর্ণ মোহনীগুণ্ডী তাহার হৃদয়াকাশে উদ্ভিত হইয়া, পলকে তাহাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া অনেক সুখছবি দেখাইলেন—যুবক হজরত তাহাতে বিভোর হইল । এই সুখ সময়ে, তাহার পরম শত্রু মণিলাল !—একমাত্র সুখের পথের অনন্ত অজ্ঞার মণিলাল !—তাহার প্রেম প্রতিদ্বন্দ্বি ছবুত মণিলাল ! তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার আত্ম সুখে ব্যাঘাত জন্মাইল । বিষম ক্রোধে হজরত ছবুতকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবাব জন্ত বজগুণ্ডি ধারণ করিল ।

বৃদ্ধ হজরতের এই আকস্মিক ভাব বিপর্যয় দেখিয়া, বিষয় বিজড়িত আশ্চর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “এ কি ! কি ভাবটা ?”

হজরত বৃদ্ধের এই কথায় আকস্মিত হইয়া সমদ্যটে প্রকৃতিস্থ হইল, আত্ম-ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে কহিল, “কাকা ! এট ঘটনায় আমাব অনেক-দিনেব একটি আশা বড় সহজে মিটিবে—যা এতদিন বহু চেষ্টা কবেও সূত্রো

অভাবে হাসিল করতে পারি নাই,—তাই উপস্থিত ব্যাপারে,—পরের মাথায় হাত বুণিয়ে অতি সহজে হাসিল করতে পারবো ।”

বৃদ্ধ হজরতের তাৎকালিক কথা কহিবার ভঙ্গি দেখিয়া, তাহার কথিত কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বিশেষ আশ্চর্যের সহিত কহিল, “তুমি কি বল্ছো ? তোমার কথা ভাল বুঝতে পাচ্ছি না ।”

হজরত বৃদ্ধকে ভালকবিয়া বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, “একটি প্রতিশোধ !—দারুণ মর্যাদাস্তিক অপমানের একটি প্রতিশোধ ।”

“প্রতিশোধ ! কিসের প্রতিশোধ ?” বৃদ্ধ হজরতের কথার মর্ম বুঝিতে অক্ষম হইয়া তীব্রস্বরে হজরতের শেষ কথা প্রতিধ্বনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “প্রতিশোধ !—কিসেব প্রতিশোধ ?”

এইবার হজরত বৃদ্ধকে বলিল, “আপনার কি মনে নাই ! মণিলাল আমার অপমান করেছে—মণিলাল আমার শত্রু ।”

বৃদ্ধ এতক্ষণে তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল,—এতক্ষণ তাহার অজ্ঞান-নিহিত গূঢ় অভিমুখি ভেদ করিতে পারিল । বৃদ্ধ বলিল, “ওঃ ! সে কথা তোমার এখনও মনে আছে ?”

হজরত তাহার বিস্তৃত ললাট কুঞ্চিত করিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিল, “এ কথা মনে থাকবে না !—বলেন কি ! যতদিন তার সর্বনাশ করতে না পারবো, ততদিন মনে থাকবে ।”

এই কথায় বৃদ্ধের সামান্যভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়া, বৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত রূক্ষ-স্বরে কহিল, “তবে কি তুমি মনস্থ করেচ ; পুলিশের লোকের সঙ্গে যোগ দিয়ে মণিলালকে ধরিয়ে দিয়ে, তোমার প্রতিশোধের চূড়ান্ত করবে ?”

হজরত বিন্দুমাত্র গম্ভীর্ণ না হইয়া বৃদ্ধের জিজ্ঞাসিত কথার উত্তর দিল, “নিশ্চয়ই ! এমন সুযোগ পেয়ে আমি কেন ছাড়ব । যে আমার প্রাণে মর্যাদাস্তিক লজ্জা দিয়েছে—হৃদয়ে আঘাত করেছে,—পরমেশ্বরের কৃপায় সুসময় পেয়ে তার সর্বনাশ করব না ?—বলেন কি !”

বৃদ্ধ হজরতের এই সব কথা শুনিয়া অবাক ! তাহার মুখপানে চাহিয়া কিছুকাল গুপ্তিত্বরহিল, তারপর বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কহিল, “তুমি নিমকহারামী করবে ?”

হজরত নির্ধিকারে উত্তর দিল, “বেইমান মণিদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে, নিমকহারামী করা হয় না ।”

বৃদ্ধ হজরতের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া অধিকতর নিশ্চয় সহকাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, “বল কি হজরত !”

হজরত পূর্বকার মত দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল, “তবে আর কি !”

বৃদ্ধ হজরতের এইরূপ কথা বার্তায় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তাহার চির যোগ্যতার বিষয়, মুহূর্তের বাকবিতণ্ডায় বিশ্বত হইয়া, তাহার ছুর্বোধ চরিত্র প্রসঙ্গ লইয়া, কত কি চিন্তা করিতে লাগিল।

হজরত পুলিশের সহিত যোগ দিয়া, মণিলালের সর্বনাশ করিবে ?—একি ভয়ানক কথা ? যে পুলিশ তাহাদিগের জীবন শত্রু ! সেই পুলিশের সহিত সে অবদীলাক্রমে নিঃসন্দেহে মিলিয়া, পুরাতন প্রতিপালকের প্রতি নিজ প্রতিহিংসাবৃত্তি অবহেলায় চবিতার্থ করিবে। মুহূর্তের কথা বার্তায় যাহার মস্তিষ্কে, এরূপ ভয়ানক অনর্থকরী ভাব প্রবেশ করিয়া বাহাকে এতদূর উদ্ভাগ করিতে পারে—সে কি ভাল লোক ! আর মণিলাল জহুরী যে ব্যবসায়ী, পক্ষান্তরে আপনায় সম্পূর্ণ সেই ব্যবসায়ী না হইলেও উভয়ে সম শ্রেণীস্থ ব্যক্তি। উভয়ের বিপদ আপদে চিরকাল উভয়ে উভয়ের সহায় ইত্যাদি আরও কত কি ?

যাই হউক, উভয়ের মুহূর্তের এই পূর্বাপর ভাবনা রহিত অসংযত বাকবিতণ্ডায়—এই রূপান্তর উভয়ের পক্ষে মঙ্গল জনক নহে।

ইহারা যখন পরস্পর বিভিন্ন চিন্তায় বিচরণ করিতেছে। তখন নিয় হইতে একটি কুস্তিগীর পালোয়ান তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, “বাবু সাহেব ! দারগা সাহেব নিচু খাড়া হায়, ক্যায়্য বলেগা ?”

বৃদ্ধ এই খবর সচমকে শুনিল,—শুনিয়া কি বলিবে—কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, সেই লোকটির মুখপানে চাহিয়া খানিক কি ভাবিল; তার পর বলিল, “বল আভি হজরত সাহেব আয়া নেই।”

কুস্তিগীর পালোয়ান ! “যো হুকুম বলিয়া, যেমন গমন করিবে,—অমনি দেখিল, পশ্চাতে দারগা সাহেব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

কুস্তিগীর পালোয়ান চমকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দারগা সাহেব মৃদু হাস্য সহকারে বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া কহিল, “কি ওস্তাদজী ব্যাপার কি ? আপনি হজরতকে লুকোচ্ছেন কেন ?”

বৃদ্ধ নিবর্ণ কৃত মুখে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, “কি জ্ঞানেন, দারগা-সাহেব ? ওটা—ওটা—”

দারগা সাহেব বুকের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “ওস্তাদজী ! এখন বেশী কথা শোনবার বা কয়বার সময় নাই—নিজে পুলিশ সাহেব আপেক্ষা করছেন। তিনি হজরত সাহেবকে দেখতে চান ?”

এই কথায় বুকের মুখের কাষ্ঠ হাসিটুকু একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বুদ্ধ মিনতি সহকারে দারগা সাহেবকে কহিল, “হজরত সাহেব এই আসছেন আহারাদির পর, একটু স্থির হয়ে সাহেবের সহিত দেখা করবে; আপনি অগ্রাহ্য করিয়া সাহেবকে জানাবেন—হজরত সাহেব নাই। আর খানিকক্ষণ পরে, আপনি এখানে একটি লোক পাঠিয়ে দিবেন—বুঝেন ?”

দারগা সাহেব বুকের এই কথায় উচ্ছ্বাস করিয়া বলিলেন, “ওস্তাদজী ! আমার কপালের উপরে এই বড় বড় চোক ছটো, যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণে সন্দেহ আছে, তখন আমি এত বড় অলজীমস্ত সত্যি কথাটা—কেমন করে ঢাকবো বলুন দেখি।”

বুদ্ধ এই কথার উত্তরে কি যেন বলিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে নিম্ন হইতে কোরিকট শব্দে দারগা সাহেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হজরতের দেখা পেয়েছেন কি ?”

দারগা সাহেব অমনি তাহার সম্মুখের উত্তর দিল, “হ্যাঁ দেখা পেয়েছি।”

বুদ্ধ প্রস্তুতাবে দারগা সাহেবকে কহিল, “কি বল্লেন।”

দারগা সাহেব বলিল, “আমি কি করবো ওস্তাদজী।”

হজরত প্রত্যক্ষ নিস্তব্ধ ছিল, —কেমন ছিল ?—সে জানে। এখন বিড়ম্বনার আদিক্য দেখিয়া বুদ্ধকে কহিল, “কাফা ! আপনি কেন—অপ্রস্তুত হতে যাচ্ছেন, আমি যাই, সাহেবের সহিত দেখা করে আসি।”

বুদ্ধ হজরতের এই চঞ্চলতায় বড় বিরক্ত হইল। দারগা সাহেব না থাকিলে তাহাকে কিছু তিরস্কার করিত। কিন্তু সে বাড়াবাড়ি তাহার উপস্থিতে হজরতের ভাগ্যে তাহা খটিয়া না।

দারগা সাহেব উভয়ের এই বিভিন্ন ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন, বুদ্ধকে তীব্র কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া কহিল, “একি ওস্তাদজী ?”

ওস্তাদজী কোন্ কথা কহিল না, —ওম হইয়া বসিয়া রহিল।

হজরত মানসিক উচ্ছ্বাসতা বশতঃ, বুকের তাত্ক্ষণিক স্বপ্নাভার অদৃশ্য না হইয়া, দারগা সাহেবকে অগ্রগামী হইতে কহিয়া, আপনি তাহার পিছুৎ বৃত্তি হইল। তাহার এই অবিমূঢ়াকারীতার, বুদ্ধ যারপর নাই বিচলিত হইল,

দাক্তন বিরক্ত বিজড়িত অব্যক্তমন গীড়ায় একান্ত অস্থির হইয়া বস্ত্র পুতলি প্রায় তাহাদিগের অনুসরণ করিল এবং কিকরিয়া হজরতকে এই উপস্থিত উত্তম হইতে প্রতি নিবৃত্ত করিলে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

হজরত দারগা সনভিব্যাহারে নিয়মে আগিয়া দেখিল, সাহেব নাই। আশ্চর্য্য হইয়া দারগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “সাহেব কোথায় গিয়াছেন ?”

দারগা সাহেব উত্তরে বলিলেন, “তিনি পথে গাড়িতে আছেন।”

হজরত কিছু অগ্রমনক হইয়া কহিল, “আচ্ছা দাঁড়ান, আমি পাছকা গ্রহণ করিয়া আসি ?”

দারগা সাহেব দাঁড়াইল ? হজরত পেশোয়ারী পাছকা গ্রহণ করিতে একটি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল।

আর কোন সময় !—বৃদ্ধ এই অভাবনীয় ফুরসতে যেন আসন্নকালের হস্ত হুইতে পরিজ্ঞান পাইয়া ভ্রমিতপদে, সেই প্রকোষ্ঠ অভ্যন্তরে গমন করিয়া, অতি মৃদুস্বরে হজরতকে উপদেশ ছলে শায়াইয়া এই কয়েকটি কথা বলিল, খুব সাবধান মণিলালের বিরুদ্ধে তুমি কদাপি বাইবে না। যদি বাও তাহা হইলে তোমার আমার সকলের—বিপদ অবশ্যম্ভাবী !—একথা স্মরণ রাখিও ! আমাদের শত্রু—পুলিসকে কখন বিশ্বাস করিও না !—তাহাদের একটিও কথায় ভুলিও না !—তাহারা বড় চতুর ! তুমি যদি এ রকম কর—আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত ! তুমি বুঝিবে,—আমি তোমাকে কি ঈজিত করিলাম !”

হজরত নীরবে পাছকা গ্রহণ করিতে করিতে বৃদ্ধের এই কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিল। তারপর হজরত যুগপৎ ভূত-ভবিষ্যতের নানা চিন্তায় অভিভূত হইয়া দারগা সাহেবের সহিত সেই গুহ্র উদ্যানবাটী অতিক্রম করিয়া পল্লি পথে পদার্পণ করিল। হজরত দেখিল, একটি পুলিস গ্রহণ রক্ষিত, একটি অশ্রয়ান তাহাদিগের সম্মুখে অবস্থিত আছে। কিন্তু তন্মধ্যে অস্ত্র আরোহী নাই। সবিস্ময়ে হজরত দারগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “সাহেব কোথায় ?”

দারগা সাহেব মুছ হাসিয়া বলিলেন, “তিনি থানায় আছেন।”

হজরত দারগা সাহেবের এই কথায় জীবৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, “তবে আপনারা এইরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিলেন কেন ?—স্পষ্ট কথায় আসি কি আপনারদের সঙ্গে বাইতাম না ? আপনারদের উদ্দেশ্য কি ?”

দারগা সাহেব পূর্বমত হাশ্ব মহকারে কহিলেন, “মশাই আমরা কি করিব, পুণিস সাহেবের যেমন উপদেশ পূ”

হজরত খিরজির সহিত গাড়িতে আরোহণ করিল। তাবপর দারগা ও তাহার ছ একটা অমুচর গাড়িতে উঠিয়া বসিল, গাড়িও অমনি গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

“প্রতিশোধ ।”

বিমলপ্রসাদ এক বিখ্যাত জুয়াড়ি। তাহার বিখ্যাত বৈঠকখানা বড়বাজারের কোন একটি গঙ্গাৰ্ণ গলির মধ্যে বিরাজ করিত। এখন তাহার অভাবে এবং ইংরাজ বাহাদুরের প্রভাবে, তাহার সেই প্রসিদ্ধ বৈঠকখানার নিশানা তথায় আর নাই। তিনি যেমন আগীর লোক, তেমনি মোখিন পুঙ্খ ছিলেন। তাহার বৃহৎ অট্টালিকায় বিস্তর বেতনভুক্ত কুস্তিগীর পালোয়ান বাস করিত, তাহারা মনিবের মৎ এবং অমৎ কন্মে সহায় হইয়া মনিবের সম্মান রক্ষা করিত।

এই কুস্তিগীর পালোয়ানের মধ্যে সুলতান পেশোয়ারী নামা একজন এক-প্রতিষ্ঠ মলজীবী বাস করিত। তাহার একটি অপগত শিশু ছিল, সেটি একটি ধাত্রী দ্বারা পালিত হইত। শিশুটি দিব্য ফুটফুটে—ধাত্রীকোণে হাসে খেলে কাঁদে। অনিন্দ শিশুর এই বিমল বাল্যলীলা সুলতানের কোতুকপ্রায় বন্ধুবান্ধবগণ দেখিতে বড় ভাল বাসিত, এমন কি তাহাদের মলিব বিমল-প্রসাদও ভাল বাসিত। কিন্তু একটি বিষয়ে তাহারা সকলে বড়ই কোতুহলী ছিল—বালকটিকে সুলতান পেশোয়ারী কোথা হইতে পাইল! যদি কেহ কখন উৎকট কোতুহলে বশবর্তি হইয়া পেশোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিত, “আচ্ছা ভাই এই শিশুটির বৃত্তান্ত কি?” সুলতান পেশোয়ারী অমনি কোন অব্যক্ত শোকে মান হইয়া, তাহার কোতুহলী বন্ধুকে এ বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিত।

এ বিষয় চাপিয়া রাখিতে সুলতান পেশোয়ারী, কেন চেষ্টা করে, তাবিয়া তাহার বন্ধুগণ নামা অলীক চিন্তায় পতিত হইত ।

যাই হ'ক ; শিশুটি সকলের আনন্দের সামগ্রী হইয়া, ক্রমে ক্রমে ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল । এই সময়ে অকস্মাৎ এক অতাবনীস ঘটনায় তাহার পিতার কাল হইল ;—তাহা বড়ই বিষয়জনক । একদা কোন দিক বিজয়ী সুলতানকে পরাজিত করিয়া সুলতান পেশোয়ারী, তাহার বিজয় উল্লাসে, উল্লাসিত বন্ধুগণ পরিবৃত্ত হইয়া, একটি অনাবৃত শকটারোহণে বাটী ফিরিতেছিল । এই সময়ে হঠাৎ কি অটেনসর্গীক কারণে,—জানি না, তাহার খাম প্রখাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিল ।

বালক, পিতার এই অকাল মৃত্যুতে, অবলম্বনহীন হইয়া পড়িল । কিন্তু বিমলপ্রসাদ বালকের বলিষ্ঠ অবয়ব, শারীরিক সামর্থ ও তাহার বিপুল সাহস দেখিয়া, তাহাকে আপনার দলভুক্ত করিয়া রাখিল । এইরূপে শিশুহীন বালক বিমলপ্রসাদের কৃপায় ও নিজগুণে, কালক্রমে তাহার পিতার স্থায় বিক্রমশালী সুলতান মধ্যে পরিগণিত হইল । বালক যখন উষাব যৌবন প্রতিভায় বিচরণ করিতেছে ; তখন বিমলপ্রসাদ, একটা ভয়ানক জালিয়াত মোকদ্দমার আগামী হইয়া, প্রথমে শ্রীমন্দিরে তৎপরে দ্বীপান্তরে গমন করিল ।

এইরূপে দ্বিতীয়বার যুবক সুলতান, আশ্রয়চ্যুত হইয়া কিছু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল । কিন্তু তাহার সামর্থ্যের কথা, তাহার অসম সাহসের কথা, দেশ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল । এই হেতু তাহাকে বেশী দিন, এইরূপ অবস্থায় থাকিতে হয় নাই । শীঘ্র তাহার একটি আশ্রয়দাতা জুটিয়া গেল । এই আশ্রয়দাতা আর কেহ নহে,—তাহার মণিলাল জহরী । প্রিয় পাঠক ! এখন বুঝিলেন ? ঐ বালক কে ?—সেই হজরত পেশোয়ারী ।

মণিলাল জহরী, তাহার কার্যগুণে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে বিলক্ষণ পদস্থ করিয়াছিল । কিন্তু হতভাগ্য যুবক—হজরত পেশোয়ারী, যৌবন সুলতান স্বভাবের বশবর্তী হইয়া, মণিলাল জহরীর নিকট, যে অপরাধে অপরাধী হইল, তাহাতেই হতভাগ্য যুবক বিশেষ অবমানিত হইয়া তাড়িত হইল ।

তারপর যৌবন প্রমত্ত হজরত পেশোয়ারী, কতকগুলি প্রকাশ্য বদমাইসের দলভুক্ত হইয়া, সহরে ভয়ানক উপক্রম করিতে লাগিল । ইহার ফলে এই হইল, সে সহর হইতে বিতাড়িত হইল এবং ভবিষ্যতে আর কখন সহরে পদার্পণ করিতে পারিবে না । যদি সে ভুলক্রমে কখন আসে, তাহা হইলে বিনা ওজবে

তাঁহাকে জীমন্দির দেখান হইবে। তাঁহার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ হইতে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

হজরত পেশোয়ারী মহর হইতে বিতাড়িত হইয়া, কোন একটি পল্লীগামে গিয়া বাস করিল। জীবিকাভ্যন্তের নিমিত্ত, তথায় কতকগুলি ছোট্ট মহতর সংগ্রহ করিয়া, নানাবিধ অসদোপায় অবলম্বন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

হজরত পেশোয়ারী যখন জীবনের এইরূপ দ্বিগিত অন্ধে বিচরণ করিতেছিল। তখন কোন একটি ঘটনা হইল, তাহার পিতার এক সুহৃদ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পিতৃবন্ধু হজরতের পূর্বাপর অবস্থার বিষয় আত্মপূর্বিক সংস্কার শুনিয়া, তাহাকে নিজ মহতরভুক্ত পরিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিল, এবং কহিল,—“তুমি আমার কাছে আসে থাকিবে ; আমি এতদিন তোমার মত, এক আত্মীয় ব্যক্তির অঙ্গসন্ধান করিতেছিলাম। আমি এখন বুদ্ধ হইয়াছি, আমার কাজ কর্ম ভাগ করিয়া, দেখিতে শুনিতে পারি না ; তোমার মত, আমার একজন আপনীর লোক,—আমার কাছে যদি থাকে, তাহা হইলে আমি বুদ্ধকালে, একটু স্থিতির হইতে পারি। আর আমার যা কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে, তুমি যদি আমার আপনীর লোকের মত, বুঝিয়া সুঝিয়া মনযোগের সহিত, আমার কাজ দেখ শুন, তাহা হইলে সকলই তুমি ভোগ করিবে।”

যুবক হজরত পেশোয়ারী, পিতৃবন্ধু দত্ত এই সুপরামর্শ যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া, ঘিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার দলভুক্ত হইল। এবং নিজ কার্যকুশলতার অল্প দিনের মধ্যে, তাহার পিতৃবন্ধুর প্রিয় হইয়া উঠিল।

প্রিয় পাঠক মহাশয়! আপনি অবশ্য জানিতে উৎসুক হইয়াছেন ; হজরত পেশোয়ারীর এই পিতৃবন্ধু বৃদ্ধের কার্য কি। কার্য কি জানেন ?—জাল, জুয়াচুরি, সময় মত চুরি ডাকাতি ও অর্থ লইয়া ছোট্ট জমিদারের পক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অবস্থান প্রভৃতি কার্য—আর বৃদ্ধ সুবাদে হজরতের কেই হয় জানেন ?—কাকা। উপবোধ সেই—কাকা। যাহার সহিত হজরতের সেই নিভৃত ঘোঁষনীয়ে যুদ্ধস্বরে—গোপনে কথাবার্তা, বাকবিতণ্ডা হইতেছিল,—সেই কাকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

‘লালকুঠি’—বিশেষণ ।

হজরত পেশোয়ারী আজ কয়েক দিবস হইতে, কোন্‌ ছুটে জমিদারের
তরফে অবস্থান করিতেছিল, এবং অযোগ্যত সেই জমিদারীর প্রান্ত্র প্রদেশে
ছই ক্রোশ—দশ ক্রোশ অন্তরে, বেমালুম চুরি কিসা ছোট খাট রক্তমের দম্বা-
তায় লিপ্ত ছিল। হঠাৎ পিতৃবন্ধ—রক্ত কাকার পেরিত তারঙ্গবাদ পাইয়া
অতিশয় ভীত হইয়া, মজর কাকার নিকট আসিতে বাধ্য হয়। তারপর হজরত
যাহা শুনিল, যাহা করিতে প্রস্তুত হইল। প্রিয় পাঠক মহাশয়! ইহা আপনি
স্ববগত আছেন।

হজরত পেশোয়ারী যুবজনোচিত চাপল্যে স্বক আকৃষ্ট হইয়া, যেরূপ অরি-
ম্বদাকারীতার পরিচয় প্রদান করিল; তাহা তাহার পক্ষে বিশেষ অমঙ্গলের
আশঙ্কা থাকিলেও তাহার এই চাকলতা, তাহার ভাগ্যের অপর্যায় বিধান
আল্লাহদের ভবিষ্যতের মঙ্গল উদ্দেশ্যে পরিণত হইল।

নানা হুশিষ্ঠায় জজরীভূত ও অস্থমনক হইয়া, হজরত পেশোয়ারী যখন
দারোগা সাহেবের সহিত থানায় উপস্থিত হইল, তখন পুলিশ সাহেব থানার
ঘরে দণ্ডায়মান হইয়া, কাহার প্রতিফা করিতেছিলেন। উক্ত শকট, তাহার
নিকট আসিবামাত্র—পুলিশ সাহেব, দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল,
“বদমাইয়কে পাওয়া গেছে?”

দারোগা সাহেব হজরতকে দেখাইয়া দিয়া, বিনীত ভাবে কহিল—
“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

সাহেব যারপর নাই নিম্মিত হইয়া, হজরতের প্রতি তীব্র-কটাক ফেলিয়া
দারোগা সাহেবকে কহিল,—“ইহার নাম হজরত পেশোয়ারী?”

দারোগা সাহেব পুনরায় কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

সাহেব হজরতের আপাদ মস্তক তীব্র বিম্মিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন,
স্বন্দর গম্ভীর মূর্তি, দিবা ভঙ্গ বেশ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মত—বিনীত মভা। এ
ব্যক্তি কি ছুটে লোক? আশ্চর্য্য কথা। এ ব্যক্তি যদি ছুটে লোক হয়, তবে ছুটে
লোকের মধ্যে নিপুন, তবে জগতের ছদ্মবেশী—ঘোর শত্রু! বোদ ২য়। এ

ব্যক্তি সম্ভবত সে প্রকৃতির লোক নয়। দারোগা সাহেব ভুলক্রমে, অল্প কাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। হজরতের তৎকালিক কএকটি লক্ষণ দেখিয়া, মুহর্ত্তে সাহেবের চঞ্চল চিত্তে, এই সকল কথা উদয় হইল। তারপর নিজ সংশয় অপনোদন মানসে পুনর্বার দারোগা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি হজরতকে ইহার পূর্বে আর কখন দেখিয়াছিলে ?”

দারোগা সাহেব বলিলেন, “আজ্ঞে হ্যা—অনেকবার দেখিয়াছি।”

দারোগা সাহেবের মুখে এই কথা শুনিয়া, সাহেব কিছু অশ্রমনক হইলেন, হজরতের মুখের প্রতি চাহিয়া, খানিক কি চিন্তাধীন হইলেন। তারপরে বলিলেন “আচ্ছা যাও, ইহাকে আগার অফিস ঘরে বসাঁও।”

দারোগা সাহেব যে আজ্ঞে বলিয়া, হজরতকে, সাহেবের অফিস কক্ষান্তি-মুখে লইয়া গেলেন।

সাহেব বিস্মিতাকরণে, দ্বিযৎ পশ্চাতে ফিরিয়া হজরতের গতি দেখিতে লাগিলেন, গতি বেশ সাধারণ ভঙ্গলোকের মত,—তাহাতে কৃত্রিমতার লেশু মাত্র নাই। তবে বলিষ্ঠ অঙ্গ নিবন্ধন,—গতি কিছু গর্জিত ভাবব্যঞ্জক ; ইহা ব্যক্তি বিশেষের স্বাভাবিক ধরণ।

সাহেব বড় আশ্চর্য হইলেন, এবং কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, ভাবিলেন, আচ্ছা, দেখা যাক—কথা বার্ত্তীয় সব বুঝা যাইবে। সাহেব তখন আর তথায় অপেক্ষা না করিয়া, আপন অফিসে আসিলেন—দেখিলেন, হজরত চিন্তাময়। সাহেব তাহার অজ্ঞাতমারে নিজ আসনে আসীন হইয়া, হজরত উদ্দেশে কহিলেন, “কি ভাবিতেছ ?”

হজরত চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, সাহেব তাহার সম্মুখে—তাহার প্রতি তাঁহার ভীক্ কটাক্ষ স্থাপন করিয়া, নিজ আসনে অবস্থান করিতেছেন। হজরত সাহেবকে উপযুক্ত অভিবাদন করিয়া বিনীত ভাবে কহিল, “আজ্ঞে।”

সাহেব পুনরায় বলিলেন, “তুমি কি ভাবিতেছ ?”

হজরত নম্রভাবে উত্তর দিল, “আজ্ঞে কিছু নয়।”

সাহেব পূর্ববৎ বলিলেন, “অবশ্য কিছু ভাবিতেছ।”

হজরত সাহেবের কথা কহিবার ভঙ্গিতে ও তাহার কঠিনরে বুঝিল, “সাহেবের মেজাজ কঠিন নয়—কোমল। কাকা তাঁহার সম্মুখে যাহা বলিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। সুতরাং হজরত সাহস পাইয়া বলিল, “হজুর মনের অগ্নিতে আমি, নানান চিন্তায় জড়ীভূত, কোনটার কথা আপনাকে বলিব।”

সাহেব যেন, তাঁহার কথায় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি ‘ইয়ং ম্যান !’ তোমার আবার মনের অস্থখ কি ?”

হজরত সাহেবের এই কথায়, একটি স্বাধীনভাবে কথা কহিবার অবসর পাইল, একটু দুঃখিতভাব দেখাইয়া কহিল, “মহাশয় আমি পেটের দায়ে কুস্তিগিরি করিয়া থাই। কারও ভাল মনতে থাকি না, তবু আমার উপর সরকারের জুলুম, কোথায় প্রবাসের পর বাড়িতে আসিয়া একটু বিশ্রাম করিব। তা নয় বাড়িতে পদার্পণ করিতে না করিতে সরকারের জুলুমে প্রাণ ওষ্ঠাগত ! এটা কি মানসীক অস্থখের বিষয় নয়—হজুর ?”

সাহেব হজরতের এই কথা শুনিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। হজরত সাহেবের এই উচ্চ হাস্যে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি কুণ্ঠিত কটাক্ষে চাহিল।

সাহেব কহিল, “বাপু! সরকারের জুলুমে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত,—কিন্তু এখন যে বহির্গত হয় নাই ?—ইহা পরম দৌভাগ্য মানিয়া, তোমার স্থিতি ইতি উচিত।”

এই কয়েকটি কথা কহিয়া, সাহেব হজরতের প্রতি সহাস্ত তীব্র কটাক্ষে চাহিল। সাহেবের এই তীব্র কটাক্ষে, হজরতের হৃদয়ের অন্তঃস্থ অর্থাভাব কাঁপিয়া উঠিল, হজরত সমকুচিত চিত্তে বদন অবনত করিল।

সাহেব হজরতের এই ভাব দেখিয়া অকুণ্ঠিত করিল—বলিল, “মিথাইয়া পড়িলে যে ?”

হজরত এই কথার কোন উত্তর না দিয়া, সাহেবকে নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে হজুরের নিকট কি প্রয়োজন বশত তলব করা হইয়াছে ?”

“তোমাকে”—সাহেবের মুখ হইতে এই কথাটি বিনির্গত হইয়াছে। এমন সময়ে একটি পরিশ্রান্ত বলিষ্ঠ ভদ্র লোক, স্মিত ললাটের স্নেদবারি, একখানি ক্ষমাল সাহায্যে মুছিতে মুছিতে, সেই কক্ষ প্রবেশ করিলেন,—সাহেবের সম্মুখীন হইলেন।

সাহেব তাঁহাকে দেখিবাগাজ—“হ্যালো” সম্বোধনে ভদ্রলোকটিকে আপন হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ের আনন্দভাব জানাইয়া কহিলেন, “আপনি ক্লান্তিগ্রস্ত—?”

ভদ্রলোকটি ক্ষমৎহাস্ত সহকারে কহিলেন, “এই স্বকমত দেখাইতেছে।”

সাহেব হাসিতে হাসিতে, পুন কহিলেন, “তা বেশ। আমি এখন টানার পড়েনের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলাম।”

ভক্তলোকটি এই কথার কোন অবাব না দিয়া, একখানি আমন অধিকার করিতে করিতে কহিল, “বদমাইসের খবর কি ?”

সাহেব বিনা কথার চক্ষুর ঈশিতে হৃদয়তকে দেখাইয়া দিয়া, ভক্তলোকটিকে কহিল, “খবর—বদমাইস সম্মুখে হাজির ।”

ভক্তলোকটি ধীরভাবে, হৃদয়তের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, দেখিয়া তাহার মনে হইল, যেন হঠাৎ কোথায় দেখিয়া থাকিল,—ঠিক অরণ হইতেছে না—কোথায় ।

যাই হ’ক ; তৎপরে ভক্তলোকটি সাহেবকে ঈশিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু সুবিধা করিতে পারিয়াছেন ?”

সাহেব তদুপ ঈশিতে তাহাকে জ্ঞানাইলেন, “কিছু না,—এই কথানার্ত্তার সূত্রপাত হইতেছে ।”

ভক্তলোকটি সাহেবের এই ঈশিতে বুঝিতে পারিলেন, বদমাইসকে বেশীক্ষণ জ্ঞান হইয়া নাই ।

এই স্থানে প্রিয় পাঠক মহাশয়কে জানান আবশ্যক ;—এই ভক্তলোকটি কে ? এবং কিজন, ইনি এখানে পদার্পণ করিয়াছেন । গত কাল্য সেই পাশও মণিলাল জহুরীর একখানি শুশ্রূষা, বহু যত্নের ফলে ধরা পড়িয়াছে । সেই লিপিধানিতে পুলিশের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে । কিছু তাহাতে মণিলালের যে ঠিকানা লিখিত আছে, তাহা সাধারণের নিকট সম্পূর্ণ শুদ্ধ এবং অসম্মানের অতীত, এমন কি ঘড়বাজ পুলিশের এবং প্রসিদ্ধ শুশ্রূষার প্রক্ষেপ ধারণার অতীত । এই হেতু কলিকাতার সুযোগ্য মহরাজকোতোয়াল মহাশয়ের পরামর্শ, ঐ নারাজ শুশ্রূষার ভক্তলোকটি, হৃদয়ত পেশোয়ারীর মারফত, মণিলাল জহুরীর নিকট ৩৩ ঠিকানাটি বাহির করিবার নিমিত্ত, উক্ত পুলিশ জমিদারের নিকট আগিয়াছেন । ইহার আগমন নার্ত্তা উক্ত পুলিশ জমিদার পূর্বাঙ্কে পাইয়াছিলেন । এবং ইহারই নিমিত্ত পুলিশ সাহেব দ্বার, অপেক্ষা করিতেছিলেন । ইনি একজন সাহেবের বিশেষ বন্ধু মধ্য পরিগণিত ।

যাই হ’ক ; শুশ্রূষার ভক্তলোকটি, দুই একটি বৈদেশীক ভাষায়, হৃদয়তের প্রকৃতি মধুর সাহেবকে—তিনি যাহা অবগত আছেন, তাহাই প্রকাশ্য করিলেন, এবং তিনি যেজন আগিয়াছেন, সেই কার্য-মিষ্ট উপযোগী পরামর্শ চাহিলেন ।

সাহেব হৃদয়তের সহিত কলিক জালাপে ও তাহার কতিপয় ভাবভূমি

মর্শমে, তিনি তাহাব সম্বন্ধে, যাহা ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই ব্যক্ত করিলেন এবং কি কৌশল অবলম্বন করিলে, কার্য্য সম্বন্ধে হাসিল হইবার সম্ভাবনা ; সাহেব নিজ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সরলভাবে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ।

ভজলোকটি ধীরভাবে সাহেবের কথিত কথাগুলি ও তাহার সরল মন্তব্য কিছুক্ষণ স্থিরভাবে আপন মনে অনুশীলন করিলেন । তারপর তিনি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, আপন পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সাহেবের হস্তে দিলেন ।

পত্রখানি দেশওয়ালা ভাষায় লিখিত । সাহেব দেশওয়ালী ভাষা জানিতেন তিনি পত্রখানি, আপন মনে চাইবার কিম্বা ততোধিক পাঠ করিলেন, এবং তাহার ফলে তিনি যাহা বুঝিতে পারিলেন ; তাহা এস্থলে উল্লেখ অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করা গেল । কেবল প্রিয় পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্ত, পূজ্যোক্ত বিনয় এস্থলে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইল ।

পত্রখানি মণিলাল জহুরী লিখিত । এই চিঠিখানিই গত কলা মীরা পড়িয়াছে । মণিলাল জহুরী ‘জুমেদ’ নামক তাহার কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে * * * অত্যাঁত্ৰ বিবরণ জানাইয়া লিখিতেছে । তাহা এই—

॥ প্রিয় জুমেদবর ।—“জুমেদ”,

কার্য্যগতিকে পরস্পর, পরস্পর স্বীয়ত্ব বিচ্ছিন্ন । এখন যেসকল সময়, তাহাতে পৃথকভাবে পরস্পরের এইরূপ অবস্থান অসম্ভব নহে । আমি আশা করি, যে যে বিষয়, তোমাকে লিখিলাম, সেই সেই বিষয় সুসমাধা করিয়া মজর “লালকুঠি”—বিশেষতঃ, নামক ঠিকানায় আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবে ।

আর তোমাকে * * এত তারিখে, যে একখানি পত্র লিখিয়া ছিলাম । তাহার উত্তর, আমি পাই নাই । তাহার উত্তর এই পত্র পাঠ মাত্র লিখিবে ইতি ।

মণিলাল জহুরী ।

সাহেব উক্ত পত্র পাঠ করিয়া, শুণ্ডচর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি জুমেদের সকলই জানিয়াছিলেন কি ?”

শুণ্ডচর মহাশয় কহিলেন, “জানিয়াছিলাম বই কি !” বলিয়া তারিখ

কহিলেন, “যে ঠিকানায় স্নেহকে এই চিঠিখানি লেখা হইয়াছিল, সে ঠিকানা—কোন লোক নাই, পরন্তু তাহা ভালো বন্ধ। তাহার আশে পাশে সন্ধান করিলাম, কিন্তু স্নেহের সন্ধান কোথায় পাইলাম না।”

সাহেব লগাট কুঞ্চিত করিয়া, তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ডাক পিয়নের নিকট, এ বিষয় সন্ধান করিয়াছিলেন ?”

শুশ্রূষ মহাশয় কহিলেন, “হ্যাঁ—এ বিষয় সন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু ডাক পিয়ন বলে, বাবু! এ বাড়ি বহুদিন হইতে পতিত। কোই—এ বাড়ীর ঠিকানায় ত কোন দিন, চিঠি পত্র আনিতে দেখি নাই।”

সাহেব ঘাড় নাড়িয়া, দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন, “সেই ডাক পিয়নই সব জানে। একটু সতর্কতাব সহিত তাহার গতি বিধির উপর দৃষ্টি রাখিলে, নিশ্চয়ই সফল ফলিবে। আপনি সেই চেষ্টায় একবার ফিরুন।

ভ্রমলোকটি হাসিয়া কহিলেন,—“আমি যে সব বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি।” এই কথা বলিয়া তিনি সাহেবকে চক্ষুর চকিত দৈর্জিতে হজরতের প্রতি চাহিতে কহিলেন।

সাহেব তাহার দৈর্জিত মত দেখিলেন, হজরত অবনত মস্তকে তাঁহাদিগের কথা সউৎসুক চিত্তে শুনিতোছে।

শুশ্রূষ ভ্রমলোকটি, উক্ত ভ্রমলোক কথ্য কহিবার কালে, হজরতের প্রতি বরাবর দৃষ্টি রাখিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাহাকে তাঁহাদিগের কথায় ভ্রমলোক দেখিয়া, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অনায়াসে সফল হইতে পারে;—এই বিবেচনায় শুশ্রূষ মহাশয়, বাক্যস্রোত পরিবর্তন করিয়া, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হজরতকে এখানে কতক্ষণ হইল, হাজির করা হইয়াছে ?”

সাহেব কহিলেন, বেশীক্ষণ নয়। আপনি এখানে আগমন করিবার ক্রিয়াক্ষণ পূর্ণ।

“ওঃ!”—শুশ্রূষ মহাশয় ইহা কহিলেন, আরও কিছু কহিতেন। কিন্তু হজরতের কথায় তাঁহার কথা সম্যক ক্ষুরণ হইল না।

চঞ্চল হজরত, এইরূপ একান্তে সাক্ষি গোপালের মত নিশ্চেষ্টে বসিয়া থাকিতে, একান্ত নারাজ হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর ইহাদিগকে কথান্তরে বাইতে দেখিয়া, সে পুনরায় অস্থির ভাববিজড়িত কথায়, সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে হজুরের নিকট কি প্রয়োজন বশতঃ তলব করা হইয়াছে, —কী প্রয়োজন করিয়া বসুন ?”

সাহেব হজরতের এইরূপ উচ্ছ্বাসতায়, দীপ্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “যাশু! তুমি বড় আশ্চর্য্য করো!—তুমি যেন কিছু জাননা,—তোমার এখানে কি জ্ঞান আছে!—অত ব্যস্ত কেন? একটু চুপ করনা, এখনি হাতে হেতেড়ে সব জানিতে পারিবে।”

হজরত পেশোয়ারী, সাহেবের এই তিরস্কার বাক্যে, একটু সঙ্কুচিত হইল। দ্বিতীয় কথা কহিতে, তাহার আর সাহস হইল না, সে অনরাধীর মত অবনত মস্তকে নীরর রহিল।

সাহেবের এই তিরস্কার রূপ অমোঘ অস্ত্রধানি, উপযুক্ত সময়ে নিষ্কিণ্ড হইয়াছে দেখিয়া, গুপ্তচর মহাশয় সাহেবকে কহিলেন, “এই চিঠিখানি হজরতকে দেখান দেখি, সে কি—বলে।”

সাহেব তাহাই করিলেন—চিঠিখানি হজরতকে দেখাইলেন।

হজরত চিঠিখানি দেখিল,—অনেকদিনের পর দেখিল, তাহার সেই দারুণ অপমানকারী পায়ণ্ড মনিব—মণিলাল, অহরীর হস্ত লিখিত গুপ্তপত্র। প্রতিহিংসা বুত্তির কি সহজ আশ্চর্য্য বৈজ্ঞাতিক সংক্রামক শক্তি! সঙ্কুচিত, ভীত হজরত, অপমানকারী শত্রুর হস্তাক্ষর দর্শন জনিত যুহুর্ভের উদ্দীপনায় প্রতিহিংসানলে জলিয়া উঠিল, সে সেই বুদ্ধের মতর্ক উপদেশ ভুলিয়া গেল। হজরত প্রাথমিক আশ্চর্য্য পাঠ করিয়া, তাহার মর্কনাশ সাধনে কৃতসম্মগ্ন হইয়া বলিল, “হজুর! আমি জানি, এ পত্র কাহার।”

সাহেব বিকৃত কথায় উপহাস করিয়া বলিল, “আমরাও জানি, এ পত্র কাহার।”

হজরত সাহেবের উক্ত ভঙ্গিমায় বিরক্ত হইয়া কহিল, “তবে এ চিঠিখানি আমাকে দেখাইবার প্রয়োজন?”

সাহেবও হজরতের এবিধ উত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “বদমাইন্! তোমাকে চিঠিখানি দেখাইবার প্রয়োজন! এই চিঠিখানি কোথা হইতে লিখিত হইয়াছে?”

হজরত সাহেবের উক্ত কথার ভঙ্গিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া, উত্তর করিল, “একথা আমাকে পূর্বে খুলিয়া বলিলেই হইত।”

সাহেব হজরতের এইরূপ প্রত্যুত্তরে আরও ক্রুদ্ধভাবে কহিল, “বেয়াকুব! তোমাকে এখন খুলিয়া বলা হইতেছে—বল।”

হজরত তখন বলিল, “এই যে, বেগমী রংয়ের কালিতে লিখিত—

“লালকুঠি”—বিশেষত্ব, নামক ঠিকানা, পক্ষে লিখিত হইয়াছে। ইহা মণিলাল জহরীর উপস্থিত, গুপ্ত ঠিকানার গুপ্ত সংকেত। মণিলাল জহরীর “লালকুঠি” অনেকগুলি আছে। পত্রোক্ত ‘লালকুঠি,’ ভিন্ন ভিন্ন রংয়ে লিখিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দেশক হয়। সাধারণতঃ এই ‘লালকুঠি’—বিশেষত্ব, নামক ঠিকানা, তিন রকম রংয়ে লিখিত হয়,—লাল, বেগুনী, সজী। এই বেগুনী রংয়ে লিখিত ‘লালকুঠি’ সোদপুর স্থান নির্দেশক। কলিকাতার উত্তর পূর্বে কোণে—কএক জোশ তফাতে, যে সোদপুর অবস্থিত, ইহা সেই সোদপুর। আর ‘লালকুঠির’ শেষে—ডোমের অগ্রভাগে, যে বিশেষত্ব কথা লিখিত আছে; উহা একটি লোকের নাম; উহাকে আমি চিনি। উহার পুরা নাম—বিশেষত্ব কাহার। বিশেষত্ব কাহার * * * অমুক পোষ্ট অফিস লিখিলে; চিঠিখানি বিনা বাধায় বিশেষত্ব কাহারের মারফত, মণিলাল জহরী পাইবে। আর যাহাকে এই চিঠিখানি লেখা হইয়াছে, আমি ইহাকেও চিনি,—”

হজরত যেন কোন ভূতাবিষ্ট হইয়া, এই সকল কথা অকপটে খুলিয়া বলিতেছিল।

সাহেব এবং সেই গুপ্তচর মহাশয়, এই সকল গুপ্ত কথা, হজরত কর্তৃক সরলভাবে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া, যারপরনাই আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা একবারও ভাবেন নাই যে, বদমাইস্ হজরত তাঁহাদিগের নিকট এই সকল গুপ্ত কথা, এতদূর সরলভাবে খুলিয়া বলিবে।

যাই হ’ক; প্রতিহিংসা বশে হজরত যখন তাহার বৈরী মনিবের মুণ্ডপাতের সহজ উপায়ে ত্যায় হইয়া অনর্গল বলিতেছিল। তখন সাহেব, তাহার কথায় বাধা দিয়া কহিল, “আচ্ছা—বাস! তোমার সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছি। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—তুমি এখন আমাদের সহিত সেই লালকুঠিতে যাইতে পার কি না?”

হজরত তার স্বরে কহিল, “কেন পারিব না!”

এইবার সাহেব মনমত উত্তর পাইয়া, হজরতের প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “ইহা যদি তুমি পার ? তাহা হইলে, এইবার হইতে সরকারি খাতায় তোমার বদমাইস্ নামের পরিবর্তে সুনাম লেখা হইবে—তুমি ইনাগ পাইবে,—আমার সুপারিসে সরকার মহলে, তুমি ভাল চাকুরী পাইবে।”

হজরত সাহেবের এই প্রলোভনকারী কথায় কোন কথা কহিল না,—সে অব্যক্ত মস্তকে নীরবে রহিল।

সাহেব স্তন্যর হৃদয়তের এই মমতা দেখিয়া, তাহার প্রতি আরা আকৃষ্ট হইলেন । গুপ্তচর ভদ্রলোকটি, প্রথমে তাহার সমক্ষে যাহা ভাবিয়াছিলেন,—
এখন তাহার উক্ত তেজস্বিতা দেখিয়া ও সরল কথা বার্তা শুনিয়া তাহার সমক্ষে,
আর তাহা ভাবিতে পারিলেন না । পরন্তু তিনি তাহাকে বিশ্বাস করিলেন,
এবং বৃথা বাক্যব্যয়ে আর সময় অতিবাহিত করা যুক্তিসঙ্গত বোধ না করিয়া
যাহাতে হৃদয়তকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার কার্য শীঘ্র সমাধা হয় তাহার বিষয়
মনোযোগী হইয়া সাহেবকে কহিলেন, “আর বিলম্ব কেন ! টাটকা টাটকা
কার্য্য হাসিল করিতে অগ্রসর হওয়া যাক ?”

সাহেব অমনি কহিলেন, “তার সন্দেহ কি !”

এই কথা বলিয়া, সাহেব একখানি গাড়ি ঘণ্টার হিসাবে ভাড়া করিয়া
আনিতে, একজনকে হুকুম করিলেন ।

হৃদয়ত তাঁহাদিগের কার্য্যে, এত শীঘ্র সাহায্য করিতে নারাজ ছিল । স্নান
আহারাদির পর, একটু বিশ্রাম করিয়া যাইব মনে করিয়াছিল । কিন্তু তাহার
এই মনের কথা মনেই রহিল,—তিরস্কারের ভয়ে প্রকাশ করিয়া বলিতে
পারিল না । যাই হ’ক ; ইহার কিছুক্ষণ পরে, একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি
আসিল । গুপ্তচর ভদ্রলোকটি, আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া হৃদয়তকে
সঙ্গে লইয়া, গাড়িতে গিয়া উঠিলেন । গাড়িও অমনি তাঁহাদিগের গন্তব্য
স্থানাভিমুখে ছুটিল ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

“সেলাম—বাবু !”

প্রায় সওয়া ঘণ্টা ভ্রমণের পর, অবশেষে সেই গাড়িখানি, সোদপুরের
একটি সঙ্কীর্ণ গলির সম্মুখবর্তী হইল । হৃদয়ত অমনি শকটচালককে সেই
সঙ্কীর্ণ গলির প্রান্তমুখে, গাড়িখানিকে ভিড়াইতে কহিল । শকটচালক কথামত
গাড়িখানিকে সেই গলির প্রান্তমুখে ভিড়াইল । গুপ্তচর ভদ্রলোকটি অমনি
হৃদয়তকে জিজ্ঞাসা করিলেন “এই গলির মধ্যে নাকি ?”

হৃদয়ত কহিল, “জায়ে হ্যাঁ,—আমুন ।”

শুশ্রূষা মহাশয় ইহা অবগত হইয়া বাহিলেন, “এখন থাক, আগে এমন-
কার পুলিশ ফাঁড়িতে একবার যাইতে হইবে।”

হজরত অমনি কহিল “যে আজ্ঞে।”

তারপর হজরত, শকটচালকে তথাকার পুলিশ ফাঁড়িতে গাড়ি লইয়া
বাইতে উপদেশ দিল।

শকটচালক উপদেশ মত গাড়িখানিকে অবিদ্যে তথাকার পুলিশ ফাঁড়িতে
লইয়া গেল।

শুশ্রূষা মহাশয় তথায় আত্ম পরিচয় দিয়া, দুইজন কনেষ্টবল ও একজন
হেডকনেষ্টবলকে সঙ্গে লইয়া, আবার সেই সুসজ্জিত গলির প্রান্তস্থিত আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। শুশ্রূষা মহাশয়, তাঁহার সমস্তিবাহারী পুলিশবলদিগকে
ছদ্মবেশী হইয়া, তাঁহার সমস্তি অন্বেষণ করিতে উপদেশ দিলেন। ও, আপনি
হজরতের সহিত লালকুঠি অভিমুখে অগ্রগমন করিলেন। এইরূপে সেই
সুসজ্জিত গলির—স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বস্থিত দরিদ্র গৃহস্থদিগের সবুজ-গাছটির
অতিক্রম করিতে করিতে, উভয়ে কতকদূর গিয়াছেন। এমন সময় একটি
লোক, হজরত পেনোয়ালীকে বিনীত সম্মান প্রদর্শন করিয়া কহিল, “সেলাম
বাবু সাহেব।”

হজরত তাঁহাকে নীরবে অতি সম্মান দিয়া, বিম্বিত নেত্রে তাহার অতি
চাহিল।

ইহা দেখিয়া সেই লোকটি হাসিয়া কহিল, “বাবু সাহেব! আমাকে
চিনিতে পারিতেছেন না?—তা পারবেন না, অনেকদিনের পর, আগনার
সহিত দেখা হইল। আর ইদানিং অশ্রুধে অশ্রুধে ভুগে বড় কাহিল হইয়া
গিয়াছি,—তাই।”

হজরত তাহার ঈদৃশ কথাবার্তা শুনিয়া আরও বিষয় প্রকাশ করিয়া
কহিল, “তোমার সহিত কোথায় দেখা সাক্ষাৎ বল দেখি?”

সেই লোকটি পূর্ববৎ হাসিয়া কহিল, “দেখা সাক্ষাৎ আর কোথায়,—এই-
খানে,—আমি আপনাদের সেই পুরান ডাকহরকণ্ড।”

হজরত তাঁহাকে এইবার চিনিতে পারিল, “ওহো!—এইবার তোমার
চিনিতে পারিয়াছি,—তুমি এখন ভাল আছ ত?”

সেই লোকটি এইবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ,—
আপনার আশীর্বাদে এক রকম দুঃখে দুঃখে বাঁচিয়া আছি,—এইমাত্র।”

হজরত কহিল, “বেশ-বেশ, আজকাল হুঃখে সুখে বাঁচিয়া থাকাই মঙ্গল ।” তারপর—এমন, এখানকার খবর কি বল ?

“আজ্ঞে খবর সব ভাল । আজ আপনাদের একখানা চিঠি আসিয়াছে । সেই সকল হইতে যুরিতেছি,—”

সেই লোকটির কথা শেষ হইতে না হইতে, হজরত বিষয় সহকারে কহিল, “সে কি ! সেখানে কেউ নাই কি ?”

সেই লোকটি তাহার কথিত কথা ছাড়িয়া দিয়া, হজরতের কথার উত্তর দিয়া বলিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ,—বাড়িতে তাল দিয়া আজ সব কোথায় গিয়াছে ।”

এই কথা শুনিয়া হজরত, শুশুচর মহাশয়ের মুখের প্রাতি বিষয় বিজড়িত হতাস নেন্দে চাহিল । শুশুচর মহাশয়ও সেই ব্যক্তির মুখে ঐ কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তে হতাস সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন—অশ্রুমনস্বে ভাবিলেন, এক চেষ্টা সকলই পণ্ড হইল ।

ইহাদিগের এই ভাব-দেখিয়া, ঐ লোকটি ভাবিল,—ইহারা বুঝি কোন বিশেষ দরকারে আসিয়া থাকিবে, এখন বাটিতে লোক নাই শুনিয়া ভাবিতেছে । এই হেতু সে ইহাদিগকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত কহিল, “আপনারা ভাবিবেন না, বিশেষর জমাদার, আর একটু পরেই আসিবে, সে মধ্যে মধ্যে বাড়িতে আরকম তাল বন্ধ করিয়া কোথায় যায় ।”

ইহার পর, সেই লোকটি, উক্ত চিঠিখানি হজরতের হস্তে দিয়া কহিল, “আমি ওবেলা অবসর মত আপনাদের নিকট যাইব ; আজ বকসিম পাইবার কথা আছে ।”

বিনা যাচিঞায় উক্ত চিঠিখানি হস্তগত হইল দেখিয়া, হজরত যার পর নাই আনন্দিত হইয়া, তাহাকে মিষ্ট বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিল ।

সে লোকটি উত্তরকে সেলাম দিয়া প্রস্থান করিল ।

এই অভাবনীয় স্বরে বেকার্যা ঘটয়া গেল, তাহা সচরাচর ঘুর্ণট । যাই হউক ; শুশুচর মহাশয়, হজরতের হস্ত হইতে উক্ত চিঠিখানি লইয়া, বিশেষ আত্ম সহকারে,—সেই সন্ধ্যা গলির কোম একটি নিভৃত প্রদেশস্থিত একটি বৃক্ষের ছায়াতল আশ্রয় করিয়া, চিঠিখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ করিল,—চিঠিখানির আশ্রয়স্থ সকলই রহস্যময় । প্রিয় পাঠক মহাশয় ! আপনার অব-
গতির জন্য—আপনার কোতূহল-নিবারণ জন্য, উক্ত রহস্যময় চিঠিখানির নমুনা এইস্থলে প্রদত্ত হইল।—

প্রিয় বন্ধু বরেন্দ্র।

আপনার * * * উক্ত তারিখের একখানি চিঠি পাইয়া, সকল সমাচার অবগত হইলাম। এবং আপনার শারীরিক, মানসিক অসুখের বিষয় জানিতে পারিয়া, বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমি পরমেশ্বরের নিকট কাঁদা মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনি অচিরে এই নিপদের সময় অক্ষয় স্বাস্থ্য লাভ করুন।

আপনার চিঠির প্রত্যুত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল, বলিয়া আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন না। আপনার পত্রোক্ত বিষয় কার্য্য মত সম্ভব সম্পন্ন না করিয়া, আপনাকে পত্র লিখিব না মনে করিয়াছিলাম। এখন আপনার পত্রোক্ত উপদেশ মত কার্য্য করিয়া, যতটা সফলতা লাভ করিয়াছি, তাহা আপনাকে সবিশেষ লিখিলাম।

১। শান্তবাবু ও তাহার সহধর্ম্মিনীর অবস্থা এখন ভাল, আর কোন ভয়

নাই—প্রায় সুস্থ বলিলেই হয়। আমি শান্তবাবুকে দেখিবার ছলে তাহার

নিকট গিয়া, তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া, গোপনে কথা পাড়ি-

লাম। অনেক যত্নে—অনেক শোক বাক্যে, তাহাকে রাজি করিলাম।

কিন্তু সে যাহা চাহে, তাহা আপনার দায়দায় অন্তীত,—১০০০

হাজার টাকা। ইহা পাইলে সে আপনাকে কমা করিবে ও আপনি যো

তাহাদিগের শোচনীয় ছদ্মশাকারী, তাহা পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট

একবারে অস্বীকার করিয়া, অল্প কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে তাহাদিগের

ছদ্মশাকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়া, আপনাকে সাফাই রাখিবে।

ইহাই প্রথম সংবাদ।

ইন্দুবাবুর দ্বারা, এখন সাহায্য পাইবার কোন আশা দেখিলাম না।

তিনি এখন বাড়িতে থাকেন না, সরমের বাড়িতেও যান না, সরমের

সহিত তাহার যোগাড়া হইয়াছে। তিনি যো এখন কোথায়,—উপস্থিত

তাহা ঠিক করিয়া বলা সম্ভব। শুনিলাম। সরম গহনা পত্র, টাকা

কড়ি লইয়া, কাহার সহিত ভাসিয়াছে। আমার অসুমান—ইন্দুবাবুর

ইহা সাফাই করায়িত। ইহা হইল দ্বিতীয় সংবাদ।

চাঁদাবাবু তাহার অধিনায়িত্বিত বাগান বাড়িখানি ছাড়িয়া দিওন। এবং

আপনাকে এই মোকদ্দমা হইতে সাফাই রাখিবার নিমিত্ত, তিনি আদালত

মতে সাফী প্রকৃপ পাড়াইবেন—বলিবেন, “আমাদিগের কল্যাণ”

নিমিত্ত মণিলালরাও অনেক দিবস হইতে আমাদের জমিদারীতে
অবস্থান করিতেছেন।

চাঁদাবাবুর সহিত আমার এই সংক্রান্ত কথাবার্তা, তাঁহার কলিকাতায়
বাটিতে হইয়াছে। তখন তাঁহার সহিত এই সব বিষয় কথাবার্তা হয়, তখন তিনি
বড় ব্যস্ত—সুবলপুর যাইবার উদ্দেশ্যে ছিলেন। সুবলপুরের জমিদার—তাঁহার
ভগ্নিপতি বিপ্রদাস বাবু পীড়াগ্রস্ত। সুতরাং তাঁহার সহিত অসংখ্য বিষয়
সম্বন্ধে কথা কহিবার অবসর পাইলাম না। যাই হোক; তিনি সুবলপুর হইতে
দুই একদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন। কারণ তাঁহার কলিকাতায় অনেক
কার্য আছে। তিনি সুবলপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেই তাঁহার
জমিদারি স্থা বাগান বাটিতে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।
ইহাই দ্বিতীয় সংবাদের মূল বিষয়।

আপনি উতলা হইবেন না, নিশ্চিন্ত থাকিবেন অকারণ চিন্তায় রণবর্তী
হইয়া, দৈর্ঘ্য হারাইবেন না, বিপদের সময় দৈর্ঘ্যই একমাত্র রক্ষাকর্তা। ইহার
অধিক আর কি লিখিব। ইতি—

বিশ্বাসী
স্বমেধ

প্রিয় পাঠক মহাশয়! পত্রোক্ত এই চাঁদাবাবু কে জানেন? উনি সেই
জীওলপুরের জমিদার কুলদেব—চন্দ্রকান্ত বাবু। উনি পিতার জরুরী পত্র
পাইয়া আমোদ আমোদ ছাড়িয়া এবং বদকলিন ও খলিফার মুণ্ডপাত বিষয়ে
আপাততঃ শাস্ত থাকিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। একথা হরিচরণবাবুর
মুখে শুনিয়াছেন, ইহা বোধ হয়—আপনার অরণ আছে। যাই হোক; ইহা-
দিগের সহিত চৌকোম মণিলাল জহরীর আলাপ পরিচয় আছে। এই আলাপ
পরিচয় কিসের জন্ত—ইহা বোধ হয়, প্রিয় পাঠক মহাশয়! আপনাকে বেশী
কথায় বুঝাইতে হইবে না।

গুপ্তচর মহাশয়, বনিয়াদি সতর্ক বদমাইয়ের চাকুরী পূর্ণ, গুপ্ত লিপিগানি
পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইবেন না, আশ্চর্য্য হইবেন কি? বদমাইদিগের এই-
রূপ চাকুরী জালা, তাঁহার নিকট আসি নতুন নহে। তিনি উক্ত চিঠিখানি পাঠ
করিয়া, আপনার আমার পকেটে রাখা করিয়া হজরতের সহিত পুনরায়
লালকুঠি অভিমুখে গমন করিলেন। শানিকরণ পরেই তাঁহার লালকুঠি

উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন, লালকুঠি নামক একখানি জীর্ণ ক্ষুদ্র একতলা অটালিকা। দেখিলে বোধ হয় না যে, তাহা মনুষ্য বাসের উপযুক্ত।

শুশুচর মহাশয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু জমা লতাপল্লব পরিবেষ্টিত জীর্ণ ক্ষুদ্র অটালিকার তালি বন্ধ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, হজরতকে দিখানি করিলেন, “এই কি—সেই সৌখিন পাঁকা বদমাইসের লালকুঠি?”

হজরত কহিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ,—এই সেই লালকুঠি।”

তারপর শুশুচর মহাশয়, তাহাকে দিখানি করিলেন, “এ বাড়ির দরজা কয়টি?”

হজরত কহিল, “দুইটি।”

“দুইটি।—একটিত এই, আর একটি কোথায়?”

“এই দিকে আসুন।” এই কথা বলিয়া হজরত, শুশুচর মহাশয়কে উক্ত দ্বারের খিড়কীর দ্বারদে লইয়া গেল। হজরত খিড়কির দ্বার খোঁজে গিয়া হজরত মানসে দেখিল, খিড়কীর দ্বার অর্গল হীন। উৎসাহে, আনন্দে ত্বরিত পদে, সেই মর্দীর্ণ খিড়কীর দ্বারপথে হজরত প্রবেশ করিল। শুশুচর মহাশয়ও তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। বরাবর খিড়কীর মর্দীর্ণ পথ অতিক্রম করিতে করিতে অটালিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পড়িল,—মেঝানে গিয়া দেখিল, অটালিকার ভিতর বাড়ীটি,—ঠিক চুবড়ির মধ্যে সূবর্ণ কোটা,—বেশ সুদৃশ্য বেশ আরামপ্রদ স্থান, কিন্তু গভীর নীরব নির্জন। ইহারা সেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন। এমন সময় তাহারা কাহার ক্ষীণ অস্তিম আর্তনাদ শুনিয়া চমকিত হইলেন, যার পর নাই বিস্ময় মানিয়া, যেদিক হইতে ঐ ক্ষীণ অস্তিম আর্তনাদ আসিত হইল, সেইদিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া বাহা দেখিল, তাহা অতীব ভয়ানক।—বড়ই মর্মান্বর্ণি শোচনীয় দারুণ দৃশ্যটনা।

হজরত যাহার অস্তিম মিসুক হারাম হইয়াছে—বাহার অস্তিম পুরাতন প্রতিপালকের গলায় ছুরি বসাইতে প্রস্তুত হইয়াছে—সেই তার শোচনীয় অস্তিম দশায় পতিত হইয়াছে। কোমল মুচ মিসুর পাখান স্বপ্ন সমতাম, কোমল রমণীর প্রতিলাগন কর্তারী ভয়ানক অভ্যাচার করিয়াছে,—কে এমন ভাগ্য-হীন যে, এমন সৌন্দর্যের তোকাটিকে অকালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। সাহসী হজরত, এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া, বেশ একবারে তালিয়া পড়িল। তাহার চক্কে অল আঙ্গিল, সে নীরবে—শুশুচর মহাশয়ের অনতিক্রান্ত অগ্রসার

মুহুরী, তাহার চিত্তবিনোদনী সেই মোহিনী ছবি—মবুজগরী মোহাগীর নিকটবর্তী হইল ।

শোচনীয় জীবনের অন্তিমক্ষেত্রে উপনীত হতভাগিনী মোহাগী, পরিচিত হজরতকে অকস্মাৎ নিজ সম্মুখে দেখিয়া যেন আশ্চর্যিত হইল, সে হজরতকে আরও নিকটবর্তী হইতে দ্বিধিত করিল । হজরত দ্বিধিত অনুযায়ী তাহার মনোমোহিনীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল ।

মোহিনী তাহাকে বসিতে দ্বিধিত করিয়া ক্ষীণ স্বরে কহিল, “আমি এতক্ষণ মানুষ না দেখিয়া মরিতে পারিতেছিলাম না—আমার কলুষিত জীবনের পাপ কথা কাহার নিকট প্রকাশ না করিয়া, মরিতে পারিতেছিলাম না ; এতক্ষণ মানুষ না দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছিল । এখন তোমাকে দেখিয়া আমার এই ভয়ানক মৃত্যু যজ্ঞা অপেক্ষা অমূল্য যজ্ঞা সহজে অপসারিত হইল ; এখন আমি নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব ।

চূর্ণপঙ্কজ, মৃত্যু শব্দায় শায়িতা যুবতী মোহিনী ললনা, এই কথাগুলি বলিয়া ক্ষণেক নীরব হইল ;—যেন কণ্ঠ শুষ্ক বশতঃ সে আর কহিতে পারিল না ।

দারুণ বিষময় বিষময়, সেই গুপ্তচর মহাশয়, আসন্ন মরণা স্নানরী মোহাগীর প্রমুখাৎ এই কথাগুলি শুনিয়া, অধিকতর আশ্চর্য্যায়িত হইলেন,—সহসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, “সে কি ! এ বাড়িতে মানুষ নাট ? একা ভূমি এইরূপ অবস্থায়—”

গুপ্তচর মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতে যুবতী ক্ষীণ স্বরে তাহাকে কহিল, “আজ্ঞে হাঁ, এ বাড়িতে মানুষ নাই, একা আমি এইরূপ অবস্থায় পতিত ; যাহারা ছিল, তাহারা এখন মৃত, তাহাদের প্রাণহীন শবদেহ পাপের উজ্জল পরিণাম স্বরূপ, এই নির্জন পাপ ভবনের—ঐ কক্ষভলে কেমন প্রকাশ পাইতেছে,—দেখুন ।”

গুপ্তচর মহাশয় ও হজরত, ঐ মৃত্যুকবলিত প্রায় রমণীর সঙ্কেত অনুযায়ী পশ্চাৎ ফিরিয়া—সভয়ে শিহরিত প্রাণে দেখিল,—দুইটি শবদেহ, একটা কক্ষ-মধ্যে—মুক্ত গবাক্ষ সম্মুখে একত্রে পতিত রহিয়াছে—কি ভয়ানক !—কি লোম হর্ষণকারী ভীষণ কাণ্ড ।

মোহাগী হজরত, ঐ দুইটি শবের একটির প্রতি বিকৃত মুখ ভঙ্গিমায় বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিল,—তাহার অপমানকারী সেই মণিলাল জহরী । হজরত দারুণ উত্তেজ বশতঃ ভ্রম প্রমাদিত হইয়া, গবাক্ষের সন্নিবর্তে গিয়া আবার

দেখিল,—তাহার চির শত্রু সেই মণিলাল জহরীর শবদেহ—কি ভয়ানক ! আরও দেখিল—তাহার পার্শ্বস্থ অপর শবদেহটী আর কাহারও নয়, তাহার পুরাতন ছুতা বিশেষরূপে । এই দৃশ্য দেখিয়া হৃৎকাতের প্রাণ গলিল ; সে কম্পিত কণ্ঠে ঐশ্বর মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, “মহাশয় !—মণিলাল জহরী !”

ঐশ্বর মহাশয়, তাহার পার্শ্বস্থই ছিলেন, তিনি হৃৎকাতের সঙ্কেত মত দেখিলেন,—মৃত মণিলাল জহরী ! কিন্তু তাহার সঙ্গে আত্মাতের কোন চিন্তাই দেখিলেন না । কৌতূহলোদ্ভূত দারুণ বিষয় সহকারে তিনি সেই কক্ষের শৃঙ্খলাবদ্ধ দ্বারে প্রতি গমন করিয়া, দ্বারের শৃঙ্খল মোচন করিয়া, কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে উক্ত শবদেহ ঘরের প্রতি আশ্চর্য্যাবিত হইয়া দেখিলেন,—কোন ছবু উক্ত ব্যক্তি ঘরের গলদেশে বসে কিম্বা কঠিন বস্তু বেঁটেনে খাস রোধ করিয়া তাহাদিগের আপবধ করিয়াছে ।

ঐশ্বর মহাশয় ঘটনার অভাবনীয় ভীষণতা অনুভব করিয়া শিহরিদেন । এই ভীষণ ঘটনা বিগত রজনীতে সংঘটিত হইয়া থাকিলে, অসম্ভব করিয়া এবং সেই আমল মরণ রমণীটি এই ভীষণ ঘটনার বিবরণ নিশ্চয়ই অবগত থাকে,—ইহা বিবেচনা করিয়া, সেই মৃতপ্রায় যুবতীটির নিকট পুনরায় আসিয়া তাহাকে সিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সব ব্যাপার কাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে ?”

যুবতী শীঘ্র সরে কহিল, “অগতের একটা পাপ কণ্টকের দ্বারা ঐ মারামর পাপ কণ্টক উৎপাটিত হইয়াছে ।”

ঐশ্বর মহাশয় তাহার রূপক কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কহিল, “আমি আপনার কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না ; আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন ?”

যুবতী স্পষ্ট করিয়া বলিল, “পাপ মহতর মণিলালের চিরশত্রু—আকুল জনকৃতক, ছদ্মবেশী পুলিশ প্রহরীর সহিত আমিরা,—উঃ—পাপের বোকা নরকে নাস্তাইয়া দিয়াছে ; আর এই পাপ ভবনের সমস্ত তৈজসপত্র, কোণদেশ অপহরণ করিয়া শেষে আমাদের নিষ্ঠুর পায়ত্তরা বিষম লজ্জাঘাতে আমার পক্ষর ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে ।”

“নিষ্ঠুর পায়ত্তরা বিষম লজ্জাঘাতে আমার পক্ষর ভাঙ্গিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে ।”—এই কথা শুনিয়া, হৃৎকাত, একবার দশদশ নিশ্চেষ্ট করিয়া কহিল, “ছবু উরা কি ময়তান !”

এই ঘটনা— নারক আকুল ; এই কথা শুনিয়া শুশ্রূষ মহাশয়, সবিস্ময়ে কহিল, “আকুল তোমাদের এই সব দুর্দশা করিয়াছে ?”

রমণী কহিল, “হাঁ ।”

শুশ্রূষ মহাশয়, এই আকুলকে জানিত । সে একজন ভয়ানক ঐকান্তিক দুর্দশা বদমাইস লোক । তিনি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আকুলকে চেন ?”

হজরত কহিল, “চিনি ।”

শুশ্রূষ মহাশয়, তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি বলিতে পারি ? আকুল কি করিলে, মণিলাল জহরীর শত্রু হইয়াছিল ?”

হজরত কহিল, “পারি—সে অনেক কথা । তবে উপস্থিত ইহা বলিলেই আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আকুল এক সময়ে মণিলাল জহরীর জন্ত কোন দুর্কার্য সাধন করিয়া, সে তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পায় নাই, ইহার কারণ আকুল মণিলালের চির শত্রু !”

হজরতকে ইহার অধিক, আর কহিতে হইল না । শুশ্রূষ মহাশয়, সহজেই তাহার কথা বুঝিতে পারিল—তাহাদের ভিতরের ব্যাপার কি ।

অতপর তাহারা জন্ত বিষয়ে তদারিক করিতে পারিলেন না, তাহাদের তদারিক ব্যাঘাত জন্মাইল, কারণ এই সময়ে মোহাগী মৃত্যু বন্ধনায় অধিকতর কাতর হইয়া কহিল, একটু জল—বড় পিপাসা—

হজরত, তাহার পিপাসা নিবারণের জন্ত, গেই বাটীর প্রত্যেক শূন্য কণ্ঠে জল অনুসন্ধান করিতে লাগিল ; কিন্তু মোহাগীর দুর্দশা বশতঃ হজরত কোন কণ্ঠে এক বিন্দু জল পাইল না । বাহিরে কোথাও যদি জল পাওয়া যায়, এই আশায়, হজরত যেমন বাহিরে যাইবার জন্ত প্রস্তুত, ঠিক তেমন সময়ে শুশ্রূষ মহাশয় তাহাকে ডাকিল—বলিল, “তোমাকে ইনি ডাকিতেছেন ।”

হজরত, উপস্থিত জল আনা বন্ধ রাখিয়া মোহাগীর নিকটে গিয়া আসিল ।

মোহাগী তাহার হস্তে জলপাত্র দেখিয়া হজরতকে কহিল, “জল আনিয়াছ ?” নাও—একটু নাও—“বড় পিপাসা ।”

হজরত তাহার এই কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল—বলিল, “জল এখানে পাইলাম না, আমি শীঘ্র জল আনিতেছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন ।”

মোহাগী তাহার এই কথা শুনিয়া, “এখানে জল পাও নাই ?—বাহিরে

আনিতে গাইবে ? তবে থাক, আমি বুঝিয়াছি,—অস্তিমকালে আমার অদৃষ্টে জল নাই,—আমি মহা পাতকী ।”

এই কথাগুলি মর্মান্তিক ছঃধের সহিত বলিয়া, গোহাগী একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হতাশভাবে নীরব হইল । কিছুক্ষণ এইরূপ ভাবে নীরব থাকিয়া হজরতকে তারপর বলিল, “দেখ হজরত । আমি তোমাকে বিশ্বাস করি ; আমার এই অস্তিম মিনতি—যাহার আমি অকারণ সর্বনাশ করিয়াছি, তাহার স্বামীকে—তোমার পরিচিত সেই হতভাগ্য শান্তবাবুকে বলিও, যে পাপীয়সীর বিশ্বাসঘাতকতায়, তোমরা ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়াছ । সেই পাপীয়সী তাহার পাপের উপযুক্ত প্রতিকূল পাইয়াছে,—আরও বলিও—মর্মের কুঠারে তাহার শত্রুকুল নির্মূল হইয়াছে ।”

আত্মতাপকারিণী গোহাগী, এই সকল কথা কহিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল । ভীষণ মৃত্যুর পূর্ণ লক্ষণ হতভাগিনীর বিবর্ণকৃত মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল—সে একটা উৎকট যন্ত্রণানুচক শব্দ, সেইস্থান ধ্বনিত করিয়া ভীষণ কালের গর্ভে পতিত হইল ।

নিরাশায় নিমগ্ন প্রেমিক হৃদয়—যুবক হজরত, আত্মতাপকারিণী গোহাগীর এই হৃদয় বিদারক শোচনীয় অকাল মৃত্যুতে প্রাণে আঘাত পাইল, তাহার তপ্তকাঞ্চননিভ সুন্দর বদনমণ্ডলখানি অব্যক্ত শোকে রক্তিমবরণ ধারণ করিল—তাহার বিক্ষাণিত নেত্রদ্বয় হইতে কএক ফোঁটা অশ্রুবারি বিগলিত হইল ।

গোহাগী যদি আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সে হজরতের এই হৃদয়ভাব অবগত হইয়া, তাহার সেই শোচনীয় আসন্নকালে নিশ্চয়ই বিষম হইত, সে বুঝিতে পারিত,—ইহজগতে এখনও তাহার জন্ত একজন কানিবার লোক আছে । কিন্তু পাতকিনীর শেষ ভাগ্যে, এই সুখ আশ্বাদটুকু নাই বলিয়া যেন সে, ইহা জানিবার অণুে মরিল ।

শুণ্ঠের মহাশয় মাশূর্চ্যে হজরতের সেই বিহ্বলতা দেখিলেন—বিস্ময়াভিত্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ—কি হজরত ! ইহার মরণে তোমার চক্ষে পড়িল ?”

হজরত এ কথার কি উত্তর দিবে ?—সে প্রকৃত হৃদয় কথা গোপন করিয়া কল্পিত কণ্ঠে কহিল, “মহাশয় । আমি যখন মণিলালের নিকট কুর্শ করিতাম তখন ইনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন ।

হজরত ইহার অধিক আর কহিতে পারিল না, সে রাজকণ্ঠে নীরবে অঙ্গ মোচন করিতে লাগিল ।

গুপ্তচর মহাশয়, মনে করিলেন,—হইবে ! তারপর গুপ্তচর মহাশয় যাহার অধেষণে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার পাপ জীবনের যবনিকাত পড়িয়া গিয়াছে ; তবে সেখানে আর কেন ?—তিনি সেখানে পুলিশ প্রহরীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, যথাগন্তব্য তাঁহাদিগের আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া, হজরতকে সঙ্গে লইয়া, গুপ্তচর মহাশয় কলিকাতায় ফিরিলেন । তথায় আপন কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি উক্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন এবং হজরত সরকারী লোকের মত অকপট হৃদয়ে, বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাঁহার সহায়তা করিয়াছে—ইত্যাদি সুখ্যাতি করিয়া গুপ্তচর মহাশয়, হজরতের তরফে দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিলেন । এবং তিনি পুনরায় আজ্ঞামত হজরতকে সঙ্গে লইয়া সেই ছদ্মস্ত্র প্রকৃতি খুনী বদমাইস আবছলকে গ্রেপ্তার করিতে গেলেন । হজরতের ঐকান্তিক চেষ্টা চাতুর্য্যে ও গুপ্তচর মহাশয়ের অব্যর্থ কৌশল নিচয়ে, সেই নরঘাতক আবছল, অচিরে রাজধারে আনীত হইল এবং যথাবিহিত্ত বিচারে তাহার ফাঁসি হইল এবং তাহার প্রসিদ্ধ অচরগণ কেহ দ্বীপান্তরে, নির্ক্ষান্ত হইল, কেহ বিশ বৎসর, কেহ চৌদ্দ বৎসরের জল শ্রীঘরে প্রেরিত হইল ।

বলা বাহুল্য,—হজরত পেন্সোয়ারীর এই ঘটনা স্বজ্ঞে ভাল হইয়া গেল, সে সরকার হইতে সুনাম পাইল,—তাহার গুপ্তচর বিভাগে উত্তম কর্ম হইল ।

এইরূপে ভবিষ্যৎ কাল চক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া, হজরত যখন সৌভাগ্যের ঈশদালোকে পদার্পণ করিয়াছে, তখন মহা একদিন একটি লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় হজরত একবারে সৌভাগ্যের পূর্ণ আলোকে আসিয়া পড়িল ।

হজরতের এই আকস্মিক আশ্চর্যজনক ভাগ্য পরিবর্তন ;—প্রিয় পাঠক মহাশয় ! আপনার নিকট বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার ।

যে লোকটির সহিত সাক্ষাতে হজরত সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে পদার্পণ করিল । সে লোকটি ফায়জাবাদের একটি প্রসিদ্ধ সম্রাট জায়গীরদারের পুত্র, —নাম আমীর হোসেন ।

আমীর হোসেন যে সময়ে যৌবনের পূর্ণ ভেজে একান্ত দর্শিত । সেই সময়ে তাঁহার একমাত্র শ্রমতমা কনিষ্ঠ ভগ্নীকে তাঁহার পিতার অনতিমতে গোপনে

তাহার ভগ্নির প্রেম-বিমুক্ত বিক্রমশালী প্রিয়তম বন্ধু—জুলতান পেমোগারীর করে,—সমর্পণ করেন। ইহার ফলে—এই হইল ; আমীর হোসেন পিতার বিম-নয়নে পতিত হইল ও তাহার প্রিয়তম ভগ্নিপতি জুলতান পেমোগারী মারফৎ বিপদে বিপর্য হইয়া, গোপনে নিজের প্রেমময়ী জন্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে লইয়া দূরদেশে পলায়ন করিল। সেই দূরদেশে জুলতান পেমোগারীর প্রাণের সাক্ষী যুগিতা, একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিয়া, ইহুদ্যম পরিভ্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। জুলতান পেমোগারী সেই অপগত শিশুটিকে লইয়া বড়ই বিভ্রত হইয়া, অবশেষ তাহাকে লইয়া সেই বিখ্যাত জুয়াড়ি বিমল প্রসাদের আশ্রিত হইল।

প্রিয় পাঠক মহাশয়! আপনি এ বিষয় অবগত আছেন ? তারপর পিতৃ-স্নেহহীন, আমীর হোসেন, অবসর গত মধ্যো মধ্যো বিমল প্রসাদের বৈঠক-খানায়, পরম বন্ধুর নিকট আগমন করিয়া, যাজি টকালে নৃত্যশীল প্রকৃষিত প্রিয়ভগ্নির সুখ স্মৃতি অজ্ঞান শিশুকে দেখিতে যাইত। এখন সেই আমীর হোসেন তাহার পিতার অবর্তমানে তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তিনি ইতিপূর্বে নিষ্কদিষ্ট—কলিকাতা হইতে বিতাড়িত হজরতের চরিত্রের কথা শুনিয়া বাধিত প্রাণে, তাহার অনেক অসুস্থকান করিতেছিলেন। এখন তাহাকে অকস্মৎ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার মাতুল আমীর হোসেন বিলক্ষণ আনন্দিত হইয়াছিলেন। এবং তিনি তাহাকে রাজকীয় কর্ম হইতে বিমুক্ত করিয়া কারজাবাদে লইয়া গেলেন। তাহার পর হজরত পেমোগারী মাতুলের অপুত্রক হেতু, তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, নিষ্ট শাস্ত্রভাবে কাল-যাপন করিয়াছিল। এবং তাহার সেই পিতৃবন্ধু বৃদ্ধ কাকা ও তাহার অসুস্থত পূর্ব সহচরগণ হজরতের অসুখে, তাহার মৎ পরামর্শে ইংরাজের নিরীহ প্রজাগণের মত শাস্ত্রভাবে জীবন যাপন করিয়াছিল।

তারপর প্রিয় পাঠক মহাশয়! এই গ্রন্থের শেষাংশ উপসংহারে বর্ণিত হইল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।

১৮৮৩ খ্রিঃ ১২১২

উপসংহার ।

পূর্বোক্ত ঘটনাসমূহের কএক বৎসর পরে, একদিবস অপরাজ্জ্বল
পূণ্যভীর্ষ কাশীধামের জাহ্নবীতটসংলগ্ন একটি প্রান্তর গঠিত অট্টালিকার দ্বিতল
কক্ষে দুইটি যুবক, আপন আপন কর্মে অতিনিবিষ্ট রহিয়াছে।

একটি যুবক গৃহাভ্যন্তরে—মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে, একটি মূল্যবান রিত্তারিত
কবলোপরি অর্জুনাগ্নিত অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন;—পুস্তক-
খানি ধর্ম পুস্তক। যুবকটি নবীন বয়সে উদাসীন সাক্ষিয়াছেন। তাঁহার বেশ-
ভূষা, তাঁহার গভীর মুখাবয়ব প্রভৃতি বাহ্য লক্ষণ সমূহের প্রতি নেত্রপাত
করিলে সহজে অনুমান করিতে পারা যায়, যে যুবক সংসারের ভোগ স্বপ্ন
হইতে চির অবসর লইয়া, কোন কঠিন ত্রুড় গ্রহণ করিয়াছেন।

যুবক আপন মনে পুস্তকপাঠে এক নিবিষ্টচিত্ত যে, তখন তাঁহাকে একটি
পাঠ নিরত মস্ত্যাকৃত শুভ পদার্থ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। জাহ্নবী-বক্ষ প্রা-
হিত অশান্ত শীতল বায়ুপ্রবাহ, সেই মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া কক্ষে যেন, অনধি-
কার প্রবেশ করিয়া, ধ্যান-নিমগ্ন সেই যুবকটির বিলম্বিত কক্ষ কেশগুলি লইয়া
অযথা আন্দোলিত করিয়া, তাহার একাগ্রতা নষ্ট করিবার নিমিত্ত বিবিধ যত্ন
করিতেছে। কিন্তু প্রত্যেক বারের চঞ্চল বাতাসের চঞ্চল উত্তম বার্থ হইয়া যাই-
তেছে। ইহার কারণ বোধ করি, এই অশান্ত ফুরফুরে বাতাস অধিকতর চাপল্য-
ভাব প্রকাশ করিয়া, সেই কক্ষস্থিত ভিত্তি-গাত্র বিলম্বিত, কোন নবযৌবন-
সম্প্রদা, হাঅাননা, দেবীকৃপা মোহিনী লালনার একখানি ছায়া-চিত্রের প্রতি
উপদ্রব করিতেছে; তজ্জাচ যুবক পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট চিত্ত।

অন্য যুবকটি ধ্যান নিরত যুবকের পার্শ্ব—মধ্যে অল্পমাত্র ব্যবধান—এক-
খানি স্বতন্ত্র বিস্তৃত সতরঞ্জ পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া, একখানি উপাধানোপরি
নিজ গৌরবর্ণ দেহখানির লঘুভার অঙ্গ বিস্তর সংতুষ্ট করিয়া আর্পণ মনে একটি
হিসাবের খাতায় কি হিসাব লিখিতেছে।

কক্ষটি সম্পূর্ণ নীরব। কেবল অশান্ত বৈকালিক বাতাসের চঞ্চল গুহিলময়
কক্ষটি মৃদুমন ধ্বনিত হইতেছে। এতদুত্তম বর্ণিত কক্ষের পার্শ্বস্থিত অল্প কক্ষ

চোখে কণকটি মনুষ্য কর্তৃক কোন কামীবাসিনী তৈরবী বিষয়ক প্রসঙ্গের জ্ঞাপ্তি মুহূর্ত্তনি কচিৎ শ্রুত হইতেছে । ইহা ব্যতীত অল্প শব্দ তথায় নাই ।

বর্ণিত কক্ষের আগবাদের জাতি দৃষ্টি করিলে, মহাজ্ঞ বুঝা যায় যে, কক্ষ অধিকারী যুবক ছুইটি, উক্ত কক্ষের প্রকৃত অধিনায়ী নহে,—তাঁহারা কোন সম্ভ্রান্ত তীর্থযাত্রী কিম্বা তীর্থ-পর্যটক হইবে ।

যাই হ'ক ; পাঠ নিরত যুবকটি পার্শ্বের কক্ষস্থিত ব্যক্তিদ্বিগের ক্রমাগত চলিত কথাবার্তায়, পাঠে একাগ্রতা হারাইয়া, নিজ অজ্ঞাতে তাহাদ্বিগের চলিত তৈরবী-প্রসঙ্গ শুনিতে লাগিলেন ।

ঠিক এই সময়ে, একটি লোক কতকগুলি জিনিষ পত্র লইয়া, উক্ত কক্ষে প্রবিষ্ট হইল । তাহাকে দেখিয়া হিসাব লেখক যুবক কহিল, “তুমি আগিয়াছ ? তোমার জ্ঞাত এতক্ষণ আমরা বিদ্যেধর দর্শনে যাইতে পারি নাই ।”

সেই লোকটি কহিল, আমি পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম ।”

অতঃপর, তাহার আগমনে সেই যুবকদ্বয় আপন আপন কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিদ্যেধর দর্শনে বহির্গত হইলেন ।

উক্ত যুবকদ্বয় প্রথমে মানমন্দির দর্শন করিয়া, মনিকর্ণিকার খাটাভিমুখে গমন করিলেন । ইচ্ছা—পুরাণোক্ত পুণ্যত্মা সেই বীর ধার্মিক চুড়ামণি মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের পদার্পণে যে পুণ্যভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে, জগতের পবিত্র তীর্থ স্বরূপ চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে—তাঁহা কেমন, একবার দেখিব ।

উভয়ে দেখানে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে—কটকিত শরীরে দেখিলেন,—পবিত্র ললিতা আরাধী দেবীর উপরেই সেই পুণ্যভূমি পবিত্র জীবন্ত প্রাণ । তাহার বক্ষে কত পুণ্যবান কামীপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রজ্জ্বলিত চিত্তাধুম গগনমার্গ ছাইয়া ফেলিয়াছে । কাহার নির্দোষোন্মুখ চিত্তের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, হিম্মোলিত লঘু বায়ুস্তরে, অশ্রু একটি অনগ্র-স্পৃষ্ট নব সজ্জীভূত চিত্তের উপর পড়িতেছে । আবার কোন নির্দোষ চিত্তোপরি শব্দাহকারী ব্যক্তিগণ গঙ্গার পবিত্র স্নানীতল বারি ঢালিয়া দিয়া, পরমেশ্বর নাম স্মরণ করিয়া প্রস্থান করিতেছে, আবার কাহারো কোন ভাগ্যবানের শব্দেহ লইয়া, সেই পুণ্যভূমিতে উপনীত হইতেছে ।

এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনান্তর উক্ত যুবকদ্বয়, সেই পুণ্যতীর্থ এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, বিদ্যেধরের মনিরাভি-
শ্রুতি গায়ত্রীমন্ত্র হইলেন ।

এমন সময়ে কে ডাকিল—‘অসিদ্ধ বাবু !’

সেই যুবক ঘরের মধ্যে উদাসী যুবক, সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন । যে ডাকিল, তাহার উদ্দেশ্যে তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন পরিচিত ব্যক্তি তাহার নয়নপথে পড়িল না । ডাকাটি পরিচিত কর্তৃ-
নিঃসৃত স্বরের মত কর্ণে বাজিয়াছে বলিয়া, তথায় তিনি ক্ষণেক দাঁড়াইলেন ।
এইবার উদাসী যুবক,—একটী হীন বেশ, নগ্ন পদ, বিকৃতশ্রীক যুবককে তাঁহার সম্মুখীন হইতে দেখিলেন । উদাসী যুবক, সান্ধর্য্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি আশায় ডাকিয়াছেন ?”

আগন্তুক যুবক উত্তর দিল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আপনাকে ডাকিয়াছি । আপনি কি আশায় চিনিতে পারিতেছেন না ?”

উদাসী যুবক ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ক্ষণেকে সবিস্ময়ে চিনিলেন,—তাঁহার মহাপাঠী বন্ধু—সেই ইন্দুবাবু । কি আশ্চর্য্য ! ইন্দু বাবুর এইরূপ অবস্থা ! উদাসী যুবক ব্যথিত-প্রাণে বিষম আশ্চর্য্যের মহিত
তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, “ইন্দু !—তুমি—তোমার এই অবস্থা ?”

হীনবেশ ইন্দুবাবু, বাষ্পভরাবনত নয়নে, পীড়িত স্বরে কহিলেন, “হ্যাঁ ভাই ! আমার এই অবস্থা,—আমার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে ।

এই কথা বলিয়া ইন্দুবাবু নয়ন মুছিলেন ।

উদাসী যুবক চমকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কি !—কবে ?”

ইন্দুবাবু কহিলেন, “অগ্গ ।”

উদাসী যুবক সবিস্ময়ে ইন্দুবাবুর কথা প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিল,
“ভাগ্য ?”

“হ্যাঁ ভাই ! এখনও যাদের মৎকার হয় নাই ; এই সব মাত্র তাহার উদ্বোধন হইতেছে ।—এম না ?”

ইহা বলিয়া ইন্দুবাবু, উদাসী যুবককে আশান মর্মীপে লইয়া গেলেন ।

উদাসী যুবক, সহচর যুবককে নিজ অসুখাগামী হইতে কহিয়া বলিলেন,
“হরিচরণ বাবু ! আজ এই আশান ঘাটে বহু বিশেষণ দর্শনের ফলসাক্ষ্য করা যাউক,—আস্থান ।”

প্রিয় পাঠক মহাশয় ! আজ অনেক দিনের পর আদার অসিদ্ধবাবু, ইন্দুবাবু, ও হরিচরণ বাবুকে দেখিলেন । এই অনেক দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অবস্থা বিভিন্ন রকমের হইয়া গিয়াছে । ইহার কারণ, আপনি

অসুস্থতার উপর নির্ভর করিয়া কতকটা বুঝিতে পারিলেও, ইহার বিশেষ বিবরণ, আপনি অবশ্য জানিতে উৎসুক ।

অসিদ্ধবাবু নিজ কর্মদোষে আপন প্রাণপ্রতিমাকে ক্ষীরোদপুরে বিসর্জন দিয়া স্বগ্রামে উপস্থিত হইলেন । সেখানে অসিদ্ধবাবু আশ্রয় স্বজন সংগীনে লোক লজ্জার ভয়ে সহস্রাঙ্গীর মত প্রকৃত কথা গোপন করিলেন । আর দূর পরিগ্রহ করিব না,—আশ্রয়স্বজনের নিকট এইরূপ দুঃসত্য প্রকাশ করিয়া সেখানে নিজ প্রাণপ্রিয় পবিত্র স্মৃতি স্মরণার্থে এক রহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া, তাহার পার্শ্বে উদ্যান পরিবেষ্টিত একটি মন্দির সংস্থাপন ও তদাভ্যন্তরে তাঁহার সাধনার সামগ্রী, নিজ প্রাণপ্রিয় মেই ক্ষীরোদপুর-শ্মশান সংগৃহীত চিতা ভগ্না, প্রোথিত করিলেন ও তত্পর দেবাদিদেব বিশনাথের লিঙ্গ মূর্তি স্থাপন করিয়া, শাস্তিহীন স্বদয়কে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার দ্বারে নবীন ঘোড়ী সাজিলেন । এইরূপে কতদিন যায় ; তবু স্বদয়ের যৎকিঞ্চিৎ শাস্তি বিধান হইল না দেখিয়া, তিনি তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত হইলেন । নানা তীর্থ পর্যাটন করিয়া, অসিদ্ধবাবু এখন যৎকিঞ্চিৎ মানসিক শান্তিস্থপের অধিকারী হইয়াছেন ।

অসিদ্ধবাবু নিজ মনোমত সহচর হরিচরণ বাবুকে নিযুক্ত হইতে না পারিয়া, তাঁহাকে নিজ অধিদারীর কর্ম সংসারে আনয়ন করিয়া তাঁহার চির সাহচর্য লাভ করিয়াছেন । এই স্থানে হরিচরণবাবুর অবস্থা বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ।

তারপর ইন্দুবাবু । তিনি, আপন স্বভাব দোষে আপন সৌভাগ্য হইতে স্থলিত হইয়াছেন । প্রিয় পাঠক ! আপনার স্মরণ আছে, ইন্দুবাবু একদা গরনের সহিত কলহ করিয়া তাহার বাটী ত্যাগ করেন । তারপর তিনি কি করিলেন, কোথায় গেলেন, অবশ্য আপনি ইহা জানিতে উৎসুক ।

ইন্দুবাবু তারপর মণিলাল জহুরীর মত কোন একটা গৌরী সেনের পাশ্চাত্য পণ্ডিত্য তাহার পরামর্শে গরমকে জল করিবার নিমিত্ত, অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ বিবরণে গরমকে অসুস্থতাপিনী করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার বাটীর ময়িকটস্থ কোন বারাজনা গুলে বাদনাহী আনোদের চূড়ান্ত মজার মত হইলেন । বলা বাহুল্য, যদিও মেই গৌরীসেন বন্ধুর তদ্বিধে ইন্দুবাবুর আত্মদ গংজাঙ্গ কোন দ্রব্যাদির অভাব হয় নাই বটে ; কিন্তু তাহার কূট যড়যন্ত্রে পতিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ইন্দুবাবু বিষম বিপদগ্রস্ত হইলেন । অর্থাৎ একটা মাতামাতিস মোক-

দেয়ার তিনি আসামী হইলেন । এবং আদালতে ও করিয়াদির পক্ষে উদর, প্রচুর অর্থে পূরণ করিয়া, ইন্দুবাবু সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন ।

ইন্দুর জননী, কুলাঙ্গার পুত্রের এই অপরিবর্তনীয় দৃষ্টান্তবের প্রতি একান্ত বিষণ্ণ হইয়া কানীবাঙ্গী হইলেন । তখন নিরুপায় ইন্দুবাবু নানা ছশ্চিন্তায় শ্বাস্ত্র হারাইয়া, কানীবাঙ্গী মাতার দ্বারস্থ হইলেন । তথায় কএক বৎসর শাস্ত্রভাবে বসতির পর ইন্দুবাবু মাতৃহীন হইলেন । এই মৃত্যু মাতৃহীন ইন্দুবাবুর সহিত কানীর সেই পবিত্র স্মরণীয় শশান ঘাটে, আজ আবার বহুদিন পরে সহ-পাঠী, আমোদ-আহ্লাদের গাণী, অসিদ্ধবাবুর সাক্ষাৎ হইল । এই দেখা সাক্ষাতে উভয়ে আপন আপন অভিমান ত্যাগ করিয়া সরলভাবে কথা কহিয়াছিল ।

ইন্দুবাবু তাঁহার জীবনের সেই সঙ্কট অবস্থায়, কথা শ্রুত্রে পূর্ক্স কথা স্মরণ করিয়া, অনুতাপ করিয়া অসিদ্ধবাবুকে কহিলেন, “ভাই ! ছঃখের কথা তোমায় বলিব কি ! আপন দোষে আপনি ডুবিয়াছি । এখন আমি বুঝিতেছি, যে ভুল করিয়াছি—তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ ইহ জন্মে হইবে না । মা ছিলেন ; আমার আশা ছিল—তিনি এখন ছাড়িয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে আমার আশা ভরসা সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে । ভাই ! পৃথিবীতে এখন আমি অবলম্বনহীন ।”

ইন্দুবাবু এই কথাগুলি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

অসিদ্ধবাবু ইন্দুবাবুর উক্ত অনুশোচনায় ছঃখিত হইয়া তাঁহাকে নানাধিধ প্রবোধ বাক্যে মাতিয়া করিলেন । তারপর তাঁহার পীড়িত মানসিক বৃত্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবার নিমিত্ত অল্প প্রসঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন । এই সময়ে তাঁহাদিগের সম্মুখ দিয়া একটি ভৈরবী মূর্তি চলিয়া গেল । অকস্মাৎ তাহাকে দেখিয়া ইন্দুবাবুর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল । তিনি অসিদ্ধবাবুর উত্থাপিত প্রসঙ্গে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন, “অসিদ্ধবাবু ! একটি নূতন কথা—বড় অন্যাকৃ কাণ্ড । সেই বেইমান মাপের জাত সরম, ভৈরবী মাজিয়াছে । সম্প্রতি আমি তাহাকে দেখিয়াছি ?”

অসিদ্ধবাবু তাঁহায় যুগে এই কথা শুনিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়া নিম্ন কথিত প্রসঙ্গ ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, “বল কি !”

ইন্দুবাবু বলিলেন, “স্বাস্তবিক ।”

অসিদ্ধবাবু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাঁহাকে তুমি কোথায় ভৈরবীর সন্দেশে দেখিয়াছ ?”

ইন্দুবাবু কহিলেন, “বিশেষের মন্দিরের মধ্যে ।”

“বিশেষের মন্দিরের মধ্যে ?—তুমি তাহার সহিত কথা কহিয়াছ ?”

“কথা কহিব মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু পারি নাই ; সে বিজ্ঞানের মত আমার পার্শ্ব কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে ।”

অমিত্রবাবু ইন্দুবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না । তিনি অশ্রমনস্তে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

এই সময়ে ইন্দুবাবুর কোন আশান-মহমাজী কি প্রয়োজন বশতঃ তাঁহাকে ডাকিলেন । ইন্দুবাবু তথায় আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া অমিত্রবাবুর নিকট বিদায় লইলেন ।

অমিত্রবাবু নিজ সহচর হরিচরণ বাবুর সহিত গঙ্গাবা স্থানান্তিমুখে গমন করিলেন । কিয়দূর অগ্রগত হইয়াছেন, এমন সময়ে সহসা সেই পথে, সেই ক্ষীরোদপুরের দয়াল — রামদয়ালবাবুর সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল । মুহূর্ত্তে সেই পথ, পরস্পরের শুভ সম্মিলনে ও আত্ম সম্ভাষণে আনন্দময় বোধ হইল ।

প্রিয় পাঠক মহাশয় ! অমিত্রবাবু ক্ষীরোদপুর ত্যাগ করিয়া যাইবার অব্যবহিতকাল পরেই রামদয়াল বাবু, নিজ শ্রমের শাস্তির নিমিত্ত সেই মহাপুরুষের আদেশ ক্রমে, তিনি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন । বহুদিন ধরিয়া সপার্বার নানা দিক্ দোশ তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে এই পবিত্র কাশী-ধামে যাম করিতেছেন । আবার সেই মহাপুরুষের আদেশ বহিনে, তিনি প্রজ্ঞায়ে প্রত্যাগমন করিবেন । রামদয়াল বাবু সেই অগন্ত মহাপুরুষের কৃপায় এখন পূর্ণ শান্তিমুখের অধিকারী হইয়াছেন ; ও তিনি এই বৃদ্ধবয়সে একটি পুত্ররত্ন লাভ করিয়া বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন ।

রামদয়ালবাবু গজাতীরে যাইতেছিলেন । সেখানে সন্ধ্যা আত্মিকাদি করিয়া কামিনীনাথের আরতী দর্শনান্তর বাসায় ফিরিবেন ।

অমিত্রবাবু ইহা অবগত হইয়া, একজো কামিনীনাথের আরতী দর্শন করিয়া স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে, মানন্দে তাঁহার সহিত আবার জাহ্নবী দেবীর তীরস্থিত হইলেন । অমিত্রবাবুর আশ বড় সুপ্রভাত । কেন না, তিনি, আজ এই দেব-কোষ কাশীধামে অচিন্তনীয় ব্যাপারে, মহা দেব-প্রতিম, মাহু-চরিত্র রামদয়াল বাবুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন । ইহা তাঁহার পক্ষে মোড়াগোর বিষয় বই কি ?

সুই হ'ক তাঁহারা সকলে প্রস্তাবাদিত জাহ্নবীতটে অপেক্ষাকৃত একটু

নির্জন স্থান বাছিয়া লইয়া তত্পরি উপবেশন করিলেন । কিম্বৎকণ
রামদয়াল বাবুর সহিত অমিষ্টবাবু ও হরিচরণ বাবুর তাত্‌কালিক অবস্থা বক্তব্য
মকল কথিত হইতে লাগিল । পরে, অতঃপর আসিয়া পড়িল । এই সময়ে
একটা লোক—যিনি রামদয়ালবাবুর সমাধিব্যাহারে ছিলেন, তিনি অবসর বুঝিয়া
রামদয়াল বাবুকে একটি কথা—যে কথাটি ইতিপূর্বে কথিত হইতেছিল—
এবং যাহা অমিষ্টবাবু ও হরিচরণ বাবুর সহিত রামদয়াল বাবুর সাক্ষাতে
ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল,—পুনরায় উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—“তারপর
মহাশয় ! সেই মেয়েটি ?”

রামদয়াল বাবু যেন চমক ভাঙ্গিয়া কহিলেন, “হাঁ—তারপর
আমার সেই হারান মেয়েটি, এতদিনে ঠিক এই লাবণ্যময়ী ভৈরবী
মত হইত ।”

এই কথা শুনিয়া সে লোকটি তারপর রামদয়ালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
“আপনার সেই হারান মেয়েটির কি নাম ছিল ?”

রামদয়ালবাবু কহিলেন, “শৈলবালা ।”

অমিষ্টবাবু রামদয়ালবাবু কর্তৃক বিবৃত উক্ত কথা অল্পমাত্র শুনিয়াই
বিস্ময় বিষড়িত উৎসুক চিত্তে তাঁহার বর্ণিত কথা সবিশেষ শুনিবার নিমিত্ত
প্রস্তুত হইতেছিলেন । কিন্তু তাঁহার হারান মেয়েটির নাম শৈলবালা শুনিয়া
তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইলেন । শৈলবালা ত সরমের পূর্বনাম । সরমও—
ত কাহার হারান মেয়ে ! রামদয়ালবাবু বলিতেছেন—আমার সেই
হারান মেয়েটি, এতদিনে ঠিক এই লাবণ্যময়ী ভৈরবীর মত হইত । ইন্দুবাবুও
ত এই কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্বে বলিয়াছেন,—সরম ভৈরবী গাঞ্জিয়াছে । সরম
বিশেষত্বের মন্দিরে তাঁহার পাশ কাটিয়া চলিয়া গিয়াছে । কি আশ্চর্য্য ! তবে
কি এই সরম, রামদয়াল বাবুর ছহিতা সেই শৈলবালা ?

অমিষ্টবাবু যুগপৎ এই সমস্ত জটিল চিন্তায় পতিত হইয়া কত কি ভাবিতে
লাগিলেন ।

সে লোকটি পুনরায় রামদয়ালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ভৈরবী
এখন কোথায় ?”

রামদয়ালবাবু কহিলেন, “ওরর আদেশে মস্ত্রাতি তিনি বিক্ষাচলে বাস
করিতেছেন ।”

—“মস্ত্রাতি তিনি বিক্ষাচলে বাস করিতেছেন, এই কথাগুলি চিত্রায়িত

অমিত্রবাবুও কণ্ঠে সম্ভোরে ফানিত হইল। তিনি অমনি চমকিত হইয়া মেহ কণা উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, “তিনি বিকটচণ্ডে বাস করিতেছেন ?”

বামদয়ালবাবু কহিলেন, “হঁ। তিনি এখন বিকটচণ্ডে বাস করিতেছেন।”

আমিত্রবাবু আর কোন কথা কহিলেন না। তিনি অলম্বনক হইয়া দাঁড়াইতে লাগিলেন।

অমিত্রবাবুর এত চিন্তা তাঁহাব পক্ষে এখন কিদূর, হটাত তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা একপ্রকার অসম্ভব; কেন না তিনি উপাহৃত সংসার বৈরাগী ক্ষিত্তিহীন পুরুষ।

যাই হ’ক, সরমেব পূর্ব পরিচয় এত স্থলে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যিক। সরমেব পূর্ব নাম শৈল-শৈলবালা; সরম অজ্ঞাত কুবলীলা। সরম অতি বালিকা বয়সে দম্পত্য—যহু মাইতি কর্তৃক মাতৃভক্ত হইতে চিরবিচ্ছেদ হইয়া মেহ স্নানগৌ, পাপিষ্ঠা দিগ্ভীমার কর-কবলিতা হয়। তারপর সরম ঘটনাচক্রে পড়িয়া মদন্তরুর কুপায় এখন তৈরবা মাজিয়াছে। এ সব কথা শুতা হইলেও আমরা বলিব না, সরম বামদয়ালবাবুরই মেই হারান দেয়ে—শৈলবালা। তবে একথা অবশ্য বলিব—বলিতে বাধা যে, সরম বালিকা বয়সে কি উপলক্ষে কোন স্থান হইতে মাতৃ-ভক্ত নিচ্যুত হয় ?

সরমের পিতা একদা কোন প্রয়োজন বশতঃ কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হন। আত্মনা পল্লিজামবাসিনী তাঁহাব পুরমাইলাগণ, কলিকাতা কল্লণ মঙ্গর দেবিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। মেহ সময়ে একদিন চক্রেইহণ উপলক্ষে পুণ্যমলিলা ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইবার মানসে তিনি সপরিবারে গঙ্গাস্নানে গমন করেন। কিন্তু তাঁহাতে তাঁহার যে কললাভ হইল, তাহা লিখিতেও লেখনী কম্পিত হয়—তাঁহার একমাত্র শিশু কন্যা আশ্চর্যরূপে অপহৃত হয়। তিনি বহুদিন হইতে মাদামত মেই অপহৃত শিশু কন্যাটির অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন সফল হয় নাই।

খ্রিস্ট পার্শ্বক মহাশয়। ইহা কেমন অদয় বিদারক শোচনীয় ঘটনা, আপনি একবার ইন্দ্রে অনুভব করুন। তারপর সরম তৈরবী মাজিল।

কে মাজাইছে—কি প্রকারে মাজিল, ইহাও দেখিয়া ঘটনার বৈচিত্র্যতার বিষয় ভাবুন ?

যে দিন ইন্দুবাবুর সহিত সরমের চিরবিচ্ছেদ হয়, সেই দিন অমিত্রবাবু স্নানস্থানের করিয়া সরমের নিকট বিদায় লইয়া আপনার বাটী গমন করেন।

সেখানে গিয়া তিনি যে বাপারে পড়িলেন, ত্রিশ পাঠক মহাশয়! ইহা অবশ্য আপনার অন্তরে আছে। তারপর সরম অসিদ্ধবাবুর আশা পথ চাহিয়া কএক দিন অতিবাহিত করিল। শেষে সরম অসিদ্ধবাবুর বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িল। দুই একদিন লোক পাঠাইয়া তাঁহার অহুসান করিল; কিন্তু কোন খবর পাইল না। এই সময়ে তাহার কোন একটি পারচিত ছুটে জুয়াচোর, তাহার হৃদয় কথা জানিতে পারিয়া, তাহাকে গোপনে আশ্রয় দানে ভুলাইল। সরম দিয়া বুঝিল যে, সে তাহার একজন উপকারী বন্ধু। যাই হ'ক, ছুটে, দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া সরমকে বলিল,—“অসিদ্ধবাবুকে এখন পাওয়া যাইবে না; তিনি দেশে গিয়াছেন?”

সরম কহিল, “তাঁহার দেশে কি যাওয়া যায় না?”

ছুটে কহিল, “কেন যাওয়া যাইবে না। তুমি ইচ্ছা করিলেই যাইতে পার?”

সরম কহিল, “আমি যাইব।”

ছুটের মনবাসনা সিদ্ধ হইল, সে কহিল, “যাইব বলিলেই ত যাওয়া যায় না।

টাকা চাই!—টাকা তুমি কোথায় পাইবে?”

সরম কহিল, “টাকার অভাব কি। দিদি মা আমার অল্প অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছে।”

ছুটে সানন্দে কহিল, “তবে আর কি? তুমি ঠিক যাইতে পারিবে। তবে এক ভিতরে একটা কথা আছে, তুমি ত প্রকাশ্যভাবে যাইতে পারিবে না; প্রকাশ্যভাবে যাইলে, বাড়ীর লোক তোমায় আটক করিবে।”

সরম কহিল, “প্রকাশ্যে যাইব কেন? গোপনে যাইব।

তারপর এই সব পরামর্শ অঁটা হইয়া গেল, পরে একদিন ছুটে জুয়াচোর সন্মোগ বুঝিয়া প্রচুর অর্থ অলকারাদির সহিত সরলা সরমকে বাড়ীর বাহির করিয়া তাহাকে লইয়া রেল চাপিল। বাকিপুরে আসিয়া ছুটু, সরমের যথাগত লইয়া কোথায় উদ্যত হইল। সেখানে নিকপার, বিপদা মহাশয়ীনা সরম চক্ষুর অগ্রে ভাগিন্দে লাগিল। এই সময়ে সরম মহাশয় কোন একটি মাধু পুরুষের নয়ন সম্মুখে পড়িয়া যায়। তিনিই তাহার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, ও তাহার লক্ষণাদি দেখিয়া তাহাকে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া, তৈয়রনী মতে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি দুঃখিনী সরম, শুক্ল রূপায় সুসংযত হইয়া পরম শুদ্ধাচারিনী তৈয়রনী মাঝিয়া বেড়াইতেছে।

সন্ধ্যার পূর্বাঙ্গেরে জাঠীতট যখন ধীরে ধীরে সন্নিভাব ধারণ করিতেছিল ।
তখন রামদয়ালবাবু, অপর সকলের সহিত ভগ্না হইতে গাজোথান করিয়া
বিশ্রামেরে আরতী দর্শনার্থে মন্দিরে গমন করিলেন ও তথায় প্রাণ ভরিয়া
ভগবানের আরতী দশন করিয়া, সকলে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া
আপন আপন বাটীতে প্রস্থান করিলেন । এখানে বলা বাহুল্য রামদয়ালবাবু
অমিজবাবু ও হরিচরণ বাবুকে তৎপর দিনস তাহার বাটীতে সাক্ষাভোজে যোগী
দান করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । অমিজবাবু ও হরিচরণবাবু
তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আপনারা পুখী হইয়াছিলেন ও রামদয়ালবাবুকে
পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । এই নিমন্ত্রণ রক্ষাকালে হরিচরণবাবু, রামদয়াল-
বাবু ভ্রাতা শামুর মুখে শুনিতে পাইলেন, সেই অমিদার কুলধবজ—টাইবাবু,
স্বপ্নগুরুর পথে দক্ষ্যহস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ।

যাই হ'ক, এই ঘটনার পর অমিজবাবু কানীতে আর বেনীদিন থাকেন
নাই । তিনি আপন অমিদারিতে চলিয়া গিয়াছিলেন । কি কারণে তিনি
হঠাৎ কানীদাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহার বিষয় কিছু জানিতে
পারা যায় নাই । তারপর আবার শুনা যায়, তিনি ইহার ছয়মাস পরে আর
একবার কানীতে আগিয়াছিলেন এবং কোন একটা যোগিনীর সহিত মিলিত
হইয়া নানা দিগ্দেশ ভ্রমণ করেন । আশাভিগ্নের বোধ হয়, ঐ যোগিনী সেই
ভৈরবী ব্যতীত আর কেহ নয় । জনরবে ভৈরবীর নামের পরিবর্তে যোগিনী
ঘোষিত হইয়াছে মাত্র ।



